সংগীত ও সাহিত্য

নীহারকণা মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরমারাধ্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

মুখবন্ধ

শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল. উপাধির জন্য "ভারতীয় সঙ্গীতের মূলসূত্র ও বাংলা সাহিত্যে উহার প্রভাব ও প্রয়োগ"-সম্বন্ধে যে রচনা (থিসিস্) উপস্থাপন করেছিলেন তা বিজ্ঞ বিচারকদের মনোনয়ন লাভ করে। বর্তমান পুস্তক ঐ রচনারই নব-রূপায়ণ। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে সঙ্গীতে গবেষণাকার্য করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু দুরূহ ও বিপুল। তিনি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৈদিক ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সঙ্গীতবিস্তৃতির সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নাথগীতি, চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, মঙ্গলগান, পাঁচালী, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রোত্তর সকল রকম গীতিধারার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার বাউল, কবিগান, যাত্রা, সারি, জারি, ভাটিয়ালি, তর্জা, বোলান, খেউড়, আখড়াই, মালসী প্রভৃতির আলোচনাও বাদ যায় নি। বাংলা সঙ্গীতের গীতিরূপ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুনিপুণ পরিচালনাধীনে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের বিষয়বস্তুসমাবেশ ও পরিবেশনভঙ্গী প্রশংসনীয় হয়েছে। সঙ্গীতের গবেষণাক্ষেত্রে এই পরিশ্রম ও দান যশস্বী হয়ে থাকবে।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবহারিক জ্ঞানেও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, বিখ্যাত ধ্রুপদী স্বর্গীয় দানীবাবু ও যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত খেয়াল-গায়ক সঙ্গীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি সঙ্গীতশিক্ষকদের নিকট শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন, নিখিল ভারত সদারঙ্গ সম্মেলন প্রভৃতি এবং বহু সঙ্গীতাসরে সুনামের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বহু বৎসর যাবৎ ইনি কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের শিল্পী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। কাজেই ব্যবহারিক ও উপপত্তিক—শাস্ত্রীয় ও সাধনাত্মক জ্ঞানের উপাদান

নিয়ে তাঁর এই গবেষণার বিষয়বস্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় ভারতীয় সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রী ও সঙ্গীতপ্রেমিকদের যথেষ্ট উপকার সাধন করবে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত শিক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু আলোচনা তথা গ্রন্থ সময়োপযোগীই হয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২৪শে জুন, ১৯৬১

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকা

আমার বাল্যকাল অতিবাহিত হয় চট্টগ্রামে। অতি শৈশব অবস্থা থেকেই সংগীতের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং সেই কারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতসাধনায় আমি আত্মনিয়োগ করেছিলাম। ভারতের তথা বাংলার বহু প্রখ্যাত শিল্পী ও সংগীতজ্ঞদের কাছে নিয়মিতরূপে আমি ধ্রুপদ ও খেয়াল গান শিখেছি এবং বর্তমানেও এই শিক্ষাকার্য থেকে বিরত হইনি। যাঁরা আমার সংগীতানুশীলনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্বর্গীয় সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাস, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রলাল দাস, কলকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) এবং শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার ওস্তাদ গুল্ মহম্মদ খাঁ সাহেব, ভারতবিশ্রুত গায়ক স্বর্গীয় গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী এবং তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ বৎসর যাবৎ যে কঠোর পরিশ্রম সহকারে আমি উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা করেছি এবং যে-সংগীতের আওতায় নিজের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছি, হয়তো বা তাই যুগিয়েছে আমার অন্তরে সংগীত সম্বন্ধে কিছু জানবার এবং লেখবার অনুসন্ধিৎসা ও প্রেরণা। তাই আজ ঔৎসুক্য, আকুল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে নিজেকে নিয়োজিত করতে গবেষণামূলক সংগীতালোচনায়। যে বহুমূল্য গবেষণার ও তথ্যসংগ্রহের দুরূহ প্রচেষ্টায় আজ আমি ব্রতী হয়েছি, জানি না সে বিষয়ে কতটা সাফল্য অর্জন করব।

ভারতীয় অভিজাত সংগীতের মূলসূত্রের সঙ্গে বাংলা সংগীতের সম্বন্ধ উপস্থাপিত করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংগীত ও সাহিত্য—যা নিয়ে বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের বহু মনীষীরাই গবেষণা করে চলেছেন নানাভাবে, বহুপ্রকারে। কিন্তু আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ও ধারাটি এঁদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও এর মূলমন্ত্র আমি কুড়িয়ে পেয়েছি ভারতবর্ষীয় মনীষীদের রচিত সাহিত্য ও সংগীতশাস্ত্রাদির অন্তরেই, তবুও গবেষণার স্বকীয়তা রক্ষা করবারই প্রয়াস করেছি।

প্রকৃতির বুক থেকে কেমন করে মানুষের কাছে এল সংগীত, ধারাবাহিক-ভাবে সাহিত্যকে আশ্রয় করে সংগীত ক্রমোন্নতির পথে পা বাড়িয়ে স্খলন, পতন ও ত্রুটির গণ্ডি পেরিয়ে আজকে কোথায় এসে পৌছেছে, ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা তারই সমাধান করবার চেষ্টা করব। বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে অভিজাত সংগীতের প্রভাব কি ভাবে, কতটা এসে পড়েছে এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রয়োগপদ্ধতি তা কতটা অনুসরণ করেছে, যতটা সম্ভব তার নিরাকরণ করে গবেষণার মৌলিকতা প্রমাণে সচেষ্ট হব।

অসীম নীলিমায় উদ্‌ভাসিত সমুজ্জ্বল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও অগণিত তারকারাজির মতোই প্রতিভাত, সংগীতনভের জ্যোতিষ্ক রহস্যভেদী—অতীত সংগীতগবেষণাকারী মনীষীগণ, যাঁদের চিন্তাধারার সুদূর-প্রসারিত দৃষ্টির আলোকোজ্জ্বল পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছি আমার সীমাবদ্ধ অতি অকিঞ্চিৎকর বিদ্যাবুদ্ধির পুঁজিপাটা নিয়ে, জগতের অতি ছোটখাটো একটি বস্তু নির্ণয় করতে এবং যাঁদের উজ্জ্বলতার পাশে একটি জ্যোতিহীন জ্যোতিষ্কের মতোই আমি নিষ্প্রভ। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংগীতশাস্ত্রাম্বুধির তীরে গিয়েও হয়তো পৌছাতে পারিনি, ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবুরীর মতো মণিমুক্তা আহরণ করা দূরের কথা, হয়তো বা তটপ্রান্তের দুটি বালুকণাও আঁচল ভরে কুড়িয়ে নেবার যোগ্যতা নেই, তবুও তার বিরাটত্ব অনুভব করবার সুযোগও যে পেয়েছি মহাজনদের নির্দেশে, এইটুকুই ভাগ্য বলে মানি। আমার এই গবেষণার ক্ষুদ্র বস্তুটি হয়তো বা সংগীতজলধির একটি ক্ষুদ্রতম জলবিন্দু কিংবা অতি ক্ষুদ্রতর একটি শৈবালের সমতুল্যই। দ্রষ্টার সামনে তাই এই নগণ্য ক্ষুদ্রতম বস্তুটিকে তুলে ধরতে যেমন আসে লজ্জা, তেমনি আসে ভয়। তা হলেও ভরসা শুধু এইটুকু যে, সাধুদৃষ্টির সামনে দোষত্রুটিও হয় প্রত্যাখ্যাত। মরাল যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধভাণ্ড থেকে শুধু দুধটুকুই আহরণ করে থাকে, জলীয় অংশ থাকে পড়ে, তেমনি সাধুগণ কিঞ্চিৎমাত্র গুণ পরিলক্ষিত হলে, শুধু সেইটুকুই গ্রহণ করে থাকেন দোষত্রুটি পরিবর্জন করে। তাই সেই ভরসায়ই অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তিযুক্ত গবেষণামূলক আলোচনা উপস্থাপিত করতে সাহসী হচ্ছি পণ্ডিত ও গুণী গবেষকদের সম্মুখে।

ক্রমবিকাশমান সংগীত কি ভাবে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সান্নিধ্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করে রূপরসে রঞ্জিত হয়ে অভিজাত সংগীতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাই আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সংগীত বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বেদোপনিষদের শাখা প্রতিশাখা, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, জাতকমালা ও মহাকবি কালিদাস বিরচিত কাব্য-মহাকাব্যসমূহ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে ও ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর রূপ নিয়েছে সুসাহিত্যের আশ্রয়ে। সেই অভিজাত সংগীতের সুশৃঙ্খলিত ধারা ও নিয়মপদ্ধতির অনুবর্তনে, চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবসাহিত্যাদি এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত বঙ্গসাহিত্যের প্রবহমান সংগীতধারাও কেমন করে অভিজাত সংগীতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করব, যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের মাধ্যমে।

অভিজাত সংগীত যেমন সুসাধ্যায়ত্ত নয়, তেমনি তার জন্মপত্রিকা ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ সংগ্রহ করাও ততোধিক দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। তবু যে সংগীত ও সাহিত্যের এই দুষ্প্রাপ্য তথ্যসমূহ অবগত হতে ও আবিষ্কার করতে পা বাড়িয়েছি, এই দুঃসাহসিকতার পিছনে রয়েছে পূর্বাচার্যদের "মা ভৈঃ" বাণী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিকতা এবং প্রভূত প্রেরণা, যাঁদের সহায়তায় সুদূরবিস্তৃত পঙ্কিল পথে এতটুকুও এগিয়ে যেতে পেরেছি।

প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে যে জাতীয় সংগীতে যে যে প্রকারের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হ'ত তাদের এবং সংগীতের প্রকারভেদেরও যতটা পেরেছি নাম সংগ্রহ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। নানারূপ বিপর্যয় ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অমর সংগীতের ধারা কিভাবে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে, পবিত্র গঙ্গাধারার মতোই কত গিরি-মরু-প্রান্তর পেরিয়ে এই বাংলাদেশের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে সরস করে তুলেছে, তারও কিছুটা সন্ধান মিলবে এই আলোচনায়। হয়তো বা সংগীতের সেই অতীত ধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শুধুমাত্র পূর্বস্মৃতিই বহন করে চলেছে। তার রূপের বদল হয়েছে, রং পালটে গেছে, কোনো কিছুই হয়তো পূর্বের মতো নেই, তা হলেও সে মরেনি, তার প্রাণস্পন্দনের সাড়া এখনো শুনতে পাওয়া যায়,

আভাস পাওয়া যায় অতীতের ঐতিহ্যের। এক গঙ্গা থেকেই যেমন সমস্ত নদনদীর সৃষ্টি, তবুও ভিন্ন ভিন্ন নামে যেমন তারা অভিহিত হয়েছে এবং তাদের বর্ণব্যতিক্রম ঘটেছে, তথাপি সম্বন্ধচ্যুতি ঘটেনি কোনো নদনদীরই গঙ্গার সঙ্গে, তেমনি একই অভিজাত সংগীতের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভারতবর্ষের সর্বত্র, সর্বজাতীয় সংগীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ রয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং তাকে আশ্রয় করেই সব সংগীত বেঁচে রয়েছে নানা রূপে রূপায়িত হয়ে। সেই আদিযুগের সৃষ্ট স্বরাদিকেই পরিক্রমা করে সমস্ত সংগীত ঘুরে বেড়াচ্ছে সকল স্থানে। সকল সংগীতেরই মূলসূত্র এক, সর্বপ্রকার সংগীতের প্রাণসত্তাই অভিজাত সংগীতের প্রাণসত্তা। সকল জাতীয় সংগীতই চলেছে সাহিত্যকে অনুসরণ করে। সংগীতের বাহ্যদেহের সৌন্দর্য সাহিত্য, অন্তরসৌন্দর্য স্বর-প্রকৃতি ও ভাবরসসত্তা। এই ভাবরসসত্তার অভাব হলে কোনো সংগীতই সংগীতপদবাচ্য হয় না। তাই যে অভিজাত সংগীত রাগাখ্যা পেয়েছে রঞ্জকধর্মী হয়ে, সেই রঞ্জকধর্ম সর্বপ্রকার সংগীতেই সমভাবে বর্তমান। অগ্নি-কণাকে যেমন অগ্নি থেকে ভিন্ন করা যায় না, শুধুমাত্র বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর আখ্যা দেওয়া যায়, তেমনি অভিজাত সংগীত থেকে বাংলা সংগীতকে পৃথক করে ভাববার যুক্তি মেলে না। কাজেই ভারতীয় সংগীতের মূলসূত্রের সঙ্গে ভারতে সৃষ্ট সকল প্রকার সংগীতেরই সম্বন্ধ রয়েছে অটুট এবং তার প্রভাবেই প্রভাবান্বিত সর্বপ্রকার সংগীত, এইটিই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

এই গ্রন্থে কয়েকটি রাগরাগিণীর নামপ্রসঙ্গে দুই-একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন গ্রন্থে রাগরাগিণীর বিভিন্ন রকম নাম থাকায় আমিও সেইভাবে আমার গ্রন্থে বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছি। যেমন—কানাড়া-কানেড়া, ধানশী-ধানশ্রী-ধানুষী, দেওগিরি-দেবক্রী-দেবগিরি, বাগেশ্রী-বাগেশ্বরী, পটমঞ্জরী-পঠমঞ্জরী ইত্যাদি।

সংগীত ও সাহিত্যের গবেষণামূলক আলোচনায় যে-সকল সাহিত্যিক ও সংগীতগুণী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাঁদের আশীর্বাদ-গ্রহণই আজ আমার প্রধান কর্তব্য। তাই বিশেষ করে সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁর কর্তৃত্বাধীনে আমি এই গবেষণার কাজ করেছি—লব্ধপ্রতিষ্ঠ

সাহিত্যিক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের কাছে। এই গবেষণার পরিকল্পনা ও সমাপ্তির জন্য আমি তাঁর কাছে একান্তভাবে ঋণী। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ, আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও সহায়তা না পেলে এই রচনা প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'ত। এই বিষয়ে সহযোগিতা করে আর একজন সংগীত-মনীষী যিনি আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন, সেই পরম নিঃস্বার্থ নৈষ্ঠিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে জানাচ্ছি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। তিনি তাঁর বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে, জ্ঞানগর্ভ উপদেশের দ্বারা নানাভাবে আমার আলোচনার চলাপথ সুগম করেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করে এবং এই গ্রন্থের সুচিন্তিত "মুখবন্ধ" লিখে দিয়ে তিনি আমায় প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছেন। আমার পক্ষে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

যাঁরা আমার গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের ছাড়া আর যে-সব খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী, শাস্ত্রজ্ঞানী ও সংগীতসমালোচকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়েছি এবং যাঁদের কাছ থেকে নূতন তথ্য ও গান সংগ্রহ করেছি, তাঁদেরও আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সংগীতশিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, সংগীতসমালোচক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক শ্রীহরিদাস কর ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, বিখ্যাত বাউল গায়ক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, "পাঁচালী-ভারতী"র প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি গুণীরা যিনি যেভাবে পেরেছেন, তাঁদের সমালোচনা ও উপদেশ দ্বারা আমার রচনার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করে আমায় বাধিত করেছেন। এঁদের সকলের অবদানের কাছে আমি সত্যই ঋণী।

পরিশেষে এই বইখানির প্রুফ দেখার কাজে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যা নৃত্যশ্রী শ্রীমতী শুভশ্রী চট্টোপাধ্যায়। বই-খানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তার প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা কোনোরকম কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা জানানোর অপেক্ষা রাখে না।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯
পি ৪৭০, মনোহরপুকুর রোড এক্সটেন্‌সন্
কলিকাতা-২৯

নীহারকণা মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

॥ সূচনা ॥

ভারতীয় সংগীত আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে নিয়তই, যার মৈত্রীবন্ধন আজ পর্যন্তও অটুট আছে। বহুবিধ সামাজিক ও রুচিঘটিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে পবিত্র মন্দাকিনী ধারার মতো বয়ে চলেছে যে সংগীতধারা, ভারতভূমিতে সেই সংগীতের সূচনা হয়েছিল কবে, কোথায় ও কখন তা হয়তো সঠিক করে বলা সম্ভবপর নয়, তবে ঐতিহাসিক বিচারের মাধ্যমে কিছুটা তার অনুমান করা যেতে পারে। প্রকৃতির বুক থেকে বেরিয়ে এল যে সংগীত, প্রথম মানুষের কাছে যে সংগীত দিল ধরা, তার মূলসূত্রের সন্ধান নিলে বলা যেতে পারে, অন্ততঃ আজ থেকে ৩৫০০।৪০০০ হাজার বছরেরও অনেক পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মাটিতে হয়েছিল সংগীতের সূত্রপাত।

সংগীত একদিন ছিল কোন আদিমানবের গভীরতম অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকোনো। মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল সে মানবেরই প্রগাঢ় অনুভূতির আলোকলেখায়। তাই প্রতিটি মানুষের অন্তরের নিগূঢ়তম ভাবাভিব্যক্তির প্রকাশ বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে। অনুসন্ধিৎসার অধিকার নিয়ে জন্মেছে মানুষ, অনুভূতি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অনুসন্ধানের পথে। তাই সে সন্ধান পেয়েছে জীবনের ভাঙ্গাগড়া ও সুখ-দুঃখ নিবেদনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত গহনতম অরণ্যের নির্জন-নীরবতা-ভাঙ্গা পক্ষীকুলকাকলিকলগীতিকূজনে। সন্ধানী মানুষ পশুপক্ষীর কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছিল ছন্দগতি ও সুরের। পশুর বিবিধ চলার ভঙ্গী যুগিয়েছিল নূতন হতে নূতনতর লীলায়িত ছন্দের গতি।

অসীম আকাশ, অতল জলধি দিয়েছিল বিরাটের সন্ধান, দখিন সমীরণ জাগিয়ে তুলেছিল স্পর্শানুভূতির সুখশিহরন, বন্যকুসুমরাজির সুমধুর সুবাস সৃষ্টি করেছিল মধুর পরিবেশ। সাগরোত্থিত অবিরাম বিরাট ধ্বনি, গিরিগহ্বরের জলপ্রপাত, ঝরঝর ঝরনার কলগীতি, কুলুকুলু নদীর কলতান, ঝমঝম বরষার বারিধারা, গুরুগুরু মেঘের গর্জন, ব্যথাহত হস্তীর নিনাদ, মুহুর্মুহুঃ কোকিলের কুহুরব, খরস্বর কেকার কলরব, পক্ষীকুলখোদিত তরুরাজিকোটরে আন্দোলিত সমীরণপ্রতিহত সুমধুর স্বরনিচয় আদিমানবের মনে এনে দিয়েছিল সুরের প্রেরণা। তাই মানুষ প্রকাশ করতে চেষ্টা পেল সুখ-দুঃখ, আবেদন-নিবেদন ও কান্না-হাসি সুরের অনুকরণে, নিজের ভাষায় সুরে সুরে গড়ে তুলেছিল বড়র কাছে ছোটর দীনতার দাবি। হয়তো কোন পাখীর সুরস্পর্শ প্রাণে জাগিয়েছিল করুণ সুরের দোলা, তাই পাখীর কণ্ঠের সেই করুণ সুরেরই অনুকরণে আদি মানবমনের কারুণ্যভাব ফুটে উঠত তাদের কণ্ঠে করুণ গাথার সঙ্গে।

এমনি করেই মানুষ আহরণ করেছিল সংগীত অনুকরণের মাধ্যমে, প্রকৃতি ও মানবেতর জীবজগতের আনুকূল্যে। অসহায় মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিল প্রকৃতির কোলে। তাই সে প্রার্থনা জানাত অদেখার উদ্দেশ্যে। সে চাইত প্রকৃতির সাহায্যে নিজেকে জানতে, আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে, তাই ঝরনার ঝরঝর শব্দের সঙ্গে নিজের সুর মিলিয়ে চেষ্টা করত তারই অনুকরণ করতে। একান্ত নিঃসঙ্গতা দূর করতে গিরিউপত্যকা, জলধিতটপ্রান্ত, গিরিশ্রেণী, তরুরাজি, জীবজন্তু ও পশুপক্ষী এরাই ছিল সঙ্গী, আপনার বলতে ছিল এরা। তাই কখনো বা সেই বিরাট সমুদ্রের তীরে একান্তে নিয়ে যেত নিজেকে টেনে। ঢেউয়ের দোলার সাথে দুলিয়ে দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর, দিগন্তের দূরাগত জলধিধ্বনির নিরবচ্ছিন্ন সুরের মাঝে

আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে কোন্ অজানার পায়ে জানাত নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী। কখনো বা গহন হতে গহনতর বনান্তরে খুঁজে বেড়াত সুখ-দুঃখ বেঁটে নেবার সাথী। মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত সুরে সুরে। কখনো বা বাহুবেষ্টনে বেষ্টিত উপলখণ্ডের কানে কানে বলত মনের গোপন কথা, স্পর্শানুভূতির সুখোচ্ছ্বাস ফুটে উঠত কথায় কথায় সুরে সুরে। এমনি করে চিরদিনই মানুষ চলেছে সমুখের পানে এগিয়ে। পিছনের পুঁজিপাটা নিয়েছে সে চিরদিন সঙ্গে করে। চোখ তাদের কোনোদিনই ক্লান্ত হয়নি সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে; শ্রুতিপথ তাদের কখনো বন্ধ হয়নি সুরশব্দসংগ্রহে। চলাপথ তাদের চিরদিন চলেছে এগিয়ে, তাই অনুসন্ধিৎসা প্রগতির পথে তাদের টেনে নিয়ে চলেছে অনিবার গতিতে। পরবর্তী যুগে প্রকৃতির সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষই করতে পেরেছে বিস্রস্ত সুরসম্ভারকে একত্রিত করে সংগীতের রূপে রূপায়িত করতে। এমনি করেই সংগীতের বিকাশও উন্নত হতে উন্নততরে পৌঁছেছে ভারতবর্ষে।

যে উৎস থেকে পাখীর কণ্ঠে এসেছে সুমধুর সুরঝংকার, জীবজন্তু পেয়েছে নৃত্যছন্দের চলার ভঙ্গী, অরূপ সমীরণ বয়ে আনে সুখপ্রদ শীতল স্পর্শ, আদিযুগের মানুষ সেই প্রকৃতির সৃষ্ট প্রজাপুঞ্জ পশু-পক্ষীর কণ্ঠে আহরিত সুর ও ছন্দগতির অনুকরণে, নিজেদের জীবন-যাত্রার অতি স্বাভাবিক আত্মপ্রয়োজনের উপযোগী কথার মালা সুরসূত্রে বেঁধে নিবেদন করত আপন অন্তরের প্রেরণায় অন্তরতরের কাছে। অপার্থিবের কল্পনা তখনো তাদের আসেনি মনে। আপন অভাব-অভিযোগেই ভরে উঠত তাদের প্রার্থনার গাথা, আপন সুখ-দুঃখের কথায় সাজিয়ে তুলত সুরের সাজি। প্রকৃতির দেওয়া সুর-সম্ভারই যুগিয়ে দিত গানের প্রেরণা। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করেছে মানুষের দৃষ্টির সমুখে প্রকৃতিরই সাহায্যে। গ্রহণ-শক্তিশীল মানুষ তাই দু' হাতে লুটে নিয়েছে প্রকৃতির ঢেলে দেওয়া

অমিত ভাণ্ডার থেকে বৈচিত্র্যময় জগতের বিচিত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নিজের প্রয়োজনে। তাই মানুষ প্রকৃতির কাছে ঋণী থাকবে চির-দিন। সৃষ্টির অধিকার মানুষ পায়নি, পেয়েছে অনুকরণের, গ্রহণের, আহরণের অধিকার। মানুষ ঘর বাঁধতে শিখেছে পাখীর বাঁধা বাসার অনুকরণে। পাখীর লতাগুল্ম, তৃণদল আহরণের উপায় মানুষকে দিয়েছে ক্ষুধা অপনয়নের পন্থা। অনুভূতি মানুষ পেয়েছে বটে, কিন্তু চলাপথ তার সহজ করে নিতে হয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে ধার করে। তাই মানুষ যা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পায়, তার সবটুকুই প্রকৃতির দানছত্র থেকে হাত পেতে ভিক্ষা করে নেওয়া বই আর কিছু নয়। পাখী নীড় বাঁধে বর্ষার বারি ও সূর্যের প্রখরতা নিবারণে। ক্লান্ত জীবনের ক্ষণিক শ্রান্তি দূরের আশ্রয়রূপে মানুষও তাই ঘর বেঁধেছে পাখীর অনুকরণে, শীতোষ্ণতা নিবারণ ও শ্রান্তি অপনোদনের অনুকূলে। দিনের আলো, রাতের আঁধার, অসীম আকাশ, মুক্ত বাতাস, চাঁদের স্নিগ্ধতা, ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস মানুষের মনের আহার যুগিয়ে চলেছে আদি সৃষ্টি থেকে। তাই মানুষ গাইতে শিখল পাখীর অনুকরণে গান, প্রকৃতির আদিসৃষ্টি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর কাছ থেকে পেল আহরণের, সংগ্রহের, সংরক্ষণের, শ্রান্তি অপনোদনের ও শীতোষ্ণতা নিবারণের মন্ত্রদীক্ষা। সংগীতশিল্পী নিয়েছে সংগীত, চিত্রশিল্পী নিয়েছে চিত্রশিল্পের আহরণীয় বস্তু, বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি, গিরি-মরু, বনরাজি, পশু-পক্ষী, রবিশশী ও বনকুসুমের রূপের ছায়া। তাই মানুষের সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। প্রকৃতির সৃষ্টি ধরাছোঁয়া দেয় না মানুষের কাছে। মানুষ গড়ে প্রাণহীন প্রতিকৃতি, শিল্পী আঁকে, স্পষ্টতর রূপ দেয় না ধরা। মানুষ গান করে, পাখীর স্পষ্টতায় সে আবছায়া। কোথায় যেন কি ফাঁক থেকে যায় প্রকৃতির ইঙ্গিত থেকে মানুষের রচনায়। মানুষ নিতে পারে, ছুঁতে পারে, গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু দাতার কাছে সে চিরদিনই

ধারে। প্রকৃতির কাছ থেকে ধার করে মানুষ তার মনোভাণ্ডার করেছে পূর্ণ। সংগীতের ক্ষেত্রেও মানুষ কুড়িয়ে পেয়েছে প্রকৃতির ভাণ্ডারের মণিকোঠায় সুররত্ন। সংগীতের বীজমন্ত্র মানুষ পেল প্রকৃতির সুরমন্দিরে।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ, পরিণতির বিভিন্ন স্তর এবং অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে আমরা বাংলার সংগীতের প্রথম উদ্ভবের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছাবার চেষ্টা করব। ভারতীয় সংগীতের বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর কালের ব্যবধান অতিক্রম করে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলা সংগীতের বিকাশ লক্ষ্য করে পরবর্তী যুগে তার পরিণতির ধারাটিও আমরা পরিস্ফুট করব। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হাজার অথবা ৪০০০ হাজার বৎসর কিংবা তারও অনেক আগে হয়তো বা পুরানো অতুলনীয় সম্পদ এই ললিতকলা সংগীত আর এই বাংলা সাহিত্য বাংলা সংগীতের পরিপূর্ণ রূপের বিকাশ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তযুগে। এই বহু শতাব্দীর ব্যবধান ও দূরত্বের ফাঁকের মধ্যে বাঙালী প্রতিভা সেতুবন্ধন করেছে পূর্বযুগের সাহিত্য, সংগীত ও ললিতকলার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে, বাংলা সংগীত ও বাংলার ললিতকলাকে মৈত্রীয় যোগসূত্রে।

তখনকার বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম উদ্ভবযুগে তার ভাণ্ডার ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছিল সিদ্ধাচার্যদের শৌরসেনী ও মাগধী অপভ্রংশে রচিত বিভিন্ন কড়চা বই, ছড়াগান, পদগান এবং আর কিছু পরে অপভ্রংশ অবহট্‌ঠে অথবা সেই সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত পদগীতি এবং শৈব ও নাথপন্থীযোগীদের রচিত গীতিকাসমূহের দ্বারা। কাজেই প্রাচীনতার মানদণ্ডে ভারতীয় সংগীতের কাছে ভারতীয় সংগীতপ্রভাবিত বাংলা সংগীতের প্রাচীনতা নগণ্য। যেমন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে কতকগুলি স্তরবিভাগের (যথা—

শৌরসেনী, মাগধী, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ) মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছিল, তেমনি ভারতীয় সংগীত থেকে বাংলার সংগীতেরও অনুরূপ স্তর পরম্পরার মাধ্যমে উদ্ভব হয়ে থাকবে, এরূপ অনুমান অসংগত হবে না। উভয় কালের মধ্যে ব্যবধানও অনেক। এখানে আমাদের কর্তব্য হবে সুদূরকে নিকটে টেনে এনে উভয়ের মধ্যে মিত্রতার যোগাযোগ রচনা করা। ধারাবাহিকভাবে ঐতিহ্যবাহী সংগীতের মূলসূত্রের প্রভাব ও প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কতটুকু এসে পড়েছে, কখন, কোথা থেকে এবং কেমন করেই বা তা সম্ভব হয়েছে, তার একটি ইতিবৃত্তকাহিনী উপস্থাপিত করা। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরউপাসক এই বাংলার সমাজ, কাজেই প্রাচীনতম কাল থেকে এই ভারতবর্ষে যত প্রকার সংগীতের সাধনা ও বিকাশ হয়েছে, বাংলা সাহিত্য কেন, ভারতের যে কোনো দেশীয় সাহিত্যই তার প্রভাব ও প্রয়োগ থেকে মুক্ত হয়নি। তার বিস্তৃতি, তার পরিধি বারিধির মতোই বিশ্বপ্রসারিত, আকাশের মতোই নিত্য-বিরাজিত, তবে শুধু বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব, প্রয়োগ, গতিবিকাশ এবং কার্যকারিতার সম্বন্ধেই এখানে লিখব। তা থেকে এই প্রমাণ হবে যে বঙ্গের সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা এবং সমাজসভ্যতা ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষেরই প্রভাব-পুষ্ট। বাংলা সাহিত্য ও সংগীত প্রাচীনের স্মৃতিই বহন করে চলেছে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি বাংলা সাহিত্য তারই মর্মকথার প্রতিধ্বনি। ভারতীয় সংগীতের অনুরণন বাংলা সংগীতের মধ্যেও সুস্পষ্ট।

॥ ভারতীয় সংগীতের বিকাশ ও তার বিস্তৃতি ॥

ভারতীয় সংগীতের মূলসূত্র এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব ও প্রয়োগের আলোচনায় ভারতীয় সংগীতের বিকাশ ও বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক, এ ধরনের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর, কেননা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বাংলা সংগীতের আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক রূপের কথঞ্চিৎ জ্ঞানও আমাদের থাকা উচিত। তা ছাড়া বাংলা দেশ যেমন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি বাংলা সংগীতও ভারতবর্ষীয় সংগীতের অভিন্ন রূপ। তবে প্রতিটি দেশের বা জাতির গীতিরূপ বা সংগীত ভৌগোলিক সীমারেখা, বিশিষ্ট জলবায়ু, বংশানুক্রমিক ও দেশীয় ধারা ও পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন সীমারেখার বা দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে এক অখণ্ড সংগীতক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। তাই আকারে ও প্রকাশভঙ্গীতে তারা পৃথক বলে মনে হলেও আসল রূপে ও প্রকৃতিতে মোটেই আলাদা নয়।

বাংলা দেশের সংগীত বা গীতিরূপ ভারতের সুমহান সংগীতশিক্ষা-ধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। সুদূর এক অতীতে প্রাগ্বৈদিক যুগে সংগীতচর্চার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন: "…একটি বাঁশী পাওয়া গেছে—যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে স্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও প্রাগৈতিহাসিক গানে স্বরের ব্যবহার হ'ত। তন্ত্রীযুক্ত কয়েকটি বীণা (যে বীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা আজকালকার রবাব বা স্বরোদের মতো দেখতে), মৃদঙ্গাদি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীর ও একটি নৃত্যরত নর্তকের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে।"[১] তারও পূর্বে

---

১ সংগীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ), পৃঃ ১

নিশ্চয়ই সংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। কাজেই কোনো কলার উন্নত বিকাশ একদিনের সৃষ্টি নয়, বহুদিন লেগেছিল তার পূর্ণ পরিণতি হতে। মহেন্‌জোদড়ো সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আজকাল অনেক পণ্ডিতই বৈদিক সভ্যতা বলতে চান; অন্তত সংগীতের বিকাশের দিক দিয়ে বিচার করলে সে কথা অনেকটা সত্য বলে মনে হয়। মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় যাঁরা বৈদিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ আছে বলে স্বীকার করতে চান, সংগীতের দিক দিয়ে তাঁদের যুক্তি হ'ল যে বৈদিক যুগে আর্চিকাদিস্বরের যে সন্ধান পাওয়া যায়, মহেন্‌জোদড়োতে তার পরিপূর্ণ না হলেও বিশেষ একটি বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় স্বরের বিকাশে। তা ছাড়া সামাজিক আচার, পূজা, দেবতা, অগ্নিসৎকার প্রভৃতি প্রথা থেকে বৈদিক যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য মহেন্‌জোদড়ো সভ্যতা যে পুরোপুরি বৈদিক, এ কথা অবিসংবাদিতভাবে এখনো প্রমাণিত হয়নি। তবে সুপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় সংগীতের যে সব উপাদান বা নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে কিন্তু তখনকার সংগীতের রূপের ও বিকাশের সুস্পষ্ট কোনো ইতিহাস পাওয়া কঠিন। তবে সেই সুপ্রাচীন যুগের সভ্যতায় যে সংগীতের অনুশীলন হ'ত সে কথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়।

ভারতের বৈদিক সাহিত্যগুলিতে অবশ্য ভারতীয় সংগীতের সুষ্ঠু রূপের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। গান তখন সামগান। 'সাম' শব্দে গানকেই বোঝায়। আচার্য সায়ণ বেদভাষ্যভূমিকায় বলেছেন: "গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি"[২]—অর্থাৎ ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে সুর যোজনা করে 'সাম' (সামগান) গান করা হ'ত। সামগানে চার থেকে

বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ (চৌখাম্বা সংস্কৃত সং), পৃঃ ৬৭

সাত স্বরের প্রয়োগ ছিল। সাত স্বরের নাম ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, আতিসর্য ও ক্রুষ্ট এবং এদের বলা হ'ত বৈদিকস্বর। পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল যুগে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের প্রচলন ছিল। অনেকের অভিমত যে বৈদিক সাত স্বরের পাশাপাশি লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরেরও বিকাশ ছিল। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে যে গান্ধর্ব-গানের সৃষ্টি ও প্রচলন হয়, তাতে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। বৈদিক গানের প্রথমাদি সাত স্বর সাধারণতঃ ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গান্ধর্বগানের ষড়্‌জাদি সাত স্বর থেকে নামে ও স্বরোচ্চারণে (tonality) ভিন্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় শিক্ষাকার নারদ (১ম শতাব্দী) ঐ দুটি শ্রেণীর স্বরের মধ্যে একটি সাম্যসূত্র নির্ণয় করেন এবং বলেন,

যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্তৃষভঃ স্মৃতঃ॥ (১)
চতুর্থঃ ষড়্‌জইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
ষষ্ঠো নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥ (২)[৩]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে বলেছেন: "তিনি 'বেণু' বলতে লৌকিক সংগীতকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সামগদের যেটি প্রথম স্বর, লৌকিক গানে সেটি মধ্যম স্বর, অর্থাৎ বৈদিকের প্রথম স্বরের কম্পনসংখ্যা ও ধ্বনির সাম্য আছে লৌকিকের মধ্যম স্বরের সঙ্গে। সেরকম দ্বিতীয়ের সঙ্গে গান্ধারের, তৃতীয়ের সঙ্গে ঋষভের, চতুর্থের সঙ্গে ষড়্‌জের, পঞ্চমের সঙ্গে ধৈবতের, ষষ্ঠের সঙ্গে নিষাদের ও সপ্তমের সঙ্গে পঞ্চমের স্বর ও উচ্চারণগত ঐক্য আছে।"[৪]

তা ছাড়া অনুন্নত সহজ সরল গ্রাম্য বা আঞ্চলিক—যাকে

---

৩ নারদীয়াশিক্ষা (১ প্র. পঞ্চম খণ্ড), পৃঃ ৭

৪ সংগীত ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ২৪৭

সাধারণতঃ 'ফোক্ সঙ' (folk song) বলা হয়, তার প্রচলন অবশ্যই সাধারণ সমাজে ছিল। আর উন্নত বৈদিক সমাজে বৈদিক গান যথা—গ্রামেগেয়, অরণ্যেগেয়, উহ, উহ্য, বা রহস্য গানেরও প্রচলন ছিল। বৈদিক গানে অবশ্য প্রথমাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কিন্তু অনুন্নত সাধারণ সমাজে প্রচলিত সহজ সরল গানে লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের প্রচলন ছিল বলেই অনেকে অনুমান করেন।

বৈদিক গানে নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ ছিল কিনা এ নিয়েও বাদানুবাদের অন্ত নেই। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যগুলির অনুশীলন থেকে জানা যায়, তখনকার গান বেশ উন্নত ও সুসম্বদ্ধই ছিল এবং বাদ্যও নৃত্যের অনুগামী ছিল। বৈদিক যুগে নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা সংগীতের প্রসঙ্গে মাননীয় ডাঃ ভি. এম. আপ্তে বলেছেন,

"Music, both vocal and instrumental, and dancing continue to be among the amusements of this age. The Sāmaveda is a standing monument to the wonderful skill and originality of the ancients in the science of vocal music. Several professional musicians are known, and the variety of instrumental music in vogue can be inferred from the types of musicians enumerated, such as lute-players, flute players, conch-blowers, drummers etc. Among the musical instruments known are the āghāti (cymbol) to accompany dancing (RV and AV), drums, flutes, and lutes of various types, and the harp or lyre with a hundred strings (*vāna*). Many other instruments, of which we cannot form an exact idea, are also named."[৫]

[৫] *The History and Culture of the Indian People* (The Vedic Age), Vol. I—p. 456

বিভিন্ন স্বরসমাবেশে ও প্রয়োগনৈপুণ্যে সামগান হয়ে উঠেছিল মধুর বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন গায়নপদ্ধতিতে সামগান পেয়েছিল প্রসার। ঋষিদের উদার মনোবৃত্তি অসংখ্য গায়নপদ্ধতির আবেষ্টনীর মধ্যে মুক্তি দিয়েছিল সামগানকে। ঋক্ থেকে সামগান রচনা সম্বন্ধে শবর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন,

মীমাংসাদর্শনের (১।২।২৬)

"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ। আহক ইমে গীত্যুপায়া নাম? উচ্যতে গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যাভ্যন্তর প্রযত্নজনিতস্বর—বিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলপ্যা। সা নিয়ত প্রমাণা, ঋচি গীয়তে। তৎসমপাদনার্থোৎয়মৃগক্ষর-বিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।"[৬]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এর অর্থ করেছেন : "বৈদিক যুগে 'গান' বলতে কি বুঝাত তার উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেছেন গান একটি আভ্যন্তরিক প্রযত্ন বা কার্য। প্রাণবায়ু নাভি থেকে কণ্ঠে চালিত ও আহত হয়ে শব্দের সৃষ্টি করে। স্বর রূপায়িত হয় কণ্ঠদেশে। কণ্ঠই উপায় বা মাধ্যম, আর প্রাণবায়ুই গানের উপযোগী শব্দ তথা নাদ সৃষ্টির কারণ। সামগানে ঋগক্ষরবিশিষ্ট স্তোভগুলি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক মন্ত্র বা স্তোত্র। স্তোভকে পুষ্পও বলা যেতে পারে, কেননা গানের জন্ম ব্যবহৃত ঋগক্ষরগুলি ঋক্মন্ত্ররূপ কাণ্ডে যুক্ত হলে তা কুসুমিত তথা অলংকৃত বলে গণ্য হ'ত।"[৭]

সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতাব্দীতে গান্ধর্ব গীতিধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রহ্মাভরত, সদাশিবভরত ও অন্যান্য গুণীরা গান্ধর্ব সংগীতের রূপকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশে সংগীতের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাল্মীকির

৬ বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ (চৌখাম্বা সংস্কৃত সং), পৃঃ ৬৮

৭ সংগীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ), পৃঃ ৬, ৭

আদেশে প্রথম তাঁর সৃষ্ট মানসপুত্র লবকুশই রামায়ণগানের প্রচার করেন গান গেয়ে, দেশে দেশে, নগরে নগরে। তাঁর এই পালিত পুত্রদ্বয়ই তাঁদের সাংগীতিক কলাকুশলতায় উৎসবাদিতে ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও সংগীতশাস্ত্রবিদ্‌দের সম্মুখে রাগধর্মী তানতালযুক্ত সংগীত পরিবেশন করে রামায়ণগানের বিশিষ্ট রূপ দান করেছিলেন। গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিনের সমন্বয়েই যে সংগীত, তার সুস্পষ্ট আভাসও রামায়ণকার দিয়েছেন। অতএব রামায়ণেই প্রথম "সংগীত" শব্দটি পাওয়া যায়। যথা—

ষটপাদতন্ত্রীমধুরাভি ধানং
প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্॥ ৩৬॥[৮]

অর্থাৎ বনে যেন সংগীত হচ্ছে—ভ্রমরঝংকার তার মধুর বীণা-ধ্বনি, ভেকের রব কণ্ঠতাল, মেঘগর্জন মৃদঙ্গনিনাদ।[৯]

রামায়ণের যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ) শুদ্ধ জাতিগানের অনুশীলন হ'ত। শুদ্ধ সপ্তজাতি হল ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী বা নিষাদবতী। এরা ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামেই লীলায়িত ছিল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা ঠিক যে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ এমনকি কালিদাসের যুগেও গান্ধার গ্রামের প্রচলন ছিল। জাতিকে ভারতীয় আদিম রাগ হিসাবে গণ্য করা হয়। কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতি মহাকাব্যে পাওয়া যায়। অতএব রামায়ণে

৮ রামায়ণম্। শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্। অষ্টা-বিংশঃ সর্গঃ, পৃঃ ৬২২

৯ বাল্মীকি-রামায়ণ। রাজশেখর বসু। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃঃ ২৩০

জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ষড়্জাদি সপ্তস্বর, আটটি রস এবং বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত লয়াদির বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায় একে গান্ধর্বগান বলা যেতে পারে। যথা—

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ৮ ॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী-রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥ ৯ ॥
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থান-মূর্চ্ছন-কোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥ ১০ ॥[১০]

অর্থাৎ—পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়্জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার করুণ হাস্য রৌদ্র ভয়ানক বীর প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইতে লাগলেন। সেই দুই ভ্রাতা গান্ধর্ব-বিদ্যা এবং স্বরের উচ্চারণস্থান ও মূর্ছনায় অভিজ্ঞ, তাঁদের কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাঁরা গন্ধর্বের তুল্যই সুন্দর এবং রূপলক্ষণসম্পন্ন।[১১]

রামায়ণের পর মহাভারত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এবং খিল হরিবংশে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের তৌর্যত্রিক সমন্বয় রয়েছে। তা ছাড়া সাত স্বরে লীলায়িত ছটি গ্রামরাগ, ভিন্ন ভিন্ন রাগ, তিন স্থান (মন্দ্র, মধ্য ও তার), মূর্ছনা, নৃত্য, নাট্য ও বাদ্য এবং বহুবিধ তাল প্রভৃতির তখন প্রচলন ছিল। তৎকালীন সংগীত বৈদিক ও লৌকিক—এই উভয় ধারায়ই প্রবর্তিত হয়েছিল। সমস্ত যাগযজ্ঞাদিতে দু' রকম সংগীতেরই ব্যবহার ছিল, তথাকথিত

১০ রামায়ণম্। শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্। বালকাণ্ডম্। চতুর্থঃ সর্গঃ, পৃঃ ৭২

১১ বাল্মীকি-রামায়ণ। রাজশেখর বসু। বালকাণ্ড, পৃঃ ৬

মার্গসংগীত এবং স্তোভ, স্তোম, স্তুতি, গাথা, সামগানাদির। রামায়ণের যুগ থেকে মহাভারতের যুগে দ্বাপরে সংগীতানুশীলন হয়েছিল কম, তবে কণ্ঠসংগীত থেকে যন্ত্রসংগীত ও পূর্ণাঙ্গ নৃত্যের প্রচলন ছিল বেশী। বিরাটপর্বে পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-সময়ে বৃহন্নলারূপী ছদ্মবেশী অর্জুন বিরাটরাজ অন্তঃপুরে নিযুক্ত হয়েছিলেন নৃত্য, গীতাদি শিক্ষা-দানের নিমিত্ত। যথা—

গীতং নৃত্যং বিচিত্রং চ বাদিত্রং বিবিধং তথা।
শিক্ষয়িষ্যাম্যহং রাজন্বিরাটভবনে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥[১২]

ছালিক্যগান ও হল্লীসকনৃত্য তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই ছালিক্যসংগীত গ্রামরাগাদিরই সংমিশ্রণে সৃষ্ট এবং এটি পুরো-পুরিই রাগসংগীত।

বৈদিক সাহিত্যেই ছিল কথাকাহিনীর বীজ নিহিত। প্রায়শঃ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় রাজন্যবর্গ ও মুনিঋষিদের বিভিন্ন কার্যকলাপের কাহিনী। রাজসূয় এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল এই অংশগুলি পাঠ এবং গান করা। রাজাদের এই কীর্তিকাহিনীগুলি পাঠ করতেন পুরোহিত। একজন ক্ষত্রিয় বীণাগাথী উপস্থিত মতে আখ্যান রচনা করতেন এবং বেণুবীণাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নানাপ্রকারে গান করে যজ্ঞাদি স্থলে একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করতেন। যে কোনো শক্তিশালী বীরদের প্রশংসাসূচক গাথা ও স্তুতিবাদ গান করা বৈদিক অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অংশ বলে গণ্য ছিল। তাই বৈদিক সাহিত্যাদির পরের সাহিত্যগুলিতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেও বৌদ্ধসাহিত্য ও জাতকমালাদির মধ্যে কথাকাহিনীর পদ্ধতিতেই সংগীত প্রবিষ্ট হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের

১২ "*The Virataparvan*" edited by Raghu Vira. Vol. V—p. 12

মধ্যে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচুর বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধমারসমৃ্যুক্ত, ভিক্ষুণীসম্যুক্ত এবং অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে দেখা যায়, "থেরগাথা" ও "থেরীগাথা" ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরাশ্রিত হয়ে নৃত্য ও তাল সহযোগে বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদির সঙ্গে বিবিধ প্রমোদানুষ্ঠানে গান করা হ'ত।

এক প্রান্তে বৈদিক সাহিত্য অপর প্রান্তে বৌদ্ধ জাতকমালা এবং অবদানসাহিত্যগুলিতেও ভারতীয় সংগীতের উপাদান যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাগ্বৈদিক থেকে বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত সংগীতের ধারা প্রবাহিত তো ছিলই, বরং পরবর্তী কালে আরো সুস্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত হয়েছিল। বৌদ্ধ যুগের গীতি রূপেও নৃত্য বা বাদ্যের সমাবেশ ছিল। বিভিন্ন শিলালেখমালায় এবং প্রস্তরের গাত্রে খোদিত ভাস্কর্যচিত্রেও তাদের জ্বলন্ত নিদর্শনের অভাব নেই।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ৬৪ কলা তথা নাটক, নাট্যগীতি, নৃত্য, বাদ্য এবং সুসংগীতের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে প্রেক্ষাগৃহাদিতে অপ্রাপ্তযৌবনা নারী ও পরিণীতা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায়ই নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হ'ত। মৎস্যজাতক ও গুপ্তিলজাতকে "মেঘগীতি" অর্থাৎ মেঘের আহ্বানসূচক গীত এবং উত্তম ও মধ্যম মূর্ছনার উল্লেখ রয়েছে। এই "মেঘগীতি" মেঘরাগেরই সন্ধান দেয়। গুপ্তিলজাতকে গান্ধর্বসংগীত, সপ্ততন্ত্রী বীণা ও অপ্সরাদের নৃত্যগীতেরও উল্লেখ আছে। তৃতীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর নৃত্যজাতকে সংগীতের বিশেষ আলোচনা না থাকলেও বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ নৃত্যের নির্দেশ রয়েছে। এ ছাড়া চুল্ল-প্রলোভন জাতক, ক্ষান্তিবাদক জাতক, কাকবতী জাতক, পাদকুশল জাতক, চিত্রসম্ভূত জাতক, কুশজাতক, ভূরিদত্তজাতক ও বিদুরপণ্ডিত জাতকাদিতে গান্ধর্ব-গীত, নাটক, নাট্যগীতি, গাথা, প্রতিগানাদির উল্লেখ আছে। পক্ষীকুল-গীতি, বৈতালিকদের স্তুতিগান এবং রামায়ণ মহাভারতাদির মতো

কুশীলবের গানের কথাও আছে। সমস্ত আনন্দ উৎসব, অভিনয় ও নৃত্যগীতাদি যে স্ত্রীপুরুষ সমভিব্যাহারেই হ'ত এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত ও বাদ্যের ক্ষেত্রে নারীগণও যে পুরুষদের সমযোগ্যতা ও সমান স্থান অধিকার করেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সরা ও দেবদাসীদের সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান প্রতি উৎসবাদিতেই হ'ত। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রতি-দ্বন্দ্বিতাও চলত। পূর্বোক্ত জাতকগুলিতে যেমন গন্ধর্বকিন্নরাদির নৃত্য-গীতের কথা রয়েছে, বিশ্বন্তরজাতকেও ঠিক তদনুরূপই নৃত্যগীতের কথা আছে, কিন্তু বিশেষ করে ময়ুরময়ুরীর নৃত্য দেখতে পাই এই জাতকে। এখানে এই নৃত্য যে ময়ুরময়ুরীর অনুকরণেই নটনটীর দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল, এইটিই অনুমান করা যায়।

কাহিনীমূলক বৌদ্ধসাহিত্যকে অবদান বলা হয়। জাতকও অবদানসাহিত্যের অন্তর্গত। সেজন্য জাতককে বলা হয় "বোধি-সত্ত্বাবদান"। "অবদান" সংস্কৃত ভাষায় ও "জাতক" পালি ভাষায় সংকলিত হয়েছিল। এই জাতকাদি রচিত হয়েছে গৌতমবুদ্ধের পূর্বজন্ম বিষয় অবলম্বনে। অবদানসাহিত্যে বুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল। জাতক এবং অবদান উভয়ই রচিত হয়েছিল বুদ্ধের প্রতি মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য। এদের মধ্যে যতটুকু সংগীতের কথার উল্লেখ রয়েছে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যের মানোন্নতির ক্ষেত্রে তার মূল্য কম নয়। ক্ষেমেন্দ্র রচিত "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা" গ্রন্থে গান্ধর্বগান তথা মার্গসংগীতের উল্লেখ দেখা যায়। এই অবদানসাহিত্যের ৮০তম পল্লবে সুভদ্রাবদানপ্রসঙ্গে গন্ধর্বরাজের সহস্রতন্ত্রী বীণাবাদনের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া হীনযানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ মহাবস্তু অবদানে সুরতাললয় সমন্বিত প্রাচীন গাথাগানগুলির বিশেষ উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে মুনি ভরত (খ্রীষ্টীয় ২য় অব্দ) তাঁর

পূর্বাচার্যদের রচনাশৈলী অনুকরণ করে "নাট্যশাস্ত্র" রচনা করেন। ভরতের সময়ে বৈদিক তথা সামগানের প্রচলন মাত্র সামগদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই তিনি নাট্যশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী গানের পরিচয় দিয়েছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতি > জাতিগান > জাতিরাগ-গুলিকে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম দুটিরই অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। কারণ ভরতের সময়ে গান্ধার গ্রামের প্রচলন লুপ্ত হয়েছিল। ভরত ১৮টি জাতিরাগ গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে ৭টি শুদ্ধ এবং ১১টি বিকৃত। ভরতের মতে মধ্যমা, পঞ্চমী ও ষড়্জমধ্যা এই তিনটি জাতিরাগ স্বরসাধারণের অন্তর্গত। এই সকল জাতিরাগের অঙ্গ ও অংশ ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম। তারপর ষাড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী, নৈষাদী, ষড়্জোদীচ্যবতী, ষড়্জকৈশিকী ও ষড়্জমধ্যমা। এই জাতিরাগগুলি ষড়্জ গ্রামকে আশ্রয় করে উৎপন্ন ও আধার গ্রাম ষড়্জেই লীলায়িত। গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী, গান্ধারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী, কর্মারবী বা কার্মারবী ও কৈশিকী এই ১১টি মধ্যম গ্রামে লীলায়িত। সাতটি স্বরের নামানুসারে শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিরাগগুলি উভয় গ্রামেই লীলায়িত। শুদ্ধ জাতিরাগ-গুলিতে সাত স্বরই থাকে, তা ছাড়া গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বরগুলির ব্যবহার হয়। ভরতের মতে একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতি-রাগের সঙ্গে মিশ্রিত হলে বিকৃতজাতির সৃষ্টি হয়। শুদ্ধ জাতির মধ্যে অন্য কোন রাগের সংমিশ্রণ নেই। রামায়ণের যুগে শুদ্ধ জাতিগানে কোমল স্বরের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ জাতিগানে দুটি মাত্র কোমল তথা বিকৃত স্বরের (অন্তর গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ) ব্যবহার ছিল বলে মনে হয়। ভরত জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ব ও ঔড়ব। যথা—

দশবিধজাতিলক্ষণম্—গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ন্যাসোপন্যাস এব চ।
অল্পত্বং চ বহুত্বং ষাড়বৌড়বিতে তথা ॥ ৭০ ॥[১৩]

দশ লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে রাগের এবং এগুলি থাকার জন্য ভরতের যুগেও যে রাগপদ্ধতি ছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ঠিক 'গ্রামরাগ' কথাটির উল্লেখ না থাকলেও, তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ নারদীশিক্ষায় (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) শিক্ষাকার নারদ ষড়্জ গ্রাম, পঞ্চম, কৈশিক, মধ্যম, কৈশিকমধ্যম, মধ্যম গ্রাম, সাধারিত এই সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ করেছেন। নারদীশিক্ষায় শিক্ষাকার নারদ ঋষিকল্প শাস্ত্রী কশ্যপকে মধ্যম গ্রাম সম্পর্কিত করে কৈশিক গ্রামরাগটির স্থষ্টিকর্তা বলেছেন। সংগীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগ সম্বন্ধে বলেছেন যে, মঙ্গলজনক ব্যাপারে এই রাগের ব্যবহার ছিল অর্থাৎ মঙ্গলাচার ও মঙ্গল-প্রবন্ধগান মঙ্গলপদযুক্ত করে গান করতে হলে কৈশিকরাগের প্রয়োজন হ'ত। সুতরাং এ কথা মনে করা বোধ হয় সমীচীন হবে যে, জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন গ্রামরাগের প্রচলন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের এবং তাঁর পূর্ববর্তী সমাজেও অব্যাহত ছিল।

জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলি ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্ছনা, মন্দ্র, মধ্য, তার তিনটি স্থান, শৃঙ্গারাদি আটটি রস ও ভাব, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিনটি লয় ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশে গান করা হ'ত। টীকাকার কল্লিনাথও নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত জাতিরাগ ও গ্রামরাগকে গান্ধর্বসংগীত বলে পরিচয় দিয়েছেন।

নাট্যশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় সংগীত আরো সুনিয়ন্ত্রিত ও অলংকার-যুক্ত হয়েছিল। ষড়্জাদি সাত স্বর ছাড়া বাদী, সংবাদী, অনুবাদী

১৩ নাট্যশাস্ত্রম্। শ্রীভরতমুনি-প্রণীতম্ (কাশী সং)। অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ, পৃঃ ৩২৪

ও বিবাদী স্বর উল্লিখিত হয়েছে। ভরত মাগধী প্রভৃতি গীতি, ধ্রুবা প্রভৃতি নাট্যগীতি ও কতকগুলি গ্রামরাগের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রা ও বিপঞ্চী বীণা ছাড়াও আরো কিছু বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন। পূর্বরঙ্গের বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত, বর্ধমানক প্রভৃতি গানের মতো মগধদেশজাত মাগধী বা অর্ধমাগধী গীতি গাওয়া হ'ত। পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে চচ্চৎপুট ও চাচপুট তালে ধ্রুবা গীতির অনুষ্ঠান হ'ত। সেই ধ্রুবা গীতিও বৈদিক সামগানেরই পরবর্তী লৌকিক রূপ।

নাট্যশাস্ত্রের পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে দত্তিল, কোহল, স্বাতি, শাণ্ডিল্য, শার্দুল, যাষ্টিক, তুম্বুরু, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি, মতঙ্গ প্রভৃতি সংগীতগুণীরা অভিজাত দেশী রাগের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের গান্ধর্বগানই পরবর্তী কালে পরিবর্তিত আকারে ও উপাদানে দেশীগান বলে পরিচিত হয়েছে। বাগেগয়কার গ্রহ-অংশাদি দশ লক্ষণ সমন্বিত যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছিলেন তাদের "দেশী" সংগীত বলা হয়। সুতরাং "দেশী" গ্রাম্য বা আঞ্চলিক গান (folk music) নয়, তা শাস্ত্রীয় ক্ল্যাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত গান বা সংগীত। বৈদিক সামগান গ্রামেগেয় গান থেকেই বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ ও মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত দেশীগানের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং দেশী রাগগুলি গ্রামরাগ থেকে ও গ্রামরাগ জাতি-রাগ থেকে সৃষ্টিলাভ করেছিল।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পর মতঙ্গের (৫ম-৭ম শতাব্দী) "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মতঙ্গ গান্ধর্বসংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে আর্চিক, গাথিক, সামিক গানগুলির নামোল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি শ্রুতি, জাতি, স্বর, গ্রহ, অংশ, বর্ণ, অলংকার, গীতি প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন এবং ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের মাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

তাঁর সময়ে রাগগীতিকে আশ্রয় করে অভিজাত দেশী রাগগুলির বিকাশ হয়েছিল। সে সময়ে বা তার পূর্বে কতকগুলি বিদেশী সুর তথা রাগের আর্যসংগীতের গোষ্ঠিতে আমদানি হয়েছিল দেখা যায়। দেশের নামে, জাতির নামে বেশীর ভাগ রাগগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। যথা—শকরাগ, শকতিলক, শকমিশ্রিত, তুরুষ্কতোড়ি ইত্যাদি।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে নবম অথবা একাদশ শতাব্দীতে আমরা জৈনশাস্ত্রী পার্শ্বদেব রচিত "সংগীতসময়সার" গ্রন্থের সন্ধান পাই। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীর পর এই গ্রন্থে দেশী রাগগুলি ছাড়া সংগীতের বিবিধ উপকরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পার্শ্বদেব রাগগুলিকে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, উপাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ প্রভৃতি ভেদে ভাগ করেছেন। প্রত্যেকটি রাগের সম্পূর্ণ, ঔড়ব ও ষাড়ব জাতির পরিচয় আছে। অন্যান্য রাগ ছাড়া সংগীতসময়সারেই আমরা প্রথম ভৈরব এবং ভৈরবী এই দুটি রাগের সন্ধান পাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ও জাতির সুরগুলিকে অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত করা ছাড়া দ্রাবিড়, তুরুষ্ক, দাক্ষিণাত্য, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় রাগের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। পার্শ্বদেব মতঙ্গকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করলেও আলাপ, আলপ্তি ও হস্তপাট সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশিষ্ট মতের পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীতসময়সারের পরেই নারদের (২য়) "সংগীতমকরন্দ" গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মকরন্দকার নারদ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পুস্তকে রাগ-রাগিণী এবং গান্ধার গ্রামের পরিচয় আছে। তিনি পুরুষ রাগ হিসাবে বঙ্গাল, সোম, শ্রী, ভূপালী, ছায়া, গৌড়, শুদ্ধ, হিন্দোলিকা, আন্দোলী, দম্বুলী প্রভৃতি, স্ত্রী রাগ হিসাবে তুণ্ডী, তুরুষ্কতুণ্ডী, মল্লারী, মাহুরী, পৌরালিকী, কাম্ভারী, ভল্লাতী, সৈন্ধবী

প্রভৃতি এবং নপুংসক রাগ হিসাবে কৈশিকী, ললিত, ধন্নাশী, কুরঞ্জিকা, সৌরাষ্ট্রী, দ্রাবড়ী শুদ্ধা, নাগবরাটিকা প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

মকরন্দকারের পর শার্ঙ্গদেবের (১২১০-১২৪৭ খ্রীঃ) "সংগীত-রত্নাকর" একটি বিস্তৃত প্রামাণিক উপাদানপূর্ণ গ্রন্থ। শার্ঙ্গদেব শাস্ত্র-গ্রন্থসাগর মন্থন করে তাঁর অমূল্য "সংগীত-রত্নাকর" গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—যে গ্রন্থ শুধু আজ কেন, অনাগত ভবিষ্যতের বুকেও অমর হয়ে থাকবে। তিনি প্রধানত অভিজাত দেশী সংগীতেরই পরিচয় দিয়েছেন। তিরিশটি গ্রামরাগের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি গ্রাম-রাগগুলিকে গীতির আশ্রয় বলেছেন, অর্থাৎ গীতির দ্বারাই তিনি রাগগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারিত এই পাঁচটি গীতিভেদে রাগগুলি বিভক্ত। শার্ঙ্গ-দেব তাঁর গ্রন্থটিকে স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায় এই সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। তিনি চলবীণা ও ধ্রুববীণার সাহায্য নিয়ে শ্রুতির বিভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটি বীণায় বাইশটি করে শ্রুতির সংস্থান দেখিয়েছেন। রাগবিবেকাধ্যায়ে গ্রামরাগের সঙ্গে উপরাগেরও উল্লেখ আছে। স্বরাধ্যায়ে গীতিপ্রকরণে তিনি সাতটি "কপালগীতি"-র উল্লেখ করেছেন। কপাল এবং কম্বল প্রভৃতি গীতি শিবের গুণগানে পূর্ণ থাকত। কপাল গীতিগুলি সাতটি স্বরের নামে নামাঙ্কিত এবং অনেকে এগুলিকে গান্ধর্ব বা মার্গ শ্রেণীভুক্ত বলেছেন।

সংগীত-রত্নাকরে প্রবন্ধাধ্যায় একটি বিশিষ্ট এবং নূতন অবদান। এই অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব গান্ধর্ব এবং গান এই দুটি বিভাগে ভারতীয় সমস্ত গীতিশ্রেণীকে বিভক্ত করেছেন। গান্ধর্ব হচ্ছে মার্গসংগীত এবং গান বলতে অভিজাত দেশী সংগীতকে বোঝায়। প্রবন্ধসংগীতকে তিনি অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ—এই দু ভাগে ভাগ করেছেন। অনিবদ্ধ হচ্ছে আলাপ আর নিবদ্ধ হচ্ছে তালযুক্ত। প্রবন্ধগীত মূলত তিন

প্রকার—সূড়, আলি এবং বিপ্রকীর্ণ। প্রথম ছুটি শ্রেণী ছাড়া আর যে সব সাধারণ গান প্রচলিত ছিল, তার নাম বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণের মধ্যে তিনি ছত্রিশ রকম গানের নাম করেছেন। তার মধ্যে চর্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী, মঙ্গল প্রভৃতি পদগীতির নাম করা যেতে পারে। সংগীত-রত্নাকর আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে সাংগীতিক ঐতিহ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সংগীত-রত্নাকরের সামান্য মাত্র পরিচয় দেওয়া গেল। শার্ঙ্গদেবের সময়েই বলতে গেলে মুসলমান যুগের সূত্রপাত হয়।

শার্ঙ্গদেবের পর শারংধরপদ্ধতি (১৩০০-১৩৫৫ খ্রীঃ), হরিপাল প্রণীত সংগীতসুধাকর (১৩০৯-১৩১২ খ্রীঃ), লক্ষ্মীনারায়ণের সংগীত-সূর্যোদয় (১৫০৯-১৫৪৯ খ্রীঃ), রামামত্যের স্বরমেলকলানিধি (১৫৫০ খ্রীঃ), সোমনাথের (২য়) নাট্যচূড়ামণি (১৫৫০ খ্রীঃ), পুণ্ডরীকের সদ্রাগচন্দোদয় (১৫৯০ খ্রীঃ), সোমনাথের রাগবিরোধ (১৬০৯ খ্রীঃ), গোবিন্দদীক্ষিতের সংগীতসুধা (১৬১৪ খ্রীঃ), বেঙ্কটমখীর চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা (১৬২০ খ্রীঃ), দামোদর মিশ্রের সংগীতদর্পণ (১৬২৫ খ্রীঃ), হৃদয়নারায়ণের হৃদয়কৌতুক (১৬৬৭ খ্রীঃ), অহোবলের সংগীতপারিজাত (১৭০০ খ্রীঃ), লোচনকবির রাগ-তরঙ্গিণী (১৭০০ খ্রীঃ), শ্রীনিবাসপণ্ডিতের রাগতত্ত্ববিবোধ (১৭০০-১৭৫০ খ্রীঃ), তুলজার সংগীতসারামৃত (১৭২৯-১৭৩৫ খ্রীঃ), রাজা নারায়ণের সংগীতনারায়ণ (১৮০০ খ্রীঃ), কবি নারায়ণের সংগীত-সরণি (১৮০০ খ্রীঃ), গোপীনাথের কবি চিন্তামণি (১৮০০ খ্রীঃ), গোবিন্দের সংগীতশাস্ত্রসংক্ষেপ (১৮০০ খ্রীঃ), সংগীতকৌমুদী (১৯০০ খ্রীঃ), কাশীনাথের রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর (১৯১৪ খ্রীঃ), বিষ্ণুশর্মার অভিনবরাগমঞ্জরী (১৯২১ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ ভারতীয় সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে অমূল্য। বাংলাদেশের সাহিত্যে ও সংগীতে উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় এবং এই গবেষণায়

যে আলোচনার ধারা অবলম্বিত হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হবে যে বাংলা দেশের সংগীতে ভারতীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট রাগরাগিণীর রূপই সুস্পষ্ট। বাংলার চর্যাগীতি, নাথগীতিকা, গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীকীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, তর্জা, যাত্রাগান, গম্ভীরা, চণ্ডীর গান, মনসার গান প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের গান এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কবি নজরুল প্রভৃতির গীতিধারা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে রসসিঞ্চিত করে রেখেছে। তা ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই আধুনিক গুণীরা বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় সংগীতের আলোচনাকে সুগম করেছেন। বাংলা দেশে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি গুণীদের সংগীত-অবদানও উল্লেখযোগ্য।

॥ সংগীতের বিকাশে অধ্যাত্ম-প্রেরণা ॥

বৈদিক যুগের যা কিছু ক্রিয়াকর্ম, তা সর্বসাধারণ ও সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত উদ্‌যাপিত হ'ত এবং ঋষিরা সংগীতকেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন কর্মানুগ করে মানবসমাজের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-উৎসবের মাঝে। অরণ্যবাসী ঋষিগণ যাগযজ্ঞ ও উপাসনায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতানুক্রমে সৃষ্ট স্বরাদির মাধ্যমে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতেন, সেই মন্ত্রগুলি অরণ্যেগেয়গান নাম নিয়েছে। উদাত্তাদি উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর হিসাবে বেদে ব্যবহৃত হ'ত। তা ছাড়া শিক্ষাগুলির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি বৈদিক স্বর থেকে ষড়্‌জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। তাই শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ তথৈব তৎ ॥
লক্ষণং বর্ণয়িষ্যামি দৈবতং স্থানমেব চ ॥ (১ম শ্লোক)
... ...
গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ ॥
ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ ॥ (৬ষ্ঠ শ্লোক)
উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ ॥
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥[১] (৭ম শ্লোক)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবতের, উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধারের এবং স্বরিত থেকে ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চমের সৃষ্টি হয়েছিল। অনুদাত্তের নাম মন্দ্র বা খাদ, উদাত্ত তার বা চড়া এবং স্বরিত সমতারক্ষক মধ্যস্বর।"[২]

১ শিক্ষাসংগ্রহঃ (কাশী সং), পৃঃ ১-২

২ রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ৫০

আভ্যুদয়িক এবং আভিচারিক প্রয়োগ অনুযায়ী গানের অনুশীলন হ'ত। গোড়াকার দিকে অভিজাত গানের প্রচলন ছিল হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে। সে যুগে অরণ্যেগেয়গান যেমন প্রসারলাভ করেছিল অরণ্যবাসী ঋষিদের ভিতরে, তেমনি গ্রামে-গেয়গান ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল (গ্রামবাসী) সাধারণ জনগণের মধ্যে। ক্রুষ্টাদি সাত স্বর যেমন বৈদিক মন্ত্রাদিকে আশ্রয় করেছিল এবং বৈদিক স্বর বলে অভিহিত হয়েছিল, তেমনি ষড়্‌জাদি সাত স্বর ও লোকসংগীতে লৌকিক স্বর নাম নিয়ে সমমর্যাদাই পেয়েছিল সাধারণ লোকসমাজে। স্বরসংখ্যার প্রয়োগে গানগুলির নাম ছিল। একটিমাত্র স্বর দিয়ে যে গান গাওয়ার রীতি ছিল, তার নাম আর্চিক। গাথিকে দু' স্বরের গান হ'ত। সামিকে তিন স্বরের প্রয়োগ ছিল। স্বরান্তরে চারটি, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয় ও সম্পূর্ণ গানে সাত স্বর সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। তদানীন্তন সমাজে সংগীত বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল শাখাভেদে, রুচিভেদে এবং রীতি পরিবর্তনে। তাই বহুবিধ গানের উল্লেখ দেখা যায় বেদ বা সংহিতা থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ, সূত্রসাহিত্য, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির মধ্যে। "সংগীত" শব্দের প্রয়োগ তখন ছিল না। গান, উদ্‌গান, গীতি, উদ্‌গীতি, গাথা, উদ্‌গাথা, স্তোম, স্তোভ, স্তোত্র, গান্ধর্ব, উহ ও উহ্য প্রভৃতি এত প্রকারের গানের প্রচলন ছিল অরণ্যবাসী ঋষি ও লৌকিক সমাজে। প্রাতিশাখ্যাদি ও শিক্ষাগুলিতে দেখা যায়, একটি থেকে অপরটিতে সংগীতের প্রগতি এবং এই বৈদিক যুগেই যেমন হয়েছিল সংগীতের উৎপত্তি, তেমনি তা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল ঐ যুগেরই শেষের দিকে।

তখনকার সংগীতস্রষ্টাগণ শুধু সাতটি স্বর সৃষ্টি করেই সংগীতের চলাপথ সেখানে বন্ধ করে দেননি, প্রতিটি স্বরের দেবতা ও বর্ণ কল্পনা করেছেন। তান, মূর্ছনা, গ্রাম, অলংকার, জাতি এবং শ্রুতি

সমস্তই নিখুঁতভাবে নিরূপিত করে পূর্ণ সংগীতস্রষ্টার মর্যাদা অর্জন করেছেন।

তাই তো বলতে হয় আদি সংগীত ছিল প্রকৃতিরই পরিপূর্ণ ভাণ্ডারে। তবে মানুষ পেয়েছে যতটুকু, দিয়েছে তার অনেক বেশী। পাখীর কণ্ঠের ভাষাহীন অর্থহীন সুরকে অর্থযুক্ত করে তুলেছে মানুষ ভাষার ভিত্তিতে ও ভাবসম্পদের আস্তরণে। পশুর অসম্বদ্ধ চলার ছন্দগতিকে নিয়ে মাত্রার আনুগত্যে শৃঙ্খলার বেড়ার বেষ্টনীর মাঝ অসংগতিকে সংগতি-সুষমাতে পরিণত করেছে। প্রকৃতির ভাণ্ড শূন্য করে নেবার স্পর্ধা মানুষের নেই, যতটুকু আহরণ করেছে, প্রকৃতির মর্যাদা দিতে প্রয়াস পেয়েছে তার অনেক বেশী। বন্য কুসুমে গন্ধের অভাব ছিল না, সৌন্দর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাকে গ্রহণ করে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে মানুষই। তার সৌন্দর্যের, গুণের উপলব্ধি করেছে মানুষ। মহতী শক্তির সত্তা অনুভব করেছে মহামানবই, তাই সে বলেছে দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান। এমন কি সাহসী হয়েছে বলতে "সোহং" অর্থাৎ আমিই সেই। যদিও এই অনুভূতি আসতে অনেক যুগ কেটে গেছে। তেমনি সংগীতের মধ্যে অধ্যাত্ম-ভাবের আবির্ভাব হতেও সময় লেগেছে অনেক। তাই বৈদিক যুগের প্রথম দিকে ছিল শুধু মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অভাব-অভিযোগ পূরণের চেষ্টা। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অধিদেবতাদের কল্পনা করে, তাঁদের আহ্বানমন্ত্র সুরে সুরে পাঠ করে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া ও প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই বারিবর্ষণের জন্য পুরনারী সমভিব্যাহারে ঋষিগণ জলধিদেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে দিতেন যজ্ঞে আহুতি, জানাতেন প্রার্থনা অগ্নিদেবতার মাধ্যমে। বৈদিক সংগীতে অধ্যাত্ম প্রেরণা, দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন অনেকটা বাস্তব পরিবেশ প্রভাবিত ও বাস্তব প্রয়োজনের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। তখন অন্তরের অনুভূতি ও

বাস্তবের প্রভাব দুইই বেদমন্ত্রের সংগীতধারায় অভিব্যক্তি পেয়েছিল। উপনিষদ যুগের সংগীতে অন্তরের অধ্যাত্ম প্রেরণা, ধ্যানানুভূতি বৈদিক যুগের সঙ্গে তুলনায় আরো সূক্ষ্মতর, উন্নততর রূপ পেয়েছে। বাহির সেখানে গৌণ হয়েছে, বাহিরের প্রতিবেশ পূর্বের মতো এত সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়নি। হয়তো বাইরের অভাব, বস্তুসম্পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা অনেকটা নিবৃত্ত হয়েছিল। অন্তরের আকৃতি, ভগবৎ-স্বরূপের ধ্যানকল্পনা সমস্ত বাইরের প্রভাবকে ছাপিয়ে সংগীতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই পরিপূর্ণ বিকাশের যুগে, আত্মোপলব্ধির অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিল ঔপনিষদিক যুগের উন্নততর মানুষ। তখনই এল সংগীতের মধ্যে বিশুদ্ধতর অধ্যাত্ম প্রেরণা, ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগসূত্র স্থাপন করতে সন্নিবেশিত হল আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ গাথা-সকল সুরের মাঝে। তাই তো বৈদিক ও ঔপনিষদিক সাহিত্যাদির প্রতি ছত্রে ছত্রে মেলে সংগীতের সন্ধান ও আধ্যাত্মিকতার বাণী। ভারতের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও আধ্যাত্মিকতা সকল উৎকর্ষেরই মূল আধার এই বৈদিক যুগ। এই আধ্যাত্মিকতা বৈদিক যুগ থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছে ভারতবর্ষীয় মানুষকে। তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে, অনুষ্ঠানে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সকল সুখ-দুঃখে ও উৎসবে এই মঙ্গলময় আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপোষক সংগীতের প্রচলন দেখতে পাই। তাই তো ই. বি. হ্যাভেল বলেছেন,

"The poet-priests and chieftains who composed the Vedic hymns and expressed their communings with the Nature spirits in such beautiful imagery, were great artists who gave to India monuments more durable than bronze; and already in the Vedic period, centuries before Hellenic culture began to exert its influence upon Asia, India has conceived the

whole philosophy of her art. It was the Vedic poets who first proclaimed the identity of the soul of man with the soul of Nature, and laid claim to direct inspiration from God. Vāc, the Divine word, they said, took possession of the rishis, entered into the poet's mind, and made him one with the Universal self.

This idea of the artist identifying himself with Nature in all her moods is really the key-note of all Asiatic art, poetry, and music."[৩]

বৈদিক যুগের ঋষিরা যখন সুরবিদ্ হলেন অর্থাৎ সুরের প্রকৃতি অবগত হলেন, তখনই এল সংগীতে আধ্যাত্মিক যুগ। তাঁরা দেখলেন, এই সংগীত একটি মনোমুগ্ধকর মধুর বস্তু এবং এই সুর মানবাদি থেকে আরম্ভ করে সর্বজীবেই বর্তমান। সংগীত যেমন লোক-চিত্তাকর্ষক তেমনি আত্মচিত্তবিনোদনকারী। এই মধুর সুরধ্বনি চিত্তের একাগ্রতা সাধিত করে বিশ্বাত্মার সন্ধান দিতে পারে, অতএব এই সুররূপ রসসমুদ্রে যদি বিক্ষিপ্ত মনকে মানুষ ডুবিয়ে দেয়, তা হলে মনের বহির্বৃত্তিনিচয় রসসিক্ত হয়ে শান্ত ও সুস্থির রূপ ধারণ করবে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ অতি সহজ উপায়ে সাধিত হবে। আর চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হবে না, কেননা, যে একবার অমৃতের সন্ধান পেয়েছে, সে কি আর পুনর্বার অমৃতপানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে বহির্জগতে ফিরে আসে? অন্য যোগাদিতে যেমন চরম অবস্থায় উপনীত না হলে আনন্দোপলব্ধি হয় না, এই মধুর সংগীতযোগে তা নয়। সুরের সাধনার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ। অতএব সংগীতের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যপথ থেকে মনের ক্লান্তিবশতঃ মানুষ কখনই সংগীতযোগ থেকে চ্যুত

---

৩ *The Ideals of Indian Art* (1920), p. 7-8

হবে না। তাই তো শাস্ত্রকার বলেছেন, "ন বিদ্যা সংগীতাৎপরা"। এই সংগীতের দ্বারা সব কিছু সাধিত হতে পারে বুঝেই ঋষিগণ সংগীত সৃষ্টি করে জগতের কল্যাণ সাধিত করেছেন। তাঁরা জানতেন, বাক্য ব্যতীত একমাত্র সুরের দ্বারাও চিত্ত বিনোদন এবং স্থিরীকরণ হতে পারে। সুরের দ্বারা মনের ভাবের অভিব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু এ অতি সূক্ষ্মানুভূতির মাধ্যমে এবং সুকঠিন। তাই সেখানেও এল রূপচিন্তা এবং ভাবময় রূপকে প্রকাশ করতে সুরের সঙ্গে ঘটালেন কথার মিতালী। মনের অভিব্যক্তি, কামনা, বাসনা, প্রার্থনা ও আবেদনের সুস্পষ্ট অর্থ-প্রকাশের জন্য ভাষা গড়ে উঠল আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে, সুরও যোজিত হ'ল কথাপ্রকৃতির অনুকূলে।

সেই সুর ও কথা বৈদিক যুগেরই অবদান। সামগ ঋষিরা সুরের সঙ্গে কথার মিতালী পাতিয়ে দেবতা, কিন্নর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিতৃপুরুষ, পশুপক্ষী সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করেছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক যুগ ভারতবর্ষীয় মানবের চিরস্মরণীয়। ঐ যুগের আদি থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত সব কিছুই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, তবে ক্রমোন্নতির পথে সেই আধ্যাত্মিকতা সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরে গিয়ে পৌঁছেছিল, তাই যাগযজ্ঞাদিতে, মানবের কল্যাণে প্রথম দেবতুষ্টির পর্ব। যে ক্রিয়ার যে দেবতা, তাঁর তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র গান করা হ'ত, তার স্বরাদিও দেবাধিষ্ঠিত বলে নির্ণীত হয়েছিল এবং শেষ পর্বে ঐ স্বরাদিও আবার ব্রহ্ম বলে উক্ত হয়েছে। এমনি করে দেব-দেবী থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতা পৌঁছেছিল ঐ যুগে। সুরে, ভাবে ও ভাষায় সর্বত্রই রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া, তাই সেই যুগের আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রয়েছে আজও পর্যন্ত ভারতবাসীর মধ্যে নিবিড়ভাবে। ভারতবর্ষীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমাজ-তন্ত্র ও ভারতের রাজনীতি যা কিছু সকলই ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত। ধর্মানুগত্য-স্বীকৃতিই ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য, ধর্মানুশাসনই ভারতের জন-

গণকে চালিত করে অন্য দেশ থেকে ভিন্ন পথে। ক্রিয়া-কর্ম, যাগযজ্ঞ, শিক্ষাদীক্ষা, দানধ্যান, পঠন-পাঠন, যজন-যাজন, গীতবাদ্যনৃত্য, সাহিত্য-শিল্প সমস্তই ধর্মানুগ হয়ে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করে ঋগ্বৈদিক যুগের সেই অতীত স্মৃতি আজও অকাতরে বহন করে চলেছে। তাই তো দেখতে পাই, অতি সাধারণ মানুষ যাদের শিক্ষাদীক্ষায় জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হয়নি, প্রতিটি পাদক্ষেপে তারাও করে ধর্মের অনুসরণ। আজও শুনতে পাই তাদের মুখ থেকে সতত তত্ত্বজ্ঞানের কথা, তাদের কণ্ঠে গীত হয় অধ্যাত্মসংগীতের ভাবময় নিগূঢ় তত্ত্ব। এই আধ্যাত্মিক ভাব, এই আধ্যাত্মিক বাণী ও ধর্মানুগত্যের শৃঙ্খলা বেঁধে দিয়ে গেছেন বৈদিক ঋষিগণ। তাই তো আমরা আজও গর্ব করতে পারি এই বলে যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আমাদেরই পূর্ব-পুরুষ আদিযুগে ভারতবর্ষের ঋষিদের মধ্যে। মুক্তকণ্ঠে আমরা বলতে পারি, প্রথম সভ্যতার সোপান প্রস্তুত করেছিলেন বাহ্যিক বিলাস-পরিত্যাগী দৈহিক সুখপরাঙ্মুখ, অন্তরবিলাসী মনোবিজ্ঞানী ভারতীয় মহামানব, যাঁরা বলতে পারতেন, "মৃত্যু তুমি নাই"। মানুষই ঈশ্বর, মানুষের করায়ত্তই সব এবং ঐশীশক্তির পূর্ণবিকাশ যে মানুষেই সম্ভব হতে পারে, এই অনুভূতি একমাত্র ভারতীয় মহামানবের মধ্যেই জাগরূক হয়েছিল সেই যুগে, যে যুগের সংগীতস্রষ্টাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও উচ্চাঙ্গ সংগীত ও আধ্যাত্মিক সংগীতের ধারা চলে এসেছে ভারতের প্রতিটি সমাজ ও মানবের মধ্যে।

॥ বাংলা দেশে ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা ॥

বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বাংলা দেশ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ এবং আদি বাংলার মানুষদের সম্বন্ধে দু' চারটি কথা বলা দরকার, তা না হলে বাংলা সাহিত্যের পরিস্ফুরণ কি করে হয়েছে ও বাংলা সাহিত্যের উৎস এল কোথা থেকে তার সন্ধান দেওয়া যায় না। সেজন্যই আদি বাংলা দেশে যাঁরা এসে প্রথম বসবাস করেছিলেন এবং যাঁদের সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বাংলা সাহিত্য উঠেছে গড়ে—যাঁদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে, তাঁদের কথা বলতে হয়।

প্রথমেই বাংলা দেশে বাঙালীর বসবাস ও বাংলা ভাষা প্রবর্তিত হয়নি। বাংলা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন আর্যভাষাভাষীরা এবং তাঁদের ভাষাই প্রচলিত হয়েছিল বাংলা দেশে, কিন্তু যাঁরা ছিলেন প্রকৃত বাংলা দেশের বাসিন্দা, তাঁরা নাকি দ্রাবিড় কিংবা অস্ট্রিক জাতির ভাষা বলতেন বলে অনেকে অনুমান করেন—যদিও এর সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানের নাম, জাতির কথ্যভাষা ও কিছু কিছু চলতি ভাষা বা শব্দ হতে এই ভাষার কিছু আভাস পাওয়া যায় বলে তাঁরা অনুমান করেন। গুপ্তশাসনের সময়ে একরকম পরিপূর্ণভাবে আর্যভাষীরা ও তাঁদের আচার-ব্যবহার, শাসন, সংস্কৃতি বাংলা দেশকে অধিকার করে তাকে প্রায় আর্যাবর্তের একাংশে পরিণত করতে চলেছিল। সে সময়ে যারা অনার্যভাষী ছিল, আর্যভাষীদের চাপে পড়ে তারা অনেকেই ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্ আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল, নয়তো বা কোণঠাসা হয়ে অরণ্য অথবা প্রায় জনশূন্য পার্বত্য অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়েছিল, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে। ষষ্ঠ শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত

দ্রাবিড়ি ও অস্ট্রিকী ভাষার প্রচলন কিছু কিছু ছিল, কিন্তু সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই আর্যভাষার প্রাধান্যের জন্য অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষা বাংলা দেশ থেকে দূরীভূত হয় এবং একমাত্র আর্যভাষাই বাংলা দেশের জাতীয় ভাষারূপে পরিণত হয়। ঐ সময়ে চীন দেশের পরিব্রাজক হিউএন্-ৎ সাঙ্ বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করতে আসেন এবং কামরূপ-রাঢ় বঙ্গ-গৌড়দেশের জনগণের কাছে থেকে প্রায় ঐ এক জাতীয় ভাষাই শুনেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ আছে। কিন্তু যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও সংস্কৃত রূপ বদলে তা প্রাকৃত রূপ ধারণ করেছে। আর্যভাষীরা যখন প্রকৃষ্টরূপে উপনিবিষ্ট হয়েছেন বাংলা দেশে, তখন অঙ্গ ও মগধ এই দুই অঞ্চল হতেই রাঢ় এবং বরেন্দ্রভূমিতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন অধিকাংশ আর্য-ভাষীরা। বাংলা দেশে যে আর্যভাষার প্রচলন হয়েছিল, সেটি অঙ্গ মগধের একটি প্রাদেশিক বিশিষ্ট প্রাকৃতের রূপ, তাকে পূর্বীপ্রাকৃত বলা হ'ত। সেটি ছিল অবশ্য কথ্য ভাষা। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে যেমন সাহিত্যচর্চা ও রাজকার্যের জন্য সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হ'ত, বাংলা দেশও তেমনি তারই অনুসরণ করেছিল এবং এ কথা ঠিক যে, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত হতে বাঙালীর অনেকটা সময় লেগেছিল। পূর্বীপ্রাকৃত স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছিল অনুমান দশম শতকে। বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকদিন থেকে সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করে এলেও, প্রকৃত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, ভাষা যখন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলায় পরিণত হ'ল।

গুপ্তশাসন ও পালরাজত্বের সময়ে প্রথম দিকে চলতি কথার ভাষা ছিল প্রাকৃত। কিন্তু সাহিত্যাদি সৃষ্টি হ'ত সংস্কৃত ভাষায়, কেননা সাধুভাষায় সাহিত্যাদি লেখাই ছিল তখনকার সমাজের রীতি। গুপ্তযুগ পর্যন্ত বোধ হয় সাহিত্যচর্চার দিকে বাঙালী এতটুকু মন দিতে

পারেনি, তাই সে সময়কার কোনো বাঙালীর লেখা কাব্য বা নাটক প্রায় পাওয়া যায় না। তবে পালবংশের রাজত্বকালে অবশ্য বাঙালীর লেখা নাটক ও কাব্য ছু' চারখানি পাওয়া যায়। তার মধ্যে অভিনন্দের "রামচরিত" রূপ রামায়ণ কাব্য উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রাচীনতম রামায়ণ কাব্যে তৎসময়ে এ দেশে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয়েছে। এই কাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে রামভক্ত হনুমানের মুখ থেকে।

মহাকাব্যের যুগ যখন শেষ হওয়ার মুখে, তখনকার বাঙালী কবিগণ কাব্য-মহাকাব্যের চেয়ে টুকরো টুকরো শ্লোক রচনায় দিকে মন দিতেন বেশী। তাঁদের রচিত টুকরো কবিতায় কৃতিত্বও প্রকাশিত হয়েছে অধিক, কারণ বাঙালী কবিগণ তৎপর হয়েছিলেন ছোট কবিতা লেখার জন্য। সাহিত্যচর্চায় বাঙালী কবিরা প্রগতিশীল হয়ে উঠলেন একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগেই। তাঁদের লেখার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা যে নেই তা নয়, তবে বাংলা দেশের রসস্পৃষ্ট প্রকৃতির বিশেষ রূপটি, বাঙালীর মনোবৃত্তির বিশেষ ছবিটি, তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে বাঙালী মানসপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ আদি ও মধ্য যুগ ॥

বাংলার গীতিরূপের ক্রমপরিচিতি

নাথগীতিকা

প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সংগীতের ধারা চলে এসেছে বিচিত্র কথাসাহিত্যকে অবলম্বন করে। যুগবিবর্তনের ফলে সাহিত্যরূপ ও সমাজপ্রতিবেশের যতই পরিবর্তন হয়ে থাকুক না কেন, ছন্দ ও ছন্দাশ্রিত সুরের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কোনোদিনই শিথিল হয়নি। ছুটিতেই দুজনের হাত ধরে চলেছে যুগে যুগে উৎকর্ষের পথে। সর্বদাই সুরের স্পর্শে কথাসাহিত্যের বিচিত্র প্রেরণা নিজ-ভাবানুযায়ী সংগীতছন্দে স্পন্দিত হয়েছে ও এর মাধুর্য আরো মাধুরীমণ্ডিত হয়ে লোকরুচির সম্মুখে মোহনীয় হয়ে উঠেছে। উভয়েরই একত্রিত প্রচেষ্টায় জনসমাজে এসেছে সাহিত্যে ও সংগীতে অনুরাগ। বহু নামে, বহু রূপে এরা প্রকাশিত হয়েছে সর্ব কালে, সর্ব যুগে ও সর্ব দেশে।

প্রত্যেকটি দেশের প্রকৃতি ও রুচি আবার তার সংগীত ও সাহিত্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। তাই সংগীতের রূপও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা শ্যামশষ্পে শ্যামায়িত বাংলায় এক নূতন রূপ নিয়েছে। বাংলার পল্লীগীতির নেই বেশভূষার আড়ম্বর, নেই সাজসজ্জার বালাই, কিন্তু আছে ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য ও সৌকর্য। সরল স্বচ্ছন্দ গতি নিয়ে বাংলার সংগীত ও সাহিত্য প্রথমে বিকাশ-লাভ করলেও তাদের রচনাশৈলী ছিল ছন্দপূর্ণ, সরস ও লাবণ্যপূর্ণ। এই সরল, অনাড়ম্বর অথচ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সাহিত্য ও সংগীতের সম্ভার নাথগীতির আলোচনা সর্বাগ্রে করা যাক্।

ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে নাথগীতিকাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে হয়। নাথগীতিকাতে বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্ব ও প্রান্তিক গ্রাম্যভাষার ব্যবহার দেখে এই শব্দগুলিকে প্রাচীন শব্দ মনে করে কালনির্ণয়কারী ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ নাথগীতিকাকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুবৌদ্ধযুগের রচনা মনে করেন। তা ছাড়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নাথগীতিকার রাজপুত্র গোপীচন্দ্রকে গোবিন্দচন্দ্র বলে দাবি করেন এবং তাঁকেই উড়িষ্যার তিরুমলয় শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলে অনুমান করেছেন। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকাল ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখদের মতে নাথগীতিকাগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সংকলন নয়। কিন্তু নাথগীতির গীতিরূপের বিচার করলে শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেনের সুচিন্তিত অভিমতই অনেকটা যুক্তিসংগত বলে মনে হয়, অর্থাৎ নাথগীতি চর্যাগীতির পূর্ববর্তী। এর কারণ এই যে, চর্যাগীতির গতি ও গায়নভঙ্গী নাথগীতির চেয়ে বেশ উন্নত এবং নাথগীতির গায়নপদ্ধতি চর্যা অপেক্ষা সহজ, সরল ও অত্যন্ত সাবলীল ছিল। মোট কথা নাথগীতিতে ভারতীয় রাগের সমাবেশ থাকলেও, তা ছড়ার আকারে সর্বসাধারণের মুখে গীত হ'ত। সুতরাং সংগীতের আলোচনায় গোপীচন্দ্রের গানকে অগ্রবর্তী স্থান দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

নাথগীতিকার দুটি প্রধান বিভাগ আছে। একটি গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কাহিনী এবং সেটি "গোরক্ষ-বিজয়" ও "মীন-চেতন" নামে পরিচিত। অপরটি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী এবং তা "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", "ময়নামতীর গান", "গোবিচন্দ্র বা গোবিচন্দ্রের গীত", "গোপীচন্দ্রের গান", "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস", "গোপীচাঁদের পাঁচালী"

প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গীতিকার মধ্যে সাধু গোরক্ষনাথের চিত্তসংযমের অভূতপূর্ব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নায়ক-চরিত্র গোরক্ষনাথ একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সিদ্ধগুরু মীননাথকে কদলীরাজ্যে রমণীর মোহবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই গীতিকা নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে। এই ধর্ম-সংশ্লিষ্ট আত্মচেতনার পরিপোষক কঠোর ও করুণ কাহিনী যেমন হয়েছিল লোকপ্রিয়, তেমনি এনে দিয়েছিল সামাজিক জীবনে ধর্মভাবের প্রেরণা। "গোরক্ষ-বিজয়" পুঁথির মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়। ফয়জুল্লা, ভবানীদাস, শ্যামদাস—এঁরা কেউ মূল "গোরক্ষ-বিজয়" কাহিনীর রচয়িতা নন, বরং এঁরা একটি প্রচলিত গীতিকার বিভিন্ন গায়েন মাত্র।

দ্বিতীয়োক্ত গীতিকার বিষয়বস্তু নাথপন্থী যোগিজাতির প্রিয় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী। মাতা রানী ময়নামতীর আদেশে নবপরিণীতা সুন্দরী যুবতী বধূদ্বয় অদুনা ও পদুনাকে ত্যাগ করে যৌবনেই পুত্রকে বার বছরের জন্য বনে যেতে হল। বাংলার এই তরুণ রাজার সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাতনামা কবি প্রাচীন কালে ছড়া রচনা করেছিলেন। এগুলি তখন ছড়ার আকারে প্রচারিত হয়েছিল সাধারণ গায়কদের কণ্ঠে গীতরূপে রূপায়িত হয়ে। এই রাজার সন্ন্যাস-সম্বন্ধীয় কাহিনী দার্শনিক তত্ত্বাশ্রয়ী হলেও করুণ ও মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। তাই সাধারণ লোকের মুখে মুখে ছড়াগুলি চলে এসেছে ধারাবাহিক নদীর স্রোতের মতো। মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বনে এই ছড়াগুলি রচিত, কিন্তু এর নামকরণ হয়েছিল অনেক। তার কারণ, এই ছড়াগুলি একটি কবিরই রচনা নয়, বহু কবির অবদান রয়েছে এর অন্তরে। যে কয়টি নাম এই রচনাবলী সম্পর্কে পাওয়া যায়, সেই নামগুলিকে ঐতিহাসিকেরা কবির আখ্যা দেন না। এঁরা

বলেন আদি কবির নাম বিলুপ্ত, সংগ্রহকারক হিসাবে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই গীতিগুলি যে কোনো কবিরই রচনা হোক না কেন, বর্তমান সাহিত্যবাসরে এরা মান পাক বা না পাক, নিতান্ত গ্রাম্যজনোপযোগী কবিত্ব নাথসাহিত্যের আখ্যা নিলেও, সরলতা ও কাহিনীর বর্ণনায় কবিত্বের পূর্ণলক্ষণ এর মধ্যে আছে। সাধারণ জীবনের বৈরাগ্যের কাহিনী নিয়ে এই ছড়াগুলি রচিত হলে এত সমাদর জনসমাজে পেত কিনা বলা কঠিন। রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিত, অতুল সম্পদের অধিকারী এবং দেবভোগ্যা নারীর প্রেমাস্পদ হয়েও, গার্হস্থ্য ধর্মের পরম প্রেয় বস্তু পেয়ে তাকে ত্যাগ করার আদর্শ চরিত্র মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। নাথপন্থী যোগিজাতি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে এই গানগুলি গেয়ে একসময়ে জীবিকা অর্জন করত এবং জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এই গীতিকা সাহিত্য। এই গোবিন্দচন্দ্রের গান যে একসময় সমধিক সমাদর পেয়েছিল এবং ভারতবর্ষব্যাপী যে এর সুখ্যাতি ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই।

গোপীচন্দ্রের গানগুলি ততটা মার্জিত না হলেও, এই গানের ভাষা অনেক সময় এতটা স্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী যে তার তুলনা হয় না। এইসব পল্লীগাথায় প্রাচীন সমাজের অনেক রীতিপদ্ধতি, যেমন রাজ্যশাসনে প্রজাদের অধিকার, হিন্দু রাজত্বে নরবলি প্রথা প্রভৃতির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তদানীন্তন সমাজে রাজাদের অবর্তমানে রানীদের মধ্যে পুনর্বার বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং রাজবাড়ীর এই শিথিল সামাজিক প্রথা অনুসারে রানী অদুনা অতি সহজেই রাজার ভাই খেতুকে স্বামীরূপে বরণ করে নিতে পারতেন। কিন্তু মহিলাদের আদর্শস্থানীয়া রানী অদুনার সরল নির্ভীক চরিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা কোনোদিনই ম্লান হবে না। উনিশ বৎসর বয়সে

রাজার মৃত্যু নিশ্চিত—এই কথা জেনে অদুনা যমকে পূজা করে তাঁকে বশীভূত করবার প্রসঙ্গে বলেছেন—

নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব।
মস্তকের চুল কাটিয়া চামর ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা সলতে পাকাইব।
পৃষ্ঠের চর্ম্ম কাটি আমরা চাঁদোয়া টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া মোরা দশ বাতি দিব॥
পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব।
নানান পুষ্পজলে যমের সেবায় মানাব
সেবায় মানিয়া আমরা স্বামী বর লিব।[১]

রাজার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের কথা শুনে রানী অদুনা স্বামীর সহগামিনী হবেন বলে রাজাকে অনুরোধ করছেন এবং প্রত্যুত্তরে রাজার রানীকে আশ্বাসদানের কথাগুলি বড়ই করুণ—

নিন্দের সপনে রাজা হব চৈতন।
পালঙ্গে হস্ত ফ্যালায়া দেখিব নাই প্রাণধন॥
খালি পালঙ্গ দেখি প্রভু মুঞি জুড়িম কান্দন॥
আমাকেও সঙ্গে নিয়া জাও পরাণের রঘুনাথ।
আমি নারি সঙ্গে গ্যালে আন্দিয়া দিব ভাত॥
ভোকের কালে রন্ন দিব তিয়াসকালে পানি।
হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রঞ্জনি॥
জারের কালে ওড়ন দিব গিরিস কালে বাও।
সন্ধ্যা কালে ছুই বইনে ঠাসিব হস্ত পাও॥

* * *

১ গোপীচন্দ্রের গান (দ্বিতীয় খণ্ড)। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। মুখবন্ধ, পৃঃ ১৫

রাজা বলে শুন রাণি জবাবে বুঝাই।
একলাই বৈরাগি হলে জাহা তাহা রব।
তুমি নারি সঙ্গে গ্যালে বড়ই লজ্জা পাব॥
তোমার রূপ আমার রূপ দুইজনকে দেখিয়া।
দশ গিরস্তে বলবে সব বৈরাগি নারিচোরা।
নারিচোরা বলিয়া গিরস্তে না ছায় ঠাঞি।
ভাল গিরির ছেইলা হইলে বাসা দান দিবে।
গোঞার গিরস্ত হইলে আমাক জবাবে খ্যাদাবে॥[২]

বাংলা দেশে মহাযানিক সাধক কবিদের সংস্কৃত-রচনা, কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি প্রাচীনতম চয়নিকা বাঙালীর গীতিকাব্য প্রতিভার কথাই প্রকাশ করে। সদুক্তিকর্ণামৃতে রাজা লক্ষ্মণসেন, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি সাহিত্যিক, কবি ও গীতিকার ছাড়াও অসংখ্য কবিদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা যায়, "গীতগোবিন্দ" গীতি-সাহিত্য প্রভৃতি রচনার পূর্বে বাংলা দেশে অসংখ্য পল্লীসাহিত্য, পল্লী-গাথা ও গীতির গ্রন্থ ছিল। নাথগীতির পর বৌদ্ধচর্যা ও বজ্রগীতিগুলি বাংলার সাহিত্য ও গীতি জগতের অমূল্য সম্পদ। চর্যাগীতির পর জয়দেব ঠাকুরের গীতগোবিন্দ, পদাবলী কীর্তন, ঢপকীর্তন, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মঙ্গলকাব্যের গান বা মঙ্গলগীতি, বাউল, কবিগান, তর্জা, বোলান, যাত্রা, সারি, জারি, খেউড়গান, আখড়াই, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, মালসী, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, পূর্ববঙ্গগীতিকা এবং আধুনিক গীতিধারার অবদানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কান্তকবি রজনী-কান্ত সেন, কবি অতুলপ্রসাদ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ইত্যাদি

২ গোপীচন্দ্রের গান (প্রথম খণ্ড)। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সন্ন্যাস খণ্ড, পৃঃ ১৭৪-১৭৬

ছাড়াও বাংলার সাহিত্য ও গীতিসমাজে অসংখ্য সাহিত্যিক, কবি ও গীতিকারের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—যেমন রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু, হরুঠাকুর, ব্রজকিশোর বা দেওয়ান মহাশয়, রাজা রামমোহন, রাম বসু, রঘুনাথ দাস, ভোলা ময়রা, সাতু রায়, দাশরথি রায়, গোবিন্দ রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোপাল উড়ে, রূপচাঁদ পক্ষী, রসিকচন্দ্র রায়, প্যারীমোহন কবিরত্ন, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন রায়, বিহারীলাল সরকার, চিরঞ্জীব শর্মা, দীন বাউল প্রভৃতি। বাংলা গানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও এঁদের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। বাংলার গীতিরূপের ক্রমপরিচিতি দিতে গেলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী—এই বিস্তৃত সময়পরিধির মধ্যে যে সমস্ত গায়ক সম্প্রদায়, গুণী বা রচয়িতা আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়ে গানের ডালি সাজিয়ে গেছেন, তাঁদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদানের উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু তাঁদের সকলের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই একান্ত প্রয়োজনীয় অবদানগুলির মাত্র কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব, তাদের পর পর মালা গাঁথার মতো সাজিয়ে। প্রত্যেকটি অবদানের পিছনেই কিন্তু দেখতে পাব রচয়িতার নিজের জীবনের বৈশিষ্ট্যময় পরিবেশের, সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত সাধনার চাক্ষুষ ইতিকথা।

চর্যাপদ

বৈদিক যুগ থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে ধর্মকে আশ্রয় করে ভারতের সকল ভাষা সাহিত্যের আসরে অগ্রসর হয়েছে ক্রমোন্নতির পথে। বাংলা ভাষাও ঐতিহাসিক সেই সত্যকে লঙ্ঘন করেনি, কিন্তু সর্ব যুগে সর্ব কালে ও সকল দেশে সাহিত্য উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার

সমগোত্রী হয়ে সংগীতও সাহিত্যের সমোচ্চাসন পেয়ে চলেছে বিশ্বের দরবারে। আরণ্যক ঋষিগণ সাহিত্য ও সংগীতকে ধর্মোপাসনার বাহন করে নিয়েছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে সাধারণ সমাজজীবনের উপরেও সেই ধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রমে তার পাশাপাশি নূতন রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছিল প্রাচীন যুগের ধর্মতত্ত্বজ্ঞ সাধারণ জনগণের উপযোগী সংগীত ও সাহিত্য সৃষ্টি। এ মনে করা বোধ হয় ভুল হবে না যে সাধারণ জনগণের গ্রহণোপযোগী সাহিত্য ও সংগীত যদি গ্রাম্য ঋষিগণের দ্বারা সৃষ্ট না হ'ত, তা হলে সাহিত্য ও সংগীত চিরকালই থেকে যেত সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে। সকল সমাজে, সকল যুগে ও সকল দেশে সংগীত এবং সাহিত্য এই দুটি ধারাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। একটি সরল সহজিয়া ধারা যা সকলের গ্রহণযোগ্য, অপরটি কঠিন সুপরিমার্জিত শিক্ষিত সমাজের উপযোগী। বাংলা ভাষাও এই ধারাকে লঙ্ঘন করেনি। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এই আবহমান ধারা দেখতে পাই সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষার যখন নব উন্মেষ, এর রূপ যখন সন্ধিক্ষণের মতো আলো-আঁধার মিশ্রিত, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ছোঁয়া যখন লেগেছিল এর গায়ে, তখন যে বাঙালীর মধ্যে সাহিত্যের চর্চা ছিল, গণ্ডীবদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে সেটি পুরোপুরিই সংস্কৃতকে আশ্রয় করে। আজ যে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীত এত সমৃদ্ধিশালী হয়েছে তার কারণ, যাঁরা শিক্ষিত, অভিজাত ও একটি সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ সমাজের ধার ধারতেন না, তাঁরা ভার নিয়েছিলেন অশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে সহজ সরল ভাষায় সুখবোধ্য, সুখসাধ্য সহজিয়া সাহিত্য ও সংগীতের প্রচারকার্যের। তা না হলে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীত সবই থেকে যেত একটি নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। বাংলা ভাষা যখন নবজাত, শিশুসাহিত্য ও সংগীত যখন অপরিণত, তখনকার অশিক্ষিত সমাজের জন্য যে কাব্য ও যে সংগীত

সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাকে বহন করে সেই শিশুভাষা চলেছিল দেশে দেশে, সমাজের অলিগলিতে, সেই ধর্মতত্ত্বটি কিন্তু অপরিণত রূপের নয়। শিশুভাষা হলেও সে প্রকাশ করেছে বৃহত্তর ধর্মের অতিগুহ্য মহৎ তত্ত্বসকল। সংগীতও রূপ নিয়েছিল পূর্ণ বিকাশমান অবস্থার। সে সংগীতের তখন রাগঅঙ্গ গঠিত হয়েছে, সে চলতে শিখেছে ছন্দে, তালে, লয়ে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সমাজেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে। কেউ তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারেনি, রাখতে পারেনি অপাংক্তেয় করে। সেই আদি বাংলা ভাষার নবসাহিত্যের রূপ আজ আমরা দেখতে পাই দশম ও দ্বাদশ শতকের বজ্রযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্যতম সাধনতত্ত্ববিষয়ক "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থের চর্যাগীতির মধ্যে। সেই সদ্যোজাত বাংলা সাহিত্যের আদিম রূপটুকু মেলে এই চর্যাপদে। যদিও এর ভাষা আবছায়া ও ঘোলাটে, কিন্তু ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও আত্মোপলব্ধির জ্ঞানোপদেশ এতে প্রচুরই পাওয়া যায় এবং কাব্যরসানুভূতিরও অভাব ঘটে না। পরিমার্জিত ভাষা না হলেও চর্যাপদগুলি কাব্যরসবর্জিত নয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক বা কৌলতান্ত্রিক কিংবা শৈব সিদ্ধাচার্য যাঁদেরই মতবাদকে চর্যাপদ সমর্থন করেছে, সে সমর্থন যে সমাজের অকল্যাণ করেনি এবং ধর্মের বিরোধী নয়, বরং সাহিত্য ও সংগীতের বাহক, এ কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

এই চর্যাপদগুলি সকল সম্প্রদায়ই যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চর্যাপদ রচনাকারী সিদ্ধাচার্যগণ এই রচনার মাধ্যমে যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি সুপ্রচেষ্টা করেছিলেন, তারও আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব থেকেই তান্ত্রিকতা প্রবর্তিত হয়ে এসেছে আমাদের দেশে। হিন্দুধর্মীয়দের আত্মোপলব্ধির একটি প্রকৃষ্ট পন্থা এই তান্ত্রিক আচার। এর প্রসার হয়েছিল যথেষ্ট এবং এই তান্ত্রিক আচার একসময় অনাচারে পরিণত হয়েছিল। তন্ত্রের প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব জনসাধারণ বুঝতে না পেরে অনাচারে, ব্যভিচারে

লিপ্ত হ'ত সততই। কারণে, অকারণে, ক্রিয়াকর্মে, যাগযজ্ঞে যে কোনো অনুষ্ঠানেই বিশ্বঘাতীরূপে পশুঘাতন অনুষ্ঠিত হ'ত। এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করবার জন্য বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তো কবি জয়দেব বলেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ—হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণা-পরবশ হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহের নিন্দা কর। বুদ্ধ-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১৩ ॥ (বুদ্ধ শান্ত-রসের অধিষ্ঠাতা)।[৩]

আবার এই বুদ্ধবাদকে সংস্কার করতে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য। আমার মনে হয় চর্যাপদের লেখকগণ কৌলিক (তান্ত্রিক), বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, বৈদান্তিক এবং শূন্যবাদী ছিলেন। সকলের অবদানই এর মধ্যে কিছু কিছু আছে, সকলের মিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে এই চর্যাপদ-গুলি। যোগশাস্ত্রাবলম্বী শৈবযোগী সিদ্ধাচার্যগণ যোগশাস্ত্র অবলম্বন করেই চর্যাপদের কিয়দংশ রচনা করেছিলেন এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মী উভয় সম্প্রদায়ই চর্যাপদকে গ্রহণ করেছিলেন।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে বেদান্তবাদের প্রচার হয়েছিল যথেষ্ট। তারই কারণে মায়াবাদী শৈবযোগীদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল জনসমাজে সমধিক এবং তৎপরবর্তী যুগের প্রায়শঃ সন্ন্যাসীরাই ছিলেন শৈবযোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেজন্য যোগশাস্ত্রের বিষয়বস্তুই চর্যাপদে প্রকটিত হয়েছে বিশেষরূপে। এই শৈবযোগী

---

৩ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রথমঃ সর্গঃ, পৃঃ ১২

ও তান্ত্রিকগণ সংসারবিরাগী ছিলেন না, সংসারের মধ্যে থেকেই ভোগ-সম্ভোগের চরম সুখানন্দকে ব্রহ্মানন্দে পরিণত করতে এই সহজিয়া উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। মানুষ চায় পুত্র-পরিবার, ভোগবিলাস। কামনা বাসনা নিয়ে তাদের সৃষ্টি হয়েছে। যোগের নির্ণীত পন্থা কামনা বাসনা পরিবর্জন, ভোগবিলাস ত্যাগ, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধারা গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়, তাই তান্ত্রিক সাধকগণ ভোগের দ্বারাই ভোগ হতে নিরত হতে চেয়েছেন "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" অর্থাৎ কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলবার সহজ উপায় জেনেছেন। সমস্ত বস্তু ভোগ করেও তাতে নির্লিপ্ত ভাব রক্ষা করে সংসারের ভোগ-বিলাসকেই ব্রহ্মানন্দের উপযোগী করে নিয়েছিলেন। তাই সাধারণ মানুষ এই ধারাটিকে ব্রহ্মানন্দের সহজ উপায় বলে গ্রহণ করেছিল এবং তন্ত্রের মতবাদের এত প্রচলন হয়েছিল। এই তান্ত্রিক সাধন-প্রণালীটি গুপ্ত সাধনপ্রণালী বললেই ভাল হয় এবং এই সাধনতত্ত্ব গুপ্তভাবে আচরিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে তন্ত্রাদিতে। সেজন্য চর্যাপদের ভাষা রহস্যাবৃত বলে মনে হয়। এর ভাষা যেমন অস্পষ্ট, ভাবও তেমনি হেঁয়ালী-জাতীয়। এই ভাষা ও ভাব অনুভব করে আনন্দলাভ করতেন তখন তাঁরাই যাঁরা তান্ত্রিক গুহ্যতাত্ত্বিক। ভাষার দ্বারা পরম গুহ্যতত্ত্ব ও ব্রহ্মানুভূতির প্রকাশ হয় না, তাই তো কাহ্নুপাদ বলেছেন—

রাগমালসী গবুড়া—কাহ্নুপাদানাম্—

জো মণ গোএর আলা জালা
আগম পোথী ইষ্টামালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়
কাঅবাক্‌চিঅ জস্ণ ণ সমায় ॥ ধ্রু ॥
আলে গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥

জে তই বোলী তে তবি টাল
গুরুবোধসে সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিণ রঅণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥[৪]

ভাবানুবাদ—

মনের গোচর যাহা আলজাল হয়।
আগমপুস্তক ইষ্টমালা সমুদয় ॥
সহজ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায় কিসে।
কায়বাক্‌চিত্ত যার মধ্যে না প্রবেশে ॥
বৃথা গুরু উপদেশ দেয় শিষ্য সবে।
বাক্যের অতীত যাহা কিরূপে কহিবে ॥
যে তাহা বলিতে চায় সকলি অসত্য।
গুরু বোবা শিষ্য কালা এই সার তত্ত্ব ॥
কাহ্নু বলে জিনরত্ন কি প্রকার হয়।
বধির সংকেতে যেন বোবাকে বুঝায় ॥[৫]

কোনো শ্রেণীর যোগীগণ সহজানন্দ বিষয়ে চর্যাপদের কতকগুলি বিশেষ অর্থযুক্ত পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণই এর বিশেষ লক্ষ্য। কেননা "মহাসুখ", "শূন্যবাদ", "নির্বাণ", "করুণা", "বোধিচিত্ত" এগুলিই এর প্রধান বস্তু। কিন্তু সাধন-ভজন সম্বন্ধে যে ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেখা যায় এবং যে জাতীয় হেঁয়ালীতে ভরপুর ভাষায় যোগশাস্ত্রের বিষয় বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় বাংলা নাথপন্থী শৈবযোগীদের

৪ বৌদ্ধগান ও দোহা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃঃ ৬১-৬২
৫ চর্যাপদ। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ. সম্পাদিত। পৃঃ ১৯৬

রীতিনীতি থেকে এঁদের রীতিনীতির বিশেষ পার্থক্য নেই। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এঁরা ছিলেন নৈরাত্মাবাদী অর্থাৎ চিন্ময়ী শক্তির উপাসক। জ্ঞানময় সত্তাকে তাঁরা দেবী বলে কল্পনা করেছেন অর্থাৎ তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাঁকে স্পর্শ করা যায় না, তাঁকে কথা দ্বারা বোঝান যায় না, তাঁর অনুভূতিতে যে আনন্দ সে শুধু উপলব্ধি করা যায়, বলে বোঝান যায় না, তাই অস্পৃশ্যা ডোমনী নারীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। এর থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে তান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ এর মধ্যে সুস্পষ্ট। এই চর্যাপদগুলির সমষ্টি মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এরা তান্ত্রিক, বৌদ্ধ বৈদান্তিক মতবাদের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ কবি-গণের সম্মিলিত রচনার মাধ্যমে। দশম শতাব্দীর সহজিয়া মতানুপন্থী কানভট্ট নামক কোনো ব্যক্তিই চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের অন্তর্গত এই পদগুলির বিশিষ্ট সংগ্রহকর্তা। পদকর্তাদের নাম এবং পদগুলির রচনাকাল এখনো প্রকৃষ্টরূপে নির্ণীত হয়েছে বলে মনে হয় না, কেননা এ বিষয়ে অনেক মতান্তর রয়েছে। কেউ অনুমান করেন অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে, আবার কেউ বলেন দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে লেখা হয়েছে এই পদসমুচ্চয়। তবে এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু সত্যই সাধনাঙ্গিক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে জনসাধারণকে আনন্দদান করতে এবং সাধনার পথ দেখাতে এই চর্যাপদগীতিকার অবদান কম নয়। ভারতবর্ষের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে তার জন্ম থেকেই সে চলেছে অদেখার সন্ধানে এবং কী শিল্প, কী সাহিত্য, কী সংগীত সকলেরই মূল ভিত্তি ধর্মকে আশ্রয় করে।

কেউ কেউ বলে থাকেন চর্যাপদগুলি ছড়ার সমষ্টি, কিন্তু আমার মনে হয় তা যদি হ'ত, তা হলে একটি পুরোপুরি সংগীতের রূপ সে নিতে পারত না। জগতের কোনো বস্তুই এক দিনে তার পরিপূর্ণ রূপ

নিয়ে সামনে দাঁড়ায়নি। বৃক্ষের পরিপূর্ণ রূপ বীজের অন্তরে নিহিত থাকে বটে, কিন্তু এক দিনে তার প্রকাশ হয় না। বীজ অঙ্কুরিত হতে কিছু সময় নেয়, তারপর তার অস্পষ্ট শিশুরূপ, ডালপালা শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্প ফলে পরিশোভিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ রূপ নিতেও তার কয়েকটি বছর কেটে যায়, তেমনি ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প সকলেরই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হতে বহু যুগ অতীত হয়। এর থেকেই বুঝতে হবে চর্যাগীতিগুলিরও সংগীতের পরিপূর্ণ রূপ নিতে সময় লেগেছিল। শিশু অবস্থা থেকে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণ বিকাশমান অবস্থায় পৌঁছুতে চলার পথে তার রূপ বদলাতে হয়েছে বহুবার। হয়তো কখনো নিয়েছে প্রবন্ধের রূপ, কোনোকালে হয়তো কীর্তনের রূপও নিতে হয়েছে। তারাবলীর রূপ নেওয়াও অসম্ভব নয়। পূর্বে প্রবন্ধগানের ছয়টি অঙ্গ ছিল। যথা—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট, তাল। তা ছাড়া কীর্তনগানে পাঁচ প্রকার জাতি আছে। যথা— মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী, তারাবলী। চর্যাপদ ছিল দুই অঙ্গযুক্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র পদ এবং তালযুক্ত তারাবলী-জাতীয়। কারোর অনুমানকে ভুল বলা চলে না এবং সমস্ত মতকেই নির্ভুল বলেও মানা যায় না, তবে চর্যাপদের শেষ পরিণতি যে উচ্চাঙ্গ সংগীতেরই রূপ নিয়েছিল, তার প্রমাণেরও অভাব নেই। ধ্রুপদ গায়নপদ্ধতি এবং কীর্তন গায়নপদ্ধতি এই উভয় গানের মধ্যেই ধ্রুব কথাটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেটি বিশিষ্ট পদ, মূল পদ, যাকে আশ্রয় করে প্রথম সংগীত আরম্ভ হয়, সেই অংশটিকেই ধ্রুব বলে জানা যায়। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে সমস্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়, সে সমস্ত রাগগুলি, পূর্বে যে সংগীত সংগীতসেবীদের সমাজে উচ্চাসন পেয়েছিল, তার মধ্যে পাওয়া যায় এবং কীর্তনাদিতেও সেসব রাগের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। অতএব অনুমান করা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, এই চর্যাপদগুলি একসময় সংগীতজগতে উচ্চাসন

পেয়েছিল এবং একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তবে এই গীতিকার গায়নপদ্ধতি যে সঠিক কিরূপ ছিল সে বলা কঠিন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মর্যাদা সে পেয়েছিল এ স্বীকৃতি নিঃসংশয়ে করা যায়। যখন সে প্রবন্ধগীতের রূপ নিয়েছিল, তখনো যে সে জাতিতে ওঠেনি একথা বললে মনে হয় ভুল হবে, কেননা যাকে আমরা উচ্চাঙ্গ শ্রেষ্ঠ সংগীত বলে মেনে নিই, সেই নিবদ্ধ ধ্রুপদ সংগীতের মতোই চর্যাসংগীতেরও চারটি অংশ ছিল। তার নাম যা-ই থাক না কেন, নামের পরিবর্তনে রূপের কিছু যায় আসে না। ধ্রুপদের চারটি অংশের নাম ছিল এবং এখনো আছে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। তখনকার প্রবন্ধ-গীতিতেও চারটি অংশ ছিল। তার নামকরণ হয়েছিল উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ। গীতারম্ভের প্রথম অংশকে বলা হ'ত উদ্‌গ্রাহ, তার পরের অংশকে মেলাপক, তার পরের অংশটি ধ্রুব, শেষের অংশটি আভোগ। আবার কোনো কোনো স্থলে মেলাপক এবং আভোগকে বর্জন করে দুটি অংশকে নিয়ে গাওয়া হ'ত, কোনো স্থলে বা তিনটি অংশ নিয়ে গাওয়া হ'ত। এর থেকে পাওয়া যায়, খেয়াল গানের স্থায়ী ও অন্তরার মতো দুটি অংশের মাধ্যমেও এই সংগীত প্রকাশিত হ'ত। এ অনুমানও করা যায় যে চারটি অংশে যে সংগীত বিভক্ত, তার কথার সমষ্টি বেশী এবং দুটি অংশের সংগীতে কথার অপ্রাচুর্য থাকায় সুর ও বিস্তারের দ্বারা সুরের প্রাধান্যেই সেই সংগীতের রূপ ফুটে উঠত পরিপূর্ণরূপে খেয়াল সংগীতের মতো। উচ্চশ্রেণীর গান বলতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যা চলে এসেছে, চর্যাপদগুলি যদি তারই পর্যায়ভুক্ত না হ'ত, তা হলে প্রতিটি গীতের জন্য স্বতন্ত্র রাগেরও উল্লেখ থাকত না।

এ ছাড়া এই চর্যাগানগুলি যে বহুপ্রকারে গীত হ'ত, সংগীত-রত্নাকরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গদেব (১২১০-১২৪৭ খ্রীঃ) লিখেছেন—

বদনং চচ্চরী চর্যাপদ্ধড়ী রাহড়ী তথা।
বীরশ্রীর্মঙ্গলাচারো ধবলো মঙ্গলস্তথা॥ ৩২ ॥[৬]

এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, সংগীতরত্নাকরের যুগেও সংগীতাসরে চর্যার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই তো শার্ঙ্গদেব চর্যার লক্ষণ এবং বর্ণনা দিয়েছেন—

পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্‌দ্বিতীয়াদি তালতঃ॥ ২৯২ ॥
সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা॥ ২৯৩ ॥[৭]

অর্থাৎ—প্রতিপাদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত যে গীতি তাকে চর্যা বলা হয়। এই গীতি দুই প্রকার, ছন্দোপ্রধানগুলিকে বলা হয় পূর্ণ এবং যাতে ছন্দের প্রাধান্য নেই তাকে বলা হয় অপূর্ণ। আরো দুটি প্রকারভেদ এর আছে—একটি সমধ্রুবা অপরটি অসমধ্রুবা জাতীয়। যখন সবগুলি পদের সমকণ্ঠে আবৃত্তি করে গাওয়া হয়, তখন একে বলা হয় সমধ্রুবা এবং যখন কেবলমাত্র ধ্রুব অংশটুকু সম্মেলক গাওয়া হয় তখন বলা হয় বিষমধ্রুবা।[৮]

চর্যাগানের তাল ও প্রকারভেদ ছিল এবং সেই তালের সঙ্গে বর্তমানের তালপদ্ধতির মিল দেখা যায়। এর সঙ্গে বর্তমানের ত্রিতালীর সাদৃশ্য বেশ রয়েছে। এই পদ্ধড়িকা হল সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দ। পদ্ধড়ী ছন্দে প্রতি পদে ষোড়শ মাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এতে মধ্যগুরু "গণ" থাকবে না। অর্থাৎ কল্লিনাথ যাকে বলেছেন

৬ *Sangita Ratnakara.* Vol. II. চতুর্থঃ প্রবন্ধাধ্যায়ঃ, পৃঃ ১৯৭
৭ *Sangita Ratnakara.* Vol. II. চতুর্থঃ প্রবন্ধাধ্যায়ঃ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪
৮ বাংলার সংগীত (প্রাচীন যুগ)। রাজ্যেশ্বর মিত্র। পৃঃ ৪৫-৪৬

“জ গণেন বিমুক্তা”। গুরু ও লঘুবর্ণ অনুযায়ী তিন তিনটি বর্ণে এক একটি “গণ” হয়। পদ্ধড়ী ছন্দ ষোল মাত্রায় সম্পূর্ণ এবং যে চারটি ভাগ এর মধ্যে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি গুরু এবং লঘু মাত্রা নিয়ে গঠিত, মধ্যগুরু কোনো বর্ণ নেই। অবশ্য সর্বত্রই যে এই নিয়ম রক্ষিত হ'ত তা নয়, সেজন্য চর্যাপদ দুই প্রকার—ছন্দের দ্বারা পূর্ণ এবং ছন্দের অপ্রাধান্যে অপূর্ণ। যে সব চর্যাপদের সন্ধান আমরা পেয়েছি, পাঠ্য হিসাবে তা প্রায়শঃই ছন্দের দিক দিয়ে দুর্বল, অবশ্য গানের ক্ষেত্রে সুর টেনে ছন্দ রক্ষা করা হ'ত।

“২ ২	১ ১ ১ ১	২ ১ ১	২ ১ = ১৫ মাত্রা
কা য়া	ত রু ব র	প ঞ্চ বি	ডাল
২ ১ ১	২ ২	১ ১ ২	২ ১ = ১৫ মাত্রা
চ ঞ্চ ল	চী এ	প ই ঠা	কা ল”[৯]

কল্লিনাথের মতে দ্বিতীয় তালের মতো অন্য তালেও এ সকল গান গাওয়া হ'ত। দ্বিতীয় তালের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—“দৌ লৌ দ্বিতীয়কঃ।” “দ গণ” দু মাত্রা এবং “ল গণ” এক মাত্রা বোঝায় এবং এই চতুর্মাত্রিক তালটিতে পর পর গুরু এবং লঘুবর্ণের সমন্বয় ছিল। অধ্যাত্মগোচরা অর্থ ধর্মতত্ত্বই চর্যার মূলবস্তু। রাহড়ী জাতীয় গান ছিল বীররসাত্মক এবং তারাবলী জাতীয়। এই গানেও উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুবা এবং আভোগ এই তিনটি ধাতু থাকত। এক বীররস ছাড়া অন্য সব দিক দিয়ে রাহড়ী চর্যার অনুরূপ ছিল বলে সিংহভূপাল চর্যাপ্রবন্ধকে রাহড়ীমুখ্য বলেছেন।

সংগীতরত্নাকরে উল্লিখিত লক্ষণাদি এবং বর্ণনায় বিশেষ করে তাল-ছন্দাদির নির্ণীত লক্ষণায় প্রকাশ পেয়েছে চর্যার মর্যাদাশালী গীতের এবং চর্যা যে কতিপয় লোকের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধভাবে ছিল না,

---

৯ বাংলার সংগীত (প্রাচীন যুগ)। রাজ্যেশ্বর মিত্র। পৃঃ ৪৮

এ বলা যেতে পারে। চর্যাসংগীতের যদি প্রচার ও প্রসার না থাকত, তা হলে শার্ঙ্গদেব নিশ্চয়ই তাঁর সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে এমন সুস্পষ্টভাবে চর্যার লক্ষণ সমেত উল্লেখ করে লোকচক্ষুর সামনে চর্যার পরিচয় দিতেন না এবং টীকাকার কল্লিনাথও পরিষ্কারভাবেই চর্যাকে ধরেছেন। চর্য্যাগান আঞ্চলিক গান হিসাবে থাকলেও আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু সংগীত হিসাবে এর যে বিশেষ মূল্য এবং স্বীকৃতি ছিল, রত্নাকর তার বিশেষ প্রমাণ। এই চর্যা শুধু যে উত্তর ভারতেই প্রচলিত ছিল তা নয়, দক্ষিণ ভারতেও চর্যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রত্নাকরের পরেও যে চর্যাগান প্রচলিত ছিল, মহারাজ সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথের টীকাই তার প্রমাণ দিচ্ছে। বেঙ্কটমুখীর চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা গ্রন্থে (১৬২০ খ্রীঃ) চর্যার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্যন্তও চর্যার তিরোভাব ঘটেনি মনে হয়। সংগীতরত্নাকর এবং চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা—এই উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত চর্যাগীতি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতি হিসাবে তখন পরিচিত ছিল। একাদশ শতাব্দীর চর্যাপদ যেভাবে গাওয়া হ'ত, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ও তৎপরবর্তী যুগে তা আরো উন্নত আকারে নিবদ্ধ গীতিপদ্ধতি হিসাবেই বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ তখন চর্যা ছিল প্রবন্ধগানের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট রূপ।

বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সংগীতে যে যে রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে চর্যার উল্লিখিত অনেক রাগ-রাগিণীরই মিল আছে। পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ডি, মল্লারী, মালশী, কহ্নু গুঞ্জরী, বাঙ্গালা প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায় চর্যাগীতিতে। সুতরাং অন্যান্য দেশী সংগীতের মতোই তাল, ছন্দ ও রাগ সমন্বয়ে শাস্ত্রীয় প্রথানুযায়ী যে যথানিয়মে চর্যাগান গাওয়া হ'ত, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চর্যা—এই শিশুসাহিত্যকে বাহন করে একমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবকে আঁকড়ে ধরে, এই বাংলা গানও যে

ভারতের সর্বদেশে ও সর্বসমাজে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল, বাঙালীর এ একটি গৌরবের বিষয়।

গীতগোবিন্দ

চর্যা ও বজ্রগীতির পদের ধারানুরূপ গীতগোবিন্দেও রাগরূপের ধারা এসেছে ক্রমপ্রগতির দিকে। তবে নাথগীতিকা ও চর্যাপদের সংগীতে যেমন শুধু ছন্দ ও মাত্রার গতি দেখে তাল নির্ণয় করতে হয়, তেমনি গীতগোবিন্দের প্রবন্ধগীতিতে রাগ-রাগিণী ও তালাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায়, নাথগীতিকা ও চর্যাপদ থেকে গীত-গোবিন্দের প্রবন্ধগীতির ধারা যে বিশিষ্ট সংগীতের বিশেষ স্পষ্টতর উন্নত রূপ নিয়েছে এ অনুমান করা যায়। পূর্বেকার গ্রন্থাদিতে যেমন এই সকল রাগের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি এই সকল রাগের মধ্যে বহু রাগই বর্তমানে প্রচলিত আছে। কিন্তু গীতগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য হ'ল তালের দিক থেকে। যে তালগুলির উল্লেখ গীতগোবিন্দে আছে, সেই তালগুলির ব্যবহার বর্তমানে একমাত্র উচ্চাঙ্গ কীর্তন ছাড়া তথা-কথিত ভারতীয় অন্য কোনো উচ্চাঙ্গ সংগীতে দেখতে পাওয়া যায় না।

এই তাল সন্নিবেশের ধারা, তাল প্রদর্শনের পদ্ধতি, তাল ও মাত্রা বিভাগের সুনিপুণতা থেকে এ অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্বেকার বাংলা সংগীতের চেয়ে সেনরাজত্বকালীন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ভোজ-দেবের পুত্র কেন্দুবিল্ব-নিবাসী জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে সংগীতের মান উন্নততর হয়েছিল। প্রথিতযশা কবি জয়দেবের সংগীতের আরো একটি সুন্দর বিশেষত্ব আছে, যেটি তিনি শুধু একাধারে সুকবি ও সুগায়ক বলেই সম্ভাবিত হয়েছে তাঁর সংগীত রচনাবলীর মধ্যে। বিরহিণী

রাধিকার বিরহসংগীত রচনায় যেমন বিরহের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে, শ্রীরাধিকার প্রতিটি উক্তির মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে অসহ্য দহনদাহের জ্বালা, তেমনি সেই পদটির সুরযোজনায় কবি এমনি একটি রাগিণী সংযোজিত করেছেন, যার ধ্যানে পূর্ণ বিরহের রূপ প্রকল্পিত রয়েছে। এই সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু সুসন্নিবেশে পদপ্রকৃতির পূর্ণ বিরহ প্রতীকরূপ প্রকাশিত হয়েছে রাগাঙ্গের অপূর্ব লীলায়।

জয়দেব এবং পদ্মাবতীর যে সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তার প্রমাণের জন্য সেকশুভোদয় ও ভক্তমালে উল্লিখিত আখ্যায়িকার প্রয়োজন হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে পদাবলীর রচনায় রাগরূপ বিকাশের যে সুষ্ঠুতা ও নিয়মানুবর্তিতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকেই অনুমান হয়, শাস্ত্রীয় সংগীত এবং শাস্ত্রোল্লিখিত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, গীতগোবিন্দে গীতসমুচ্চয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাগের একটি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করতেই যেন জয়দেব প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংগীত এবং রচনার অন্তর্নিহিত ভাবের উপরেই যেন বিশেষ লক্ষ্য রেখে রাগ নির্বাচন করেছেন জয়দেব। এই মত যে ভ্রমাত্মক নয়, গীতগোবিন্দের প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস এবং পূজারী গোস্বামীর জয়দেব সংগৃহীত রাগাদির উল্লিখিত ধ্যানের সঙ্গে কবিবর্ণিত বিষয়বস্তু ও সংগীতের ভাবসাম্য ও মিতালী থেকেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এর উদাহরণস্বরূপ জয়দেবের পরবর্তী যুগে লিখিত সংগীতশাস্ত্রের বর্ণনারূপ রাগ ও ধ্যানের সঙ্গে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের উল্লিখিত রাগ ও ধ্যানাদির মিল দেখাতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। কবি লোচনপণ্ডিতের রচিত "রাগতরঙ্গিণী", তাঁর অনুসরণকারী শাস্ত্রকার হৃদয়নারায়ণের "হৃদয়প্রকাশ" ও "হৃদয়কৌতুক" এবং দামোদর প্রণীত "সংগীতদর্পণ" প্রভৃতি গ্রন্থের যে কয়টি রাগরূপের সঙ্গে গীতগোবিন্দের মিল আছে, এবং যে রাগের যে ধ্যানের সঙ্গে

গীতগোবিন্দের যে সর্গের যে গীতটির পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায়, বিশেষ করে সেই কয়েকটির বিশেষ রূপ এখানে দর্শান হবে।

চতুর্থঃ সর্গঃ

গীতম্ ॥ ৯ ॥

দেশাগরাগৈক তালীতালাভ্যাং গীয়তে।
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ধ্রুবম্ ॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥

অর্থাৎ—কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে স্তনোপরি বিন্যস্ত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ গাত্রসংলিপ্ত সরসমসৃণ মলয়জ চন্দনকে বিষজ্ঞানে তিনি সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ১২ ॥[১০]

গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গীতের মধ্যে চতুর্থ সর্গের নবম গীতটি একাদশ থেকে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে শেষ হয়েছে। এই গীতটি সখীর উক্তি। সখীর দ্বারা শ্রীরাধিকার বিরহাতিশয্যজনিত দেহের কৃশতার বর্ণনা হচ্ছে কৃষ্ণের নিকটে। এখানে কবি এই গীতটির রাগ নির্ণয় করেছেন দেশাখ (দেবশাখ বা দেস্তশাখ)। শাস্ত্রে দেশাখ্যরাগের ধ্যান এইরূপ—

(সংগীতদর্পণে ২।৬১)

বীরেরসে ব্যঞ্জিত রোমহর্ষঃ
শিরোধরাবদ্ধ বিশালবাহুঃ।

১০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৯

প্রাংশুঃ প্রচণ্ডঃ কিল ইন্দুরাগো
দেশাখ্যরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ইতিধ্যানম্[১১]

দেশাখ্যের ধ্যানমূর্তির সঙ্গে শ্রীরাধিকার বিরহিণী রূপের বর্ণনা একত্ববোধক। এই গানটিতে এই রাগটি সন্নিবেশিত হওয়ায় শ্রীরাধার বিরহের রূপটি যেন সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়ে রয়েছে। বিরহের প্রতীক যেন এই রাগটি। মিলনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে এবং মিলনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যকে ম্লান করে দিতে মল্লমূর্তিতে বাহু প্রসারিত করে বিরহিণীকে যেন গ্রাস করতে ছুটে আসছে। সখীর উক্তিতেও প্রকাশ পেয়েছে অকরুণ বিরহ যেন মল্লমূর্তিতে এসে অসহ্য উৎপীড়নে রাধিকার তনুলতাকে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর করে তুলেছে। এই যে রাগের ধ্যানের সঙ্গে গীতরচনাবলীর সংযোজনা, বহিরঙ্গের সঙ্গে অন্তরঙ্গের এই যে সম্বন্ধস্থাপনা, বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে রাগ ও সুরের এই যে মিতালী, এ অতুলনীয়। কবিপ্রয়াস সার্থক হয়েছে কথা ও সুরের মিলনমহিমায় এবং গীতগোবিন্দ কথাটির সার্থকতা সাধন করেছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত এর পদাবলী। অভাবিত প্রতিভা, অপরিমেয় শিল্পানুভূতি, অবিনিন্দিত কবিত্ব ও অননুকরণীয় ভাবরসলীলার পরিপূর্ণ শ্রী নিয়ে জন্মেছিলেন শ্রীজয়দেব। তাই অবিসংবাদীরূপে তৎকালীন গীতকাব্যকবিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গীতের সঙ্গেই রাগের ধ্যানের মিলনমহিমা যুক্ত হয়েছে রচনার চাতুর্যে এবং শাস্ত্রীয় রাগতাল সমন্বয়ে সমৃদ্ধিশালী গীতগোবিন্দের পদাবলী, কি কবি, কি সংগীতজ্ঞ সকলের কাছেই সমভাবে সমাদৃত হয়ে এসেছে এতকাল এবং চিরদিনই এর মর্যাদা থাকবে অক্ষুণ্ণ।

---

১১ সংগীত-রাগকল্পদ্রুমঃ, তৃতীয় খণ্ড। কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রসসাগর। রাগাধ্যায়ঃ, পৃঃ ২৯

দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে একটি জিনিস আমরা দেখতে পাই যেটি এখন পাওয়া যায় উচ্চাঙ্গ কীর্তনের মধ্যে। যেটিকে কীর্তনীয়ারা 'কাটান' বলে দেখিয়ে থাকেন অর্থাৎ একটি আখরেই তালের এবং মাত্রার এক এক স্থান থেকে তুলে গানের মুখে অর্থাৎ ধ্রুব পদে এসে পুনর্বার রাখা, এই যে প্রথম স্থান থেকে সরে সরে পেছিয়ে আবার পুনরায় সেই পূর্বের স্থানেই ঘুরে ফিরে আসা, এটি এখনকার অন্য কোনো সংগীতের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ধ্রুপদ এবং ধামারের বাটের মধ্যে এমনি প্রয়োগ খানিকটা পাওয়া যায়। কিন্তু এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য এখনো বর্তমান আছে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির মধ্যে। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতকারগণ যখন গান করেন, তখন তাঁরা সুরের বিস্তার দ্বারা এই কীর্তনগানের মতোই ধরা-বাঁধা তালের সঙ্গে ঐ কীর্তনের কাটানের অনুরূপ গানের নির্দিষ্ট কথা থেকে এগিয়ে পেছিয়ে একটি ছন্দানুসারে এসে পূর্বের স্থানে পৌছান। উপরন্তু কীর্তনাঙ্গের বিশেষোপযোগী খোল যন্ত্রটি যেমন বাদনপ্রণালী অনুসরণ করেছে, তেমনি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাদের দেশীয় মৃদঙ্গ যন্ত্র (খানিকটা মাদলের মতো) ব্যবহৃত হয়। তারও বাদনপ্রণালী কীর্তনাঙ্গের খোলের মতোই। এই খোলটিকে আমরা মৃদঙ্গ বলে থাকি, কেননা মৃত্তিকার দ্বারা এর অঙ্গ গঠিত হয়। বর্তমান উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে যে যন্ত্রের সংগত চলে, সেটিকে আমরা পাখোয়াজ বলে থাকি, কিন্তু পূর্বে তারও নাম ছিল মৃদঙ্গ, বর্তমানে সে মৃৎ অঙ্গ ছেড়ে কাষ্ঠ অঙ্গ গ্রহণ করেছে, তাই তার নামও বদলে গেছে।

এই যে দক্ষিণ ভারতের গায়নপদ্ধতির সঙ্গে গীতগোবিন্দের এবং পরবর্তী যুগের সংগীতের মধ্যে মিল দেখতে পাই, তার একটি কারণ অনুমান করতে পারি এই যে, জয়দেবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একটি

নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। সেই সম্বন্ধসূত্রেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ মিল ঘটেছে। কেননা, তৎকালীন এবং বর্তমান উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় গায়ন ও তালপদ্ধতির বিশেষ মিল দেখতে পাই না একমাত্র কীর্তনসংগীতের ক্ষেত্র ছাড়া। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জয়দেবের সময় হতেই উভয় সংগীতের মধ্যে মিতালী ঘটেছে একান্তভাবে। তবে জয়দেবের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতকারগণ, না জয়দেবই অনুসরণ করেছেন দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের গায়ন ও তালপদ্ধতির, এ কথা অমীমাংসিত। তবে আমার মনে হয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই উভয়ের পদ্ধতি কিছু কিছু প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই মিলনে কারোরই ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে মনে হয় না বরং উভয়ই উভয়ের কাছে থেকে আহরণ করে হয়েছে সমৃদ্ধিশালী। তা ছাড়া উভয় সংগীত ও সাহিত্যের দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে বিশেষভাবে এ বিষয় সন্দেহ নেই। জয়দেবের এই প্রচেষ্টাও তাঁর শিল্পীমন ও উদারতারই পরিচয় দিয়েছে।

যে কয়টি রাগ ও তাল জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাওয়া যায় তা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

রাগ	তাল	গীত	
১। মালব	১। রূপক	১। প্রলয়পয়োধিজলে	(গীতম্ ॥ ১ ॥)
"	২। একতালী	২। নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং	(গীতম্ ॥ ৬ ॥)
"	৩। যতি	৩। কথিতসময়েহপি	(গীতম্ ॥ ১৩ ॥)
২। গুর্জরী	৪। নিঃস্বার	৪। শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল	(গীতম্ ॥ ২ ॥)
"	যতি	৫। সঞ্চরদধর	(গীতম্ ॥ ৫ ॥)
"	"	৬। মামিয়ংচলিতা	(গীতম্ ॥ ৭ ॥)
"	একতালী	৭। রতিসুখসারে	(গীতম্ ॥ ১১ ॥)
"	"	৮। সমুদিতমদনে	(গীতম্ ॥ ১৫ ॥)

রাগ	তাল	গীত	
৩। বসন্ত	যতি	৯। ললিতলবঙ্গলতা	(গীতম্ ॥ ৩ ॥)
„	„	১০। স্মরসমরোচিত	(গীতম্ ॥ ১৪ ॥)
„	„	১১। বিরচিত চাটু	(গীতম্ ॥ ২০ ॥)
৪। রামকিরী	„	১২। চন্দনচর্চিত	(গীতম্ ॥ ৪ ॥)
„	„	১৩। হরিরভিসরতি	(গীতম্ ॥ ১৮ ॥)
„	„	১৪। কুরু যদুনন্দন	(গীতম্ ॥ ২৪ ॥)
৫। কর্ণাট	„	১৫। নিন্দতিচন্দন	(গীতম্ ॥ ৮ ॥)
৬। দেশাগ	একতালী	১৬। স্তনবিনিহিতমপি	(গীতম্ ॥ ৯ ॥)
৭। দেশবরাড়ী	রূপক	১৭। বহতিমলয়সমীরে	(গীতম্ ॥ ১০ ॥)
„	„	১৮। অনিলতরল	(গীতম্ ॥ ১৬ ॥)
„	৫। অষ্টতালী	১৯। বদসি যদি	(গীতম্ ॥ ১৯ ॥)
„	রূপক	২০। মঞ্জুতর কুঞ্জতল	(গীতম্ ॥ ২১ ॥)
৮। গোণ্ডকিরী	রূপক	২১। পশ্যতি দিশিদিশি	(গীতম্ ॥ ১২ ॥)
৯। ভৈরবী	যতি	২২। রজনীজনিত	(গীতম্ ॥ ১৭ ॥)
১০। বরাড়ী	রূপক	২৩। রাধাবদন	(গীতম্ ॥ ২২ ॥)
১১। বিভাষ	একতালী	২৪। কিশলয়শয়নতলে	(গীতম্ ॥ ২৩ ॥)

সুতরাং উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে চব্বিশটি গীতের মধ্যে মোট একাদশ রাগ এবং পঞ্চ তালের সমাবেশ হয়েছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ শুধু যে বাংলা দেশেই সমাদর পেয়েছে তা নয়, দক্ষিণ ভারতেও প্রভূত যশ অর্জন করেছিল। তার একটি কারণ, জয়দেব বাঙালী ব্রাহ্মণ হলেও, আদি দক্ষিণদেশবাসীয় সেন-রাজবংশী লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন বলে দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল। তাই যতই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির কুসংস্কার থাকুক না কেন, সুগায়ক ও সুকবি জয়দেবের সুললিত, সুরচিত গীতগোবিন্দের গীতমাধুর্যপরিপূর্ণ পদগীতিকে

দাক্ষিণাত্যের সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকেরা দূরে ঠেলে দিতে তো পারেন-নি বরং আঁকড়ে ধরেছেন, যক্ষের মতো গচ্ছিত রেখেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে, দরিদ্র যেমন করে রাখে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে। দক্ষিণ ভারতে সমাজেরও প্রতি উৎসবে, সংগীতের আসরে, বিবাহ-বাসরে বাঙালী কবির মিশ্র বাংলা সংগীত আজও হয়ে থাকে নিয়তই। যে কোনো সংগীতানুষ্ঠানই হোক না কেন, অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় জয়দেবের গীতগোবিন্দ দিয়ে। এ থেকেও অনুমান করা যায়, জয়দেবের গীতগোবিন্দে যদি রাগশুদ্ধি না থাকত, শাস্ত্রানু-মোদিত তালসংগতি যদি না পরিলক্ষিত হ'ত, তা হলে দাক্ষিণাত্যে গীতগোবিন্দের এ বিস্তৃতি সম্ভবপর হ'ত না। লক্ষ্মণসেনের সময়ে প্রকৃত উচ্চাঙ্গ সংগীতের মান কত উন্নত ছিল এবং কবি জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী যে কত উচ্চদরের সংগীতের অধিকারী হয়েছিলেন, তার একটি আখ্যায়িকা হলায়ুধ মিশ্র রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থেও বিশেষ করে তার ষোড়শ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। সেখানে রাজ-নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা ও শশীকলা, স্বয়ং জয়দেব, তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী এবং পণ্ডিত বুঢ়ণ মিশ্র সুহৈ বা সুহা, বসন্ত, গান্ধার, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগের উপস্থাপন করেছিলেন। এই সকল ঘটনা অনেকে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করতে চান না, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে রাজা লক্ষ্মণসেন, হলায়ুধ মিশ্র, পদ্মাবতী, জয়দেব প্রভৃতি ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তা ছাড়া হলায়ুধ মিশ্র সেকশুভোদয়া গ্রন্থে অনেক কাল্পনিক কাহিনীর উপস্থাপন করেছেন সত্য, কিন্তু তা হলেও এই কাল্পনিক কাহিনীর পশ্চাতে রাগ-রাগিণীর কাহিনী যে ঐতিহাসিক সত্য, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের পুরাণ গ্রন্থও অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী নিয়ে রচিত, তবুও তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য যথেষ্ট রয়েছে। তা ছাড়া ইতিহাসেই আমরা নজির পাই যে রাজা লক্ষ্মণসেন নিজে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হলায়ুধ মিশ্র, জয়দেব, পদ্মাবতী এঁরা সকলেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালে (খ্রীষ্টীয় ১১৭৮-১১৭৯ অথবা ১১৮৪-১১৮৫ অব্দ) জীবিত ছিলেন। কাজেই সেকশুভোদয়ের ঘটনা ও বর্ণনা কিছুটা কাল্পনিক হলেও, তার ঐতিহাসিক সত্যতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সুতরাং নানা দিক থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে, তখনকার রাজসভায় তদানীন্তনকালে প্রচলিত রাগগুলি যথাযথভাবেই উপস্থাপন করা হ'ত।

আমার মনে হয়, সুগায়ক ও সুগায়িকা জয়দেব ও পদ্মাবতী যে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করতেন, সে সংগীত গীতিরূপা গীত-গোবিন্দেরই প্রবন্ধগীতি। সুকবি ও সুসাংগীতিকের সঙ্গে নৃত্য-পটীয়সী সুগায়িকা পদ্মাবতীর মিলন এনে দিয়েছিল গীতগোবিন্দ প্রচারের সুবর্ণসুযোগ জয়দেবের জীবনে এবং নৃত্যবহুল ছন্দের তাল সংযোজনা ও তালসংগতি জয়দেবের সংগীতে যুগিয়েছিলেন পদ্মাবতী। এ অনুমান করার সুসংগত কারণ এই যে, গীতগোবিন্দের গীত ও পরবর্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাল দেবার পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যের গায়ক-গায়িকাদের তালপদ্ধতির মতোই। লোকসংগীতের চেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রাধান্য যে সময় ছিল বেশী, সেই লক্ষ্মণসেনের সময় উচ্চাঙ্গ সংগীতামোদের ক্ষেত্রে, বাংলার সংগীত গীতগোবিন্দের গীতি উচ্চাসন পেয়েছিল এবং বাঙালী কবি সংগীতজ্ঞ জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীই নৃত্যগীতে অগ্রণী হয়েছিলেন এই যুগে।

গীতরসের দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ একটি সার্থক সৃষ্টি। একটি স্বকীয় ধারা বাংলা গান কুড়িয়ে পেল জয়দেবের কাছ থেকে। অর্থাৎ তাল এবং রাগের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে তিনি সংগীতে একটি সুন্দর পন্থা দেখিয়েছেন। জয়দেবের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে সেইখানে, যখন তাঁরই নূতন সৃষ্টির ধারা থেকে সূচিত হ'ল বাংলা গানের নূতন ধারা।

গীতগোবিন্দের এই কৃতিত্ব চিরস্বীকৃতির দাবি করতে পারে। পরবর্তী সকল প্রকার গান এবং কীর্তনই গীতগোবিন্দের রাগ, তাল, গীতিধারা ও গায়কী পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল।

গীতগোবিন্দে যে রাগের উল্লেখ আছে, সেগুলি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর শুধু বাংলা কেন, ভারতীয় সমাজে সুনির্দিষ্ট-ভাবে স্বররূপের তথা মেল বা ঠাটের মাধ্যমে গাওয়া হ'ত। এখন তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে, কেননা পূর্ব অপেক্ষা শুদ্ধ মেলের এখন পরিবর্তন হয়েছে। পণ্ডিতগণের অভিমত যে, খ্রীষ্টীয় ২য় অব্দে ভরতের সময় থেকে ১৭শ শতাব্দীর শেষ বা ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে শুদ্ধ মেলের প্রচলন ছিল, তা বর্তমান হিন্দুস্থানী পদ্ধতির কাফী মেলের অনুরূপ। অথচ বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতের শুদ্ধ মেল বা ঠাট বিলাবল। সুতরাং রাগের রূপেও পূর্বকালের অপেক্ষা বর্তমানে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে ও আসাও স্বাভাবিক। অবশ্য এ সম্বন্ধে পরে প্রাচীন রাগরূপের আলোচনার সময় আরো সুবিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

পদাবলী সাহিত্যে বাংলার কীর্তন

প্রাচীনতম বাংলার আদি গীতিনাট্যের রূপ দেখতে পাই বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মধ্যে। সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রানু-মোদিত নাটকীয় ভাবরসমণ্ডিত এই গীতিনাট্যখানি। মাত্র তিনটি চরিত্র অবলম্বনে এই মহাকাব্য গীতিনাট্য রচিত হয়েছে। তিনটি চরিত্রেরই প্রাধান্য দেখিয়েছেন কবি। নিখুঁত সরল সরস ভাষার গাঁথনি ফুটিয়ে তুলেছে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও বড়ায়ির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থখানি গীতিধর্মী এবং রচনাচাতুর্যে অদ্বিতীয়। শৈশব থেকে আরম্ভ করে জীবনের এক একটি অধ্যায়ের ঘটনাবলী নিয়ে এক একটি পালা রচিত হয়েছে। জন্মখণ্ডঃ, তাম্বুলখণ্ডঃ, দানখণ্ডঃ,

নৌকাখণ্ডঃ, ভারখণ্ডঃ, ছত্রখণ্ডঃ, বৃন্দাবনখণ্ডঃ, কালিয়দমনখণ্ডঃ, যমুনাখণ্ডঃ, হারখণ্ডঃ, বাণখণ্ডঃ, বংশীখণ্ডঃ ও রাধাবিরহঃ প্রভৃতি ১৩টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের লীলা। তখনকার দিনে নাটকের মাধ্যমে সংগীতের ভিতর একটি নূতন ধারা প্রণয়ন করার গৌরব অর্জন করেছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানবপ্রকৃতি থেকে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে, তাই বোধ হয় প্রাচীন প্রবন্ধগীতির কিঞ্চিৎ শিথিলতার মুখে চণ্ডীদাস এলেন প্রবন্ধগীতির ধারাকে অব্যাহত রেখেও নাটকীয় রীতিতে সংগীতে নূতন রূপ দিতে। যদিও সুপ্রাচীন গায়নরীতির পদ্ধতি পরবর্তী যুগের অন্যান্য সংগীতের মধ্যে এসে পড়েছে, তা হলেও কিছুটা শৈথিল্যের জন্য নূতন ধরনের বহু গান প্রচলিত হয়েছিল প্রায় বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের রূপ নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয় ভঙ্গী নবরূপ নিয়ে প্রবেশ করলেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন ও পরিবর্তিত করেনি লঘু সংগীতে।

প্রাচীন রাগসংগীতের ধারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে অক্ষুণ্ন ছিল, তা বলতে পারা যায়, এই গ্রন্থে বহু প্রকার রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ থাকায়। কোড়া, বরাড়ী, ধানুষী, গুজ্জরী, পাহাড়ী, দেশাগ, আহের, রামগিরি, মালব, বেলাবলী, দেশবরাড়ী, ভাঠিয়ালী, কেদার, মল্লার, কহূ, ললিত, কোড়াদেশ, মালবশ্রী, শোরী, বসন্ত, মাহারঠা, কহূগুজ্জরী, বিভাষ, ভৈরবী, শ্রী, বঙ্গাল, বিভাষকহূ, বঙ্গাল বরাড়ী, পঠমঞ্জরী, সিন্ধোড়া, প্রভৃতি রাগ-রাগিণী এবং যতিঃ, ক্রীড়া, একতালী, লঘুশেখরঃ, রূপকং, কুড়ুকঃ, আঠতালা প্রভৃতি তাল এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। লোচনপণ্ডিতের "রাগতরঙ্গিণী", দামোদর প্রণীত "সংগীতদর্পণ" এবং শার্ঙ্গদেবের "সংগীতরত্নাকরে"র উল্লিখিত রাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নির্ধারিত রাগের কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে পাহাড়ী রাগটি যে খুব বেশী

ব্যবহৃত হ'ত, তা অনুমান করা যায় বহু পদেরই পূর্বে রাগনির্ণয়কল্পে পাহাড়ী রাগের উল্লেখ থাকায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেখানে রাগ ও তালের নির্দেশ রয়েছে, সেখানে রীতিরও উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—দণ্ডকঃ, প্রকীর্ণক, লগ্নক, চিত্রক এবং বিচিত্র। "মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥"[১২] অর্থাৎ মালব রাগে, রূপক তালে এবং দণ্ডকপ্রবন্ধের রীতিতে সেই পদটি গাইতে হবে। এ ছাড়া কোনো কোনো পদের মধ্যে দুটি, তিনটি অথবা চারটি প্রবন্ধগীতিধারার মিশ্রণ আছে। যেমন—

রমিগিরিরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥[১৩]
রামগিরিরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥[১৪]
রামগিরিরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥
একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥[১৫]
পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ চিত্রকপ্রকীর্ণলগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥[১৬]
রামগিরিরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥[১৭]

তবে এই প্রবন্ধ শুধু ছন্দকেই নির্দেশ করে। শাস্ত্রোল্লিখিত বহু প্রকার প্রবন্ধগীতির মধ্যে দণ্ডকপ্রবন্ধটি সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেকালের এই বিখ্যাত দণ্ডক-প্রবন্ধটিকেই বিশেষ করে আঁকড়ে ধরেছিল। সংগীতরত্নাকর অনুসারে দণ্ডক বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত এবং কৃষ্ণকীর্তনে "প্রকীর্ণক দণ্ডক"

---

১২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। দানখণ্ড, পৃঃ ২৩
১৩ " " " ভারখণ্ড, পৃঃ ৮৩
১৪ " " " " পৃঃ ৮১
১৫ " " " যমুনাখণ্ড, পৃঃ ১১৭
১৬ " " " ভারখণ্ড, পৃঃ ৭৯
১৭ " " " বংশীখণ্ড, পৃঃ ১৫২

আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ ধাতুযুক্ত গান। ধাতু অংশ বা অবয়বকে বোঝায়। সাধারণতঃ চারটি ধাতুর নাম যথাক্রমে উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ। প্রবন্ধগানকে নিবন্ধগান বলা হয়। প্রবন্ধগান মূলতঃ তিন প্রকার। যথা— সূড়, আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ। প্রথম দুটি শ্রেণী ছাড়া আর যে সব সাধারণ নানারকম গান প্রচলিত ছিল, সেগুলি বিপ্রকীর্ণ বলে পরিচিত হ'ত। বিপ্রকীর্ণের মধ্যে ছত্রিশ রকম গানের বর্ণনা পাওয়া যায়। দণ্ডক প্রবন্ধ কি প্রকারে গীত হ'ত কল্লিনাথের টীকায় তার উল্লেখ রয়েছে—

তত্র পদৈর্নির্মিতং দণ্ডকস্য পূর্বার্ধমুদ্‌গ্রাহঃ, স্বরৈর্নির্মিতমুত্তরার্ধং
ধ্রুবঃ, পদান্তরৈরাভোগঃ, তেনায়ং ত্রিধাতুঃ,
ছন্দোনিয়মান্নির্যুক্তঃ, স্বরপদতালবদ্ধত্বাত্র্যঙ্গো
ভাবনীজাতিমান্‌॥ ২৮০ ॥ ইতি দণ্ডকপ্রবন্ধঃ ॥[১৮]

শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, দণ্ডকের পূর্বাংশের নাম উদ্‌গ্রাহ অর্থাৎ "উদ্‌গৃহ্যতে প্রারভ্যতে যেন গীতং স উদ্‌গ্রাহ"। উদ্‌গ্রাহ আধুনিক কালে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে গানের প্রারম্ভ কলিকে "স্থায়ী" বলা হয়। কীর্তন গানে যেমন গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগ হয়, তখনকার দিনে উদ্‌গ্রাহ অনেকটা সেরকম ছিল বলে অনুমান করা হয়। দণ্ডকে মেলাপক ধাতুর ব্যবহার ছিল না। তৃতীয় অংশ ধ্রুব গানের নিত্য অর্থাৎ অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য হ'ত। এখান থেকেই স্বরসংযোগে সুষ্ঠুরূপে গানের আরম্ভ বলা যায়। সুতরাং এ কথা মনে করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে, দণ্ডকের প্রথম অংশটা অনেকটা কথকতার মতো সুর করে আবৃত্তি হ'ত এবং গানের ভাব আসত পরে। গানের পরিসমাপ্তি হ'ত আভোগে অর্থাৎ আভোগ গানের পূর্ণতা সম্পাদন করত। গানে অনেক সময় তিনটি

---

১৮ *Sangita Ratnakara.* Vol. II—চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়, পৃঃ ২৯৮

ধাতু বা অবয়ব থাকত। দণ্ডক নির্যুক্ত গানের অন্তর্গত। নির্যুক্ত গান ছন্দ, তাল ও রাগাদির আশ্রিত এবং দণ্ডককে তিন অঙ্গযুক্ত অর্থাৎ স্বর, পদ ও তালযুক্ত ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধগান বলা হয়।

যে সকল দেশীরূপ ছিল সেগুলি সবই প্রকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ বলে খ্যাত ছিল।

লগনী বা লগ্নী বলে এক জাতীয় গীতরূপের প্রচলন আজও উত্তর ভারতে দেখা যায়। ইহা লগ্নক তালে গীত এক প্রকার সংগীত থেকে এসেছে কিনা তাও সঠিক বলা যায় না। তবে পূর্বে দেখা যায় যে দণ্ডক, পদ্ধড়ী প্রভৃতি বহু গীতরূপ (form) ছন্দ থেকে এসেছে।

সংগীতরত্নাকরে উল্লিখিত "ঝোম্বড়" নামক প্রবন্ধের মধ্যে চিত্র এবং বিচিত্রলীল এই দুই শ্রেণীর গীতরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। "লগনী" নামক গীতরূপ বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে তার আখ্যা ছিল "প্রকীর্ণক লগনী"। যখন অন্য প্রবন্ধ জাতির সঙ্গে একীভূত ছিল, তখন নাম ছিল "চিত্রকলগনী" "বিচিত্র লগনী"। দুই জাতির মিশ্রণে যখন গানের রচনা হয়েছে, সেখানে "প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী" বা "প্রকীর্ণক বিচিত্র লগনী" এইরকম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চিত্র এবং বিচিত্র বিপ্রকীর্ণ থেকে স্বতন্ত্র।

শুধু তিনটি চরিত্রের উপর নির্ভর করে গ্রন্থটি রচিত হলেও বৈচিত্র্যের অভাব যেমন এতে নেই, তেমনি নাট্যধর্মী বহু বিষয় সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সুদৃশ্যাবলীর অন্তরালে। নাট্যগীতির স্বরূপধর্মী হলেও, রাগাঙ্গের পূর্ণবিকাশে ছন্দোতালে সুবদ্ধ হতে এর সংকোচ আসেনি এবং এ তালবিচিত্রতায়ও পূর্ণাঙ্গ সংগীতের পরিচয় দিয়েছে। কাব্য, সংগীত, গীতিনাট্য নানা দিক থেকে বিচার করলে কৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্ব অনেক। বিশেষ করে আমাদের বাংলা সংগীতে প্রাচীন অভিজাত সংগীতের ধারা আনয়নের অত্যুৎকৃষ্ট সার্থক

প্রচেষ্টার একটি হীরকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থখানি। সত্যই ভারত সাহিত্য-ভাণ্ডারে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটিকা একটি অমূল্য সম্পদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির রচনাকাল নিয়ে বহু মতভেদ আছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছেন যে বইখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পুঁথির ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ ধারে হতে পারে না। আবার কেউ কেউ ১৫০০ এবং ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুঁথির কাল নির্ণয় করেছেন।

পদাবলী সংকীর্তনের ধারা চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণব-পদাবলী সংকীর্তন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে ধারাবাহিকভাবে পর পর। কবি জয়দেবের পর ১৩শ শতাব্দীর সেনরাজসভাকবি উমাপতি ধর তথা মিথিলার উমাপতি ওঝা, ১৫শ শতাব্দীতে রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি, কবি চণ্ডীদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কবিরঞ্জন, রায়শেখর, নরোত্তমদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে স্বর্ণযুগ এনেছিলেন। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির মধুর ভাবরসসিক্ত ভাষার পদাবলী থেকে ভাব, ভাষা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির চাতুর্য গ্রহণ করেছেন তৎপরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতসারেই হোক কিংবা অজ্ঞাতসারেই হোক। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের লেখায় যেমন পাওয়া যায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়, তেমনি পাওয়া যায় ভাবরস-সমন্বয়ের সুপরিমার্জিত রুচির দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁদের প্রত্যেকটি রচনা কাব্যোপমায় ভরপুর, প্রকাশভঙ্গী অতি মনোরম। স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা হিসাবে তাঁদের আসন কারোর নিম্নে নয়।

বৈষ্ণবপদাবলী গীতির ভাষাসমূহ ব্রজবুলি নামে অভিহিত হলেও, এই ভাষা বৃন্দাবন কিংবা মথুরা অর্থাৎ ব্রজমণ্ডল অঞ্চলের ভাষা নয়। এই ভাষা বৈষ্ণব কবিদের নিজস্ব সৃষ্টি এবং পদাবলী সাহিত্যে একটি

স্বতন্ত্র ও সুন্দর অবদান। ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় কবিতা বলেই বৈষ্ণব কবিগণ এর ব্রজবুলি আখ্যা দিয়েছিলেন। বহু দেশীয় ভাষার মিশ্রণে এই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়। আসাম, উড়িষ্যা, মিথিলা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাংলা দেশের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ছিল। তাই এসব দেশীয় ভাষার মিশ্রণেই বোধ হয় ব্রজবুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

চণ্ডীদাসের সমসাময়িক মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় পদাবলী রচনা করেন। তদনুরূপই বাংলায় বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর বহুলাংশ ব্রজবুলিতে লিখিত হয়। ব্রজবুলির অন্তরে হয়তো মৈথিল প্রভাব প্রবেশ করেছে খানিকটা এবং এ সম্ভবপরও, কেননা বাংলা ও মিথিলার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল শিক্ষামূলক ব্যাপারে। অনেক বাঙালী বিদ্যার্থী মিথিলা থেকে বিদ্যাশিক্ষা করে আসতেন, এর বহু প্রমাণ আছে। কাজেই মৈথিল প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে বাংলা, উড়িষ্যা, এবং আসামে ব্রজবুলি পদাবলীর ধারা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন রায় রামানন্দ, যশোরাজ খাঁ, মুরারি গুপ্ত, নরহরিদাস, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু, বংশীবদন দাস, রঘুনাথ দাস, নয়নানন্দ, বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মহাপ্রভুর লীলাসহচর। এই ব্রজবুলি বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্রভাব তখন সুদূরপ্রসারিত। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পর বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্রচলন ব্যাপকভাবে দেখা যায় স্বতন্ত্র রাজ্য নেপাল, প্রান্তীয় ও সামন্তসভায় এবং প্রত্যেক দেশের প্রায়শঃ কবির অন্তরেই আলোড়ন তুলেছিল এই নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণবকবিতা। তারই প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নেপালের রাজা শ্রীনিবাসমল্লের ব্রজবুলিরই অনুরূপ পদাবলী রচনায় এবং আসাম প্রদেশের প্রসিদ্ধ কবি ধর্মপ্রবর্তক আচার্য শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতির অসমীয়া ভাষায় রচিত বরগীত

ও অন্যান্য পদের মধ্যে। এঁদের পদাবলীর স্থান বৈষ্ণব কোনো পদাবলীর থেকে ন্যূন নয়। এঁরাই আসামে পদাবলীকীর্তন প্রবর্তন করে আনন্দের প্লাবন তুলেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা—এই দুটি লীলাকে আশ্রয় করে পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ অবলম্বন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি থেকে আরম্ভ করে পূর্বরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য, মান, ভাবসম্মিলন, মিলন, বারমাসী, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি নিয়ে বহু পদকর্তা বিবিধ পদ রচনা করে গেছেন। রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে যৌবনলীলা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এই গীতিকাব্যসাহিত্য। সাধারণ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে যেমন চলে মান-অভিমান, মিলন-বিরহের মাধুর্য নিয়েই যেমন বিকশিত হয়ে ওঠে তাদের জীবনলীলা, তেমনি এই বৃন্দাবনলীলায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর পরিস্ফুরণ হয়েছিল অপার্থিব আদিরসকে আশ্রয় করে। এই সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ব্যতীত ব্রজলীলার আরো ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। সেটি হ'ল বাৎসল্য-রসের বিকাশ। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহমমতার জাজ্বল্যমান নিদর্শন যশোদার পুত্রবাৎসল্য। এই বাৎসল্য-রসের আদর্শ নিয়ে রচিত হয়েছে পূর্বগোষ্ঠ ও উত্তরগোষ্ঠ দুটি পালা। কবি এর মাঝে জড়িয়ে নিয়েছেন গোপবালকদের। কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবালকদের প্রীতি স্থাপিত করে সখ্যপ্রেমের মহিমা প্রকাশ করেছেন।

বৈষ্ণবকবিগণ অনেকেই ছিলেন সুপণ্ডিত। ভাষাই তার সাক্ষ্য। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে তাঁদের দখল ছিল বিশেষভাবে, তাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে যা কিছু সুন্দর উপকরণ পেয়েছেন, গ্রহণ করে সুসন্নিবেশিত করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর। তা বলে ঠিক অনুকরণ তাঁরা করেননি, সেগুলিকে আত্মসাৎ করে বৈষ্ণব ধারায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে। সংস্কৃত

কাব্যের ছন্দানুকরণ পদাবলীতে আছে বটে, তবে নূতন ছন্দেরও তাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন। ভাষা এর যেমনই হোক, ব্রজবুলির ছাপ এতে যতই পড়ুক না কেন, হিন্দী ভাষার গা ঘেঁষে এ চললেও অকৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্যে, চরম অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, আত্মোৎসর্গের পরমাদর্শে এবং প্রেমের পরাকাষ্ঠায় এর চিরনবীনতা চিরদিনই থাকবে। সংগীত থেমে গেলেও তার সুরের রেশ যেমন থাকে অনেকক্ষণ, তেমনি বৈষ্ণব কবিতা অর্থ যা প্রকাশ করে, তার চেয়ে তার ভাব-গভীরতা স্থায়ী হয় অনেক বেশী।

এই পদাবলীর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মিশ্র। কীর্তন-সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ, রস ও ভাবের প্রকাশ সম্বন্ধেও উল্লেখ করে গেছেন বৈষ্ণব আলংকারিকেরা তাঁদের গ্রন্থ সমুচ্চয়ে। বৈষ্ণবসাহিত্যের রসের সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের রসের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ রামায়ণ ও খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শার্ঙ্গদেবের সংগীত-রত্নাকরে উল্লেখ দেখা যায়, মার্গ ও মার্গপ্রকৃতিবিশিষ্ট অভিজাত দেশী সংগীত তৎকালীন সংগীতজ্ঞগণ ভাবরসের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে পরিবেশন করতেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে আটটি রসের বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। নাটক, জাতিগান বা নাট্য-গীতিতে যে রসভাবের বিশেষ প্রয়োজন, সেটি বোঝা যায় এবং ধ্রুবাপ্রকৃতির সংগীতেও প্রয়োজন হ'ত এই রসাদির।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫ ॥[১৯]

অর্থাৎ—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ইত্যাদি আট রকম রসের কথা ভরত স্বীকার করেছেন।

১৯ নাট্যশাস্ত্রম্। ষষ্ঠাধ্যায়ঃ, পৃঃ ৬৯

অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে—

ধ্রুবা স্বিধানে কর্তব্যা জাতিগানে প্রযত্নতঃ।

রসং কার্যমবস্থাং চ জ্ঞাত্বা যোজ্যাঃ প্রযোক্তৃভিঃ ॥ ৪ ॥[২০]

অর্থাৎ—নাট্যে রস-প্রয়োগ ছাড়া ধ্রুবা ও জাতিগান তথা জাতিরাগ-গানেও রস-সন্নিবেশের কথা ভরত উল্লেখ করেছেন।[২১]

শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

বীররৌদ্রাদ্ভুতরসঃ শিশিরে ভৌমবল্লভঃ।

গেয়ো নির্বহণে যামে প্রথমেৎহ্নো মনীষিভিঃ ॥ ৩২ ॥[২২]

অর্থাৎ—শুদ্ধ-কৈশিকরাগ বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত রসে শিশির ঋতুতে গান করা হ'ত। পরবর্তী ভৈরব, বসন্ত, শ্রী, মেঘ, মালবকৌশিক প্রভৃতি রাগগুলিতে রস ও ভাবের অভিব্যক্তি যে থাকবে সে কথা শাস্ত্রকাররা বিশেষভাবে বলেছেন।[২৩]

আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে যত সাহিত্য ও সংগীতগ্রন্থ পাওয়া যায়, প্রায় সব গ্রন্থেই এই ভাবরসসমন্বিত সংগীতের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য সংগীত ও সাহিত্যে যেমন আটটি রসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়, কীর্তনের মধ্যে আরো বহু প্রকার রসের অবতারণা করে থাকেন কীর্তনীয়াগণ। এতেই বোঝা যায় যে, রসসম্পদই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই রসবেত্তা বৈষ্ণবপণ্ডিত ও কীর্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ভ

---

২০ নাট্যশাস্ত্রম্। একোনত্রিংশত্তমোৎধ্যায়ঃ, পৃঃ ৩৩০

২১ বলরামদাসের পদাবলী। পদাবলী-কীর্তনের পরিচয়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ৩৯

২২ *Sangita Ratnakara*. Vol. II. দ্বিতীয়োরাগবিবেকাধ্যায়, পৃঃ ২৮

২৩ বলরামদাসের পদাবলী। পদাবলী-কীর্তনের পরিচয়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পৃঃ ৩৯

ও সম্ভোগের প্রকারভেদে ৬৪টি রসের অবতারণার উল্লেখ করেছেন। নায়কনায়িকাদের মিলনোল্লাস হল সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ হল পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস এই চার প্রকার। সম্ভোগকেও করেছেন চারটি ভাগে বিভক্ত—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। মোট আটটি রস, তার প্রত্যেকটি রসকে আবার আটটি করে ভাগ করেছেন। এমনি করে চৌষট্টি রসের বিকাশ ও প্রয়োগের কথা দেখিয়েছেন। এ তো বলা হ'ল রসের প্রকারভেদের কথা। বৈষ্ণবকাব্যে চিত্রিত নায়কনায়িকার সঙ্গে অন্যান্য কবি-মহাকবিদের শাস্ত্রানুমোদিত কাব্যলক্ষণযুক্ত নায়কনায়িকার ভাব, অভিব্যক্তি ও প্রকৃতির যে পার্থক্য নেই, বৈষ্ণব কবিগণ তাও বিশেষ করে দেখিয়েছেন। নায়িকার অভিসার কিরূপ ও কত প্রকার তাও নির্ণয় করেছেন। অভিসারের মধ্যে নায়িকার প্রকৃতি, মনোভাব সমস্তই প্রকাশ পেয়েছে।

এই কীর্তনগানে পাঁচটি উপাঙ্গের ব্যবহার হয়। যেমন—কথা, আখর, দোঁহা, ছুট ও তুক। উক্তি-প্রত্যুক্তি, গানের যোগসূত্র, অর্থ বিশদীকরণ প্রভৃতি অর্থেও "কথা" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি পদের সমষ্টির নাম 'দোঁহা', যেগুলি গায়করা আবৃত্তি করে থাকেন পয়ার, ত্রিপদী বা চৌপদীতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের তান এবং কীর্তনের আখর উভয়ে প্রায় একরূপ উদ্দেশ্য সাধন করে। আখরের মধ্যে মূল সুর থেকে পৃথক সহজ সরল সুরে কীর্তনের রসটি শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করানো হয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের তানে মূল রাগিণীর বিস্তারের দ্বারা রসের পুষ্টিসাধন করা হয়। তথাপি আখর খানিকটা তানের কাজ করে থাকে। নানা প্রকার স্বরপ্রয়োগে স্বরালংকার সৃষ্টি করে যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ ও রাগিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবাদি প্রতিপাদন করে থাকেন সুগায়কগণ, তেমনি (আখর) অর্থাৎ পদাবলী কীর্তনের একটি পদের বিশদভাবে, নানা রসে, নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে, আলংকারিক প্রয়োগে

মধুর করে তোলেন সুপণ্ডিত কীর্তনীয়াগণ এবং বিশেষ করে শ্রোতাদের অর্থোপলব্ধি করিয়ে দেন পদটির সুষ্ঠুভাবে। কীর্তনের এই আখর একটি অভূতপূর্ব সৃষ্টি এবং এই আখরই কীর্তনের একটি স্বকীয়তার সন্ধান দেয়, যেটি ভারতীয় অন্যান্য সংগীতের কোথাও মেলে না। উচ্চাঙ্গ সংগীতে যেমন বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করলে গায়ক রাগাঙ্গের রূপ বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, নব নব অলংকারে সুসজ্জায় পরিশোভিত ও শ্রীমণ্ডিত করে শ্রোতাদের সামনে যেমন তুলে ধরতে সক্ষম হন না, তেমনি কীর্তন-গায়ক যদি কবিত্বশক্তিসম্পন্ন আলংকারিক সুপণ্ডিত না হন, আখরের আলংকারিক প্রয়োগ যদি সুষ্ঠুভাবে না করতে পারেন, আখরপ্রয়োগে যদি রসবৈষম্য ঘটে, তা হলে রসবিশেষজ্ঞ সুরসিক শ্রোতাদের কাছে সে কীর্তনগান বিরসবোধ হবে। 'তুক'-টি হচ্ছে গায়কদের সম্প্রদায়-ক্রমে ছন্দোযুক্ত অনুপ্রাসবহুল সৃষ্টগাথা। পদের অংশবিশেষের নাম 'ছুট' অর্থাৎ সম্পূর্ণ গানটি না করেও ছোট তালে পদের খানিকটা অংশ গান করা। কীর্তনের এটিও একটি বিশেষত্ব। অন্য কোনো সংগীতে এইরকম বড় একটা প্রয়োগ দেখা যায় না যে একটি গানকেই দুটি তালে বিভক্ত করে অংশবিশেষ গাওয়া।

এ ছাড়া পালাকীর্তন গানে একটি বিষয়বস্তু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখবার মতো। সেটি হচ্ছে মিলনগান। পূর্বরাগই হোক, মানই হোক বা বিরহই হোক, প্রত্যেক পালার অন্তেই থাকে মিলন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ যে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির অবিচ্ছিন্নাবয়ব, যুগপৎ মিলনে তারই ইঙ্গিত দেয়। তাই তো রায়শেখর রচিত একটি মিলন-সংগীতে দেখতে পাই, অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মতোই আধো আধোরূপে বর্ণিত হয়েছে যুগল রূপের মধুময় রূপ—

> নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
> দুহুঁার রূপের নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর ॥

হিরণ কিরণ, আধ বরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ পরে বনমালা বিরাজিত,
আধ পরে গজমোতি ॥
আধ শ্রবণে মকরকুণ্ডল,
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি ॥
আধ শিরে শোভে ময়ুর শিখণ্ড,
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল, করে ছলমল,
ফণী উগরয়ে মণি ॥
মন্দ পবন, মলয় শীতল,
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার,
ডুবিল শেখর রায় ॥[২৪]

—রায়শেখর।

এর থেকে বোঝা যায়, ভক্ত চায় ভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিলনসম্বন্ধ স্থাপন করতে। পারে না সে বিরহের জ্বালা সইতে। তাই তো ভক্ত স্থাপিত করেছে নামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, নামের মধ্যেও সে গড়ে নিয়েছে ভগবানের অভাবনীয় রূপ, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে সে আরোপিত করে নিয়েছে ভগবানের রূপ ও গুণগরিমার বিপুলৈশ্বর্য। তাই তো আরাধিকা রাধা শ্যামতমালে শ্যামরূপানুভব

২৪ প্রীতি-গীতি। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., বি. এল. কর্তৃক সংগৃহীত। পৃঃ ৮১১

করে, দু'বাহু বাড়ায়ে আকুল আগ্রহে ছুটে গেছেন শ্যামরূপী তমালকে আলিঙ্গন করতে। তাই তো শ্যামবর্ণা শীতলস্পর্শা নীলযমুনার বক্ষে আবক্ষ অবগাহন করে সুখানুভব করতেন শ্যামসুখস্পর্শের। প্রথম-বর্ষণোন্মুখ নবদূর্বাদলশ্যামপ্রভ জলদপ্রবাহের পানে তাকিয়ে প্রেমোদ্দীপনায় উন্মাদিনীপ্রায় শ্রীরাধার আঁখিধারায় বক্ষ ভেসে যেত। দু'বাহু উত্তোলন করে জানাতেন আহ্বান, তাই তো চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীতে বলেছেন—

রাধার কি হল্য অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকএ একলে না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে মহাযোগিনীর পারা॥
আল্যাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে আপন চুলি।
সহাস বদনে চাহে মেঘপানে কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে॥[২৫]

ভক্তিরূপা রাধিকার এই যে মিলনেচ্ছা, এ তো ভক্তিরই অনুপ্রেরণা, তাই তো সাত্ত্বিক ভক্তির পরাকাষ্ঠায় ভক্ত কবির রচিত বিরহান্ত নাটকের অন্তেও এসেছে মিলনগীতি। বিরহের মধ্যে যদিও মেলে মিলনের সুখস্বাদ, কিন্তু কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি তাতে ঘটে না, বরং উদগ্রতাই বাড়িয়ে তোলে। তাই বৈষ্ণব কবিগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিকল্পে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়ে মিলনেই করেছেন পরিসমাপ্তি। না পাওয়ার ব্যথা জাগিয়ে রেখে, বিরহ-দহনে দগ্ধ করে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেননি রাধিকার অন্তরকে

---

২৫ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (২য় খণ্ড)। দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৯৭২-৯৭৩

চিরতরে। তাই তো প্রবাসে মিলন ঘটিয়ে নিষ্কৃতি দিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা।

বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন গাওয়া যেমন কঠিন, তেমনি আরো সুকঠিন রচনা করা। কেননা কবির সব সময়ই সচেতন থাকতে হয় প্রাচীন কাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের স্বকীয় ধারার বন্ধনী সম্বন্ধে। প্রত্যেকটি পদ কাব্যলক্ষণযুক্ত ও কাব্যালংকারে ভূষিত হওয়া চাই। না হলে উপেক্ষিত হবে সে রচনা বৈষ্ণব পণ্ডিতসমাজে। তাই এই পদাবলীরচনায় যুগপৎ বহু বিষয়বস্তু, তত্ত্বাদি ও সংগীতধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ পদাবলীর মধ্যে বারটি তত্ত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন। যথা—যুগলরূপ, প্রকাশ ও বিলাস, রসাস্বাদন, পারস্পরিক ভজনা, শ্রীভগবান ও ভক্ত, ভক্তের সাধ্যবস্তু, ভক্তের সাধন, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, মিলন, পরতত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

পদাবলীর নায়ক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা। এঁদের রূপ, গুণ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, অভিরূপতা, মাধুর্য, বয়স, মার্দব, নাম, চরিত্র ও অনুভাব কল্পিত হয়েছে প্রেমভক্তি উদ্দীপনার নিমিত্ত। পদাবলীর নির্ণীত এই নায়কনায়িকার উপলব্ধি, কীর্তনের মধ্যে একটি মস্ত বড় জিনিস। প্রেম ও ভক্তির উদ্দীপনা প্রকাশ পায় পদকর্তাদের বিচিত্র পদরচনা-কৌশলে ও গায়কের সুরের মাধ্যমে। পূর্ণবিকশিত, প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জের মতোই প্রকাশিত ও মূর্ত হয়ে ওঠে রূপবৈচিত্র্য। এ ছাড়া নায়কের ভূষণ, সম্বন্ধী, লগ্ন, সন্নিহিত, তটস্থ প্রভৃতিও কল্পনা করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে চারপ্রকার নায়কের লক্ষণ রয়েছে—ধীর-ললিত, ধীর-শান্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত। এ ছাড়া আরো অনেকপ্রকার রূপভেদ কল্পিত হয়েছে। সেগুলি কীর্তনগানের পদবর্ণনায় প্রকাশ পায়। কীর্তনের মধ্যে আবার দুইরকম নায়িকা দেখতে পাওয়া যায়—স্বকীয়া ও

পরকীয়া। যদিও এই দুইয়ের মধ্যে আবার বহুভেদ আছে। এঁদের মধ্যে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, ধীরা-প্রগল্‌ভা, অধীরা-প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা এঁরাই প্রধানা। প্রেমেরও তিনরকম বৈষম্য দেখা যায়। যেমন প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠা সৃষ্টি হলেন অতুলনীয়া শ্রীরাধিকা। কি করে যে এই অপার্থিব রূপ কল্পিত হয়েছিল ভেবে পাওয়া যায় না। উজ্জ্বলতায় তিনি সূর্যের চেয়েও দীপ্তিমতী, স্নিগ্ধতায় তিনি চন্দ্রলাবণিকেও হার মানিয়েছেন, পুষ্পপেলবের কমনীয়তা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি অঙ্গে। তিনি যেন বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি, স্রষ্টার সার্থক কৃতিত্ব এই রাধারূপের কল্পনা। সখী এবং দূতীর কল্পনাও পদাবলী সাহিত্যে একটি নূতন সৃষ্টি। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনকার্য সম্পাদনে দৌত্যক্রিয়া প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দূতীর সৃষ্টি কৌশল-চাতুর্যময়। এটিও বৈষ্ণবসাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ। এক কথায় বলতে গেলে, দ্বিধাশূন্য হয়ে বলতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবসাহিত্যে পদাবলীকীর্তন রূপ, রস, ভাব, প্রেম ও সৌন্দর্যের পূর্ণ মিলনতীর্থক্ষেত্র। মনে হয়, বিশ্বের অন্য কোনো কাব্য, নাটক, সাহিত্য ও সংগীতে এমনি অচিন্তনীয় কল্পনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আর মেলে না।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত যখন ভাবরসে পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত, তখন এল এই পদাবলীকীর্তন গান নূতন রসে, নূতন ঢঙ্গে, নূতন ভাবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের রূপ নিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতধারা অক্ষুণ্ণ রেখে। তখন শ্রীচৈতন্যের যুগ। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী ভক্তবৃন্দ শ্রীরাধার প্রাধান্য প্রতিপাদন করেন বিশদরূপে বৃন্দাবনলীলা প্রবর্তিত করে। তাই শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীসমুচ্চয় প্রধানতঃ বৃন্দাবনলীলার রাধাকৃষ্ণের রসবিলাসের পরিপূর্ণ মাধুর্যে মণ্ডিত। মহাপ্রভুর লীলাসহচর স্বরূপ দামোদর, মুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ,

হরিদাসঠাকুর, রূপসনাতন এবং এমনি আরো অনেক বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন সংগীতকারগণ শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী এবং তালসহযোগে জয়দেব ঠাকুর, বড়ু চণ্ডীদাস ও কবি বিদ্যাপতির রচিত পদাবলী ও নামকীর্তন ঠাকুরকে শোনাতেন প্রাণভরে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার উল্লেখ রয়েছে—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥[২৬]

ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ-গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥[২৭]

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সংকীর্তন করি করে জাগরণ ॥[২৮]
নাম সংকীর্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস ॥
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥[২৯]

তা ছাড়া শ্রীচৈতন্যভাগবত থেকেও আমরা মহাপ্রভুর নামকীর্তনের

২৬ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : কবিরাজ কৃষ্ণদাস (অন্ত্যঃ। ১৫শ পরিঃ)। পৃঃ ৩০৪

২৭ „ „ „ „ ১৭শ „ পৃঃ ৩১৬

২৮ „ „ „ „ ১৯শ „ পৃঃ ৩৪২

২৯ „ „ „ „ ২০শ „ পৃঃ ৩৫০-৩৫১

বিষয় কিছু কিছু জানতে পারি। তিনিই প্রথমে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ও তালকে অবলম্বন করে নামকীর্তন প্রচার করেন। নবদ্বীপে সংসারাশ্রমে থেকে নিমাই ছাত্রদের কীর্তন শেখাচ্ছেন—

পড়িলাম শুনিলাম যতদিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কেদার-রাগঃ। হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপন কীর্তন নাথ করেন কীর্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥[৩০]

মকরন্দকার নারদ বলেছেন—

গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।
নারদেন কৃতং শাস্ত্রং মকরন্দাখ্যমুত্তমম্॥ ৩ ॥[৩১]

অর্থাৎ গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনের সমন্বয়কে "সংগীত" বলে। নারদরচিত শাস্ত্র উত্তমমকরন্দ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে।

কীর্তনেও ভারতীয় সংগীতের এই তিনের সংগতি দেখা যায়। তাই তো ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ রয়েছে—

চতুর্দিকে হরিধ্বনি করয়ে সকলে।
সঙ্কীর্তনারম্ভে প্রেমসমুদ্র উথলে॥ ১১৭॥

৩০ শ্রীচৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবনদাস (মধ্যখণ্ড। প্রথম অধ্যায়)। পৃঃ ১২৮

৩১ সংগীতমকরন্দ : নারদ (প্রথমপাদঃ)। পৃঃ ১

নৃত্য-গীত-বাদ্যের তুলনা নাই দিতে।
সঙ্কীর্তনে যে সুখ তা' কে পারে বর্ণিতে ॥ ১১৮ ॥[৩২]

তবে অন্যান্য সংগীত থেকে ভাব ও রসের সমাবেশে এবং অপার্থিব অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় এ নিয়েছে একটি স্বতন্ত্র রূপ। তাই বাংলার কীর্তনগান ভারতীয় সংগীতভাণ্ডারের একটি অত্যুজ্জ্বল অমূল্য রত্ন। ইহা বাংলার এবং বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এ জন্মও নিয়েছিল বাংলারই নিজস্ব স্বতন্ত্র সম্পদ মঙ্গল, চর্যা, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি গানের স্বতঃস্ফূর্ত নব নব ধারা থেকে।

কীর্তন জয়দেবের সময়ে এবং তারও পূর্বে ছিল প্রবন্ধগানের অন্তর্ভুক্ত। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর কাছাকাছি সে তার আদিম রূপ বদলে, অভিজাত সংগীতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে ১৩শ শতাব্দীর সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে। শার্ঙ্গদেবের বর্ণিত প্রবন্ধগানের নিয়মাবলীর সঙ্গে এই কীর্তনগানের নিয়মপদ্ধতি হুবহু মিলে যায়।

প্রবন্ধোৎঙ্গানি ষট্ তস্য স্বরশ্চ বিরুদংপদম্ ॥ ১২ ॥
তেনকঃ পাটতালৌ চ প্রবন্ধ পুরুষস্য তে ॥[৩৩]

অর্থাৎ—প্রবন্ধগান ছয় অঙ্গ যুক্ত। এই ষড়ঙ্গ যথাক্রমে স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল।

কীর্তনগান যে এই ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধগান, বৈষ্ণবকবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ষড়ঙ্গের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদং পদম্।
তেনকঃ পাঠতালৌ চ স্বরাঃ সরিগমাদয়ঃ ॥ ২৮৭৮ ॥

---

৩২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যাম-দাস। ১০ম তরঙ্গ, পৃঃ ৪১০

৩৩ *Sangita Ratnakara.* Vol. II. চতুর্থপ্রবন্ধাধ্যায়, পৃঃ ১৯০

গুণোল্লেখতয়া যত্তৎ বিরুদং পরিকীর্তিতম্।
ততোঽন্যবাচকং যত্তু তৎ পদং সমুদাহৃতম্॥ ২৮৭৯॥
তেনেতি শব্দস্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থেঽবধারিতঃ।
ধাং ধাং ধুগ্-ধুগেত্যাদাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ॥
আদিযত্যাদিকাস্তালাস্তালঃ স কথয়িষ্যতে॥ ২৮৮১॥[৩৪]

অর্থাৎ প্রবন্ধগানের ছয়টি অঙ্গ ছিল। যথা— স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। স্বর বলতে সা রে গা মা প্রভৃতি স্বর বোঝায়। বিরুদ স্তুতি বা গুণবাচক। তেনক মঙ্গলবাচক। পূর্বে গীতারম্ভে "ওঁ তৎ সৎ" এই ধরনের মঙ্গলবাচক বাক্য সুরে গাওয়া হ'ত। পাট বলতে তালযন্ত্রের বোল অর্থাৎ সংগতের সঙ্গে সেই বোলগুলি মুখে আবৃত্তি করা হ'ত। যা অর্থ প্রকাশ করে তাকে পদ বলে। টীকাকার কল্লিনাথ "পদ" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"অর্থপ্রকাশকং পদম্।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সংকীর্তনের গানগুলিকে "পদ" বলা হ'ত। কিন্তু তখনকার যুগে সবরকম গানকেই "পদ" বলা হ'ত।

তৎকালীন কীর্তনগায়করা সংগীতশাস্ত্রানুমোদিত নিয়মপদ্ধতির অনুবর্তী হয়ে প্রবর্তন করেছিলেন এই কীর্তনসংগীত, তা না হলে কীর্তনের গ্রন্থে এই ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী যে অভিজাত সংগীতে পারদর্শী ছিলেন, এই প্রবন্ধগীতাদির উল্লেখে তার স্বীকৃতি মেলে। প্রবন্ধগান করবার সময় পাঁচপ্রকার জাতি সম্বন্ধে যে সচেতন থাকা উচিত, এ কথা যেমন উল্লেখ করেছেন শার্ঙ্গদেব এবং এই পাঁচপ্রকার জাতি কিরূপ, তারও যেমন পরিচয় তিনি দিয়েছেন, শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠিক

৩৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যামদাস। ৫ম তরঙ্গ, পৃঃ ২৫৭

তদনুরূপই পরিচয় দিয়েছেন প্রবন্ধের জাতি সম্বন্ধে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

মেদিন্যথা নন্দিনী স্যাদ্দীপনী ভাবনী তথা ॥ ১৯ ॥
তারাবলীতি পঞ্চ স্যুঃ প্রবন্ধানাং তু জাতয়ঃ।[৩৫]

অর্থাৎ প্রবন্ধগানের পাঁচরকম জাতি আছে। যথা—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, ভাবনী, তারাবলী।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বলেছেন—

জাতয়ঃ স্যুঃ প্রবন্ধানাং পঞ্চৈব মুনিস্মৃতাঃ।
মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাৎ পাবনী তথা ॥ ২৮৮৮ ॥
তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে।
ষড়ঙ্গা মেদিনী প্রোক্তা পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা ॥ ২৮৮৯ ॥
দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ পাবনী ত্র্যঙ্গিকা মতা।
দ্ব্যঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈর্গীতবেদিভিঃ ॥ ২৮৯০ ॥
(এতেন একাঙ্গপ্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতম্)[৩৬]

অর্থাৎ শাস্ত্রকারদের মতে প্রবন্ধগানের পাঁচরকম জাতি আছে। যথা—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী, তারাবলী। স্বর, পদ, বিরুদাদি এই ছয় অঙ্গযুক্ত হলে সেই গানকে বলা হ'ত মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধগান। স্বর, পদ, তেন, পাট ও তাল এই পাঁচ অঙ্গযুক্ত হলে নন্দিনী। স্বর, পদ, তেন ও তালযুক্ত হলে দীপনীজাতীয় প্রবন্ধগান। তিন অঙ্গযুক্ত হলে পাবনীজাতীয় এবং দুই অঙ্গযুক্ত হলে অর্থাৎ পদ ও তালযুক্ত হলে তারাবলীজাতীয় প্রবন্ধগান বলা হ'ত। এক অঙ্গযুক্ত হলে তা প্রবন্ধগান নয়।

---

৩৫ *Sangita Ratnakara*. Vol. II. চতুর্থপ্রবন্ধাধ্যায়, পৃঃ ১৯৬

৩৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যামদাস। ৫ম তরঙ্গ, পৃঃ ২৫৮

বিচার করে দেখলে কীর্তনগান সম্ভবতঃ তারাবলীজাতীয় সমধ্রুবা প্রবন্ধগানের পর্যায়ে পড়ে, কারণ কীর্তনের সমস্ত পদগুলি প্রায় আবৃত্তি হয়ে থাকে এবং পদও তালযুক্ত। কীর্তনের সমধ্রুবত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর উপাদানপূর্ণ "পদাবলী-পরিচয়" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত অবধূতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদাবলী ও পাঁচালীর পার্থক্য-নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন পদাবলী সমধ্রুবা, আর পাঁচালী বিষমধ্রুবা। বাংলার মঙ্গলগানগুলি পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল—সব গান একই ধরনে গাওয়া হয়। একটি উদাহরণ দিতেছি। রামায়ণগান হইতেছে, মূল গায়ক বর্ণন করিতেছেন—পবননন্দন অশোকবনে আসিয়া মা জানকীর দর্শন পাইয়াছেন।······ মূল গায়ক প্রথমে বেশ সুরে তালে ধুয়া ধরিলেন—'ওমা এই নাও রামের অঙ্গুরী।' দোহাররা সকলে মিলিয়া ধুয়াটি সুরে তালে আবৃত্তি করিলেন। তারপর মূল গায়ক গান ধরিলেন—'শমনদমন রাবণরাজা, রাবণদমন রাম।' দোহাররা সুর ধরিলেন—'আ আহা রি।' মূলগায়ক পুনরায় পরের ছত্র আবৃত্তি করিলেন—'শমন ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম।' দোহাররা তখন ধুয়াটিই সমস্বরে গান করিলেন—'এই নাও রামের অঙ্গুরী।' এইজন্যই পাঁচালী বা মঙ্গলগান বিষমধ্রুবা। পদাবলীতে এরূপভাবে ধ্রুবপদ গীত হয় না। মূল গায়ক ও দোহার সকলে মিলিয়া ধ্রুবপদ গান করেন। মঙ্গলগানের মত তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। এইজন্য পদাবলীর নাম সমধ্রুবা।"[৩৭] এটি একটি গায়কী-পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি বা রীতি অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকারের গান রাগে ও তালে পরিবেশিত হ'ত। এই কীর্তন শব্দটি এসেছে কীর্তি থেকে।

৩৭ পদাবলী-পরিচয়। পদাবলী। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৬

যে-কোনো দেবদেবী কিংবা মানব-মহামানবের যশোগাথা গান করলেই তাকে কীর্তন বলা হ'ত, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তার উল্লেখ রয়েছে। এখানেও পদাবলীকে কীর্তনাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভগবানের যশোগান বলেই।

জনশ্রুতি আছে, কবি ও তর্জাগানের উৎস আখড়াই সংগীত থেকে। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েই প্রথমে সৃষ্টি হয় এই গান এবং তার প্রবর্তন করেছিলেন নাকি যবন হরিদাস। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুগায়ক। তাল, তান ও রাগসংযোগে মধুরকণ্ঠে তিনি গাইতেন কীর্তন, দোহা ধরতেন স্বরূপদাস ও সনাতন দাস। বেত্রবতী নদীর কাছে প্রথম হয়েছিল আখড়ার পত্তন। তারপর ১৬শ শতাব্দীতে বৃন্দাবনের সংগীতগুরু হরিদাস স্বামীর (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) শিষ্য নরোত্তমদাসের প্রেরণায় কীর্তন এল আরো নূতন রূপ নিয়ে। উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদগানের পদ্ধতিতে কীর্তনগান প্রচারিত হ'ল। তার প্রচারকেন্দ্র হ'ল বৈষ্ণবসম্মেলনের খেতুরীয়ার মহোৎসবক্ষেত্র। তারপর হ'ল গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টি। রসকীর্তনের ঘটনাবলীর পূর্বাভাস দিত এই গৌরচন্দ্রিকাগান। এটি প্রবর্তিত হয়েছিল নরোত্তমঠাকুরের দ্বারা। রসকীর্তনের এই নূতন ধারাটির নামকরণ হ'ল "গরাণহাটি" বলে। জনশ্রুতি আছে যে, এই কীর্তনগানের সঙ্গে মৃদঙ্গ সংগত করতেন গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস এবং তানপুরা সহযোগে দোহারকি করতেন শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ। কাজেই এঁদের মাধ্যমে যে কীর্তনগান প্রবর্তিত ও প্রচারিত হয়েছিল, সেই গরাণহাটি ধারাটি যে খাঁটি ধ্রুপদের ছাঁচে ঢালা, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুরের কারুকার্যে পরিপূর্ণ এবং বিলম্বিত লয়ে বাঁধা হয়েছিল এই গানগুলি। এর পর খেয়ালের ছাঁদে মনোহরসাহি, টপ্পার ছাঁচে রেণেটি ও সরকার মন্দারণ থেকে ঠুংরীর ধাপে সৃষ্টি হ'ল মন্দারিণী পদ্ধতির কীর্তনগান। বাজপেয়ী শ্রদ্ধেয় রাধাবিনোদ গোস্বামী ও পণ্ডিতপ্রবর হরিদাস দাস মহাশয়ের মতে, মনোহরসাহি, রেণেটি ও গরাণহাটি এই তিনটি ধারার

প্রবর্তক নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে, কেননা অনেকে বলে থাকেন, স্থানের নাম অনুযায়ী তিনটি পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে। গরাণহাটি ছাড়া অন্য পদ্ধতিগুলির নামকরণ নাকি করেছিলেন বিপ্রদাস ঘোষ, গোকুলানন্দ ও বংশীবদন। অনুমান করা যায় কবীন্দ্র গোকুল ঝাড়খণ্ডি নামে একটি কীর্তনের পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন। সেটি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের নামানুসারেই হয়েছিল, তবে সে পদ্ধতির এখন প্রচলন নেই। তা ছাড়া সমস্ত পদ্ধতিই একাকার হয়ে গেছে বর্তমানের কীর্তনগানে। কোনো একটি বিশিষ্ট রূপ একটি থেকে আরো একটি বেছে নেওয়া কীর্তনের মধ্যে এখন অসম্ভব।

কিন্তু তালের দিক থেকে বিচার করলে, কীর্তনে এখনো যতপ্রকার তালের প্রচলন রয়েছে, ভারতীয় কোনো উচ্চাঙ্গ সংগীতে আজ পর্যন্ত এতপ্রকার তালের ব্যবহার দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এতে যেমন বিলম্বিত লয় ও দুরূহ শক্ত তালের প্রয়োগ দেখা যায়, এও আজকালকার অন্য কোনো সংগীতের মধ্যে পাওয়া যায় না। শুনতে পাওয়া যায়, ১০৮ রকম তাল গরাণহাটি পদ্ধতির কীর্তনে ব্যবহৃত হয়। মনোহরসাহিতে ৫৪ প্রকার, রেণেটিতে ২৬টি এবং ৯টি তাল প্রচলিত রয়েছে মন্দারিণী রীতিতে। পূর্বে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালের ব্যবহার হ'ত দুইশতেরও অধিক। কিন্তু বর্তমানে উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থানী সংগীতে তালের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতে এখনো তালের প্রয়োগ ৩৫ সংখ্যারও অধিক দেখা যায়। সবচেয়ে বেশী তালের প্রয়োগ দেখতে পাই বাংলার কীর্তন-গানে। কীর্তনে রূপক, যতি, তেওট, বড়-দশকুশি, মধ্যম-দশকুশি, ছোট-দশকুশি, ঝুমুর, ঝাঁপতাল, বৃহৎজপ, জপ, ধামালি, দুঠুকি, আড়া-দুঠুকি, ছোট-দুঠুকি, দাশপেড়ে, মঠক, প্রতিমঠক, জয়মঙ্গল, কন্দর্প, একতালী, বড়-একতালী, ধড়া, পট, অষ্ট, আদি, মধুর,

বিজয়ানন্দ, উৎসাহ, শেখর, সম, নন্দন, চন্দ্রশেখর, লোফা, ধ্রুব প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়।

পদাবলীতে তোড়ী, গান্ধার, কামোদ, শ্রীরাগ, সুহৈ, ভাটিয়ারী, রামকেলী, ধানশী, সিন্ধুড়া, বিভাষ, মঙ্গল, মল্লার, করুণা, বরাড়ী, কল্যাণী, মায়ূরী, আহিরী, গৌড়ী, ভূপালী, বিহগড়া, পাহাড়ী, কেদার, করুণ-বরাড়ী, তথারাগ বা যথারাগ, পঠমঞ্জরী, কৌ, ললিত, ভৈরবী, শুভগা, বিভাষললিত, ললিতভৈরবী, গুর্জরী, তিরোথা-ধানশী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এর অধিকাংশ রাগের উল্লেখ দেখা যায় লোচনকবির "রাগতরঙ্গিণী," পণ্ডিত শুভোঙ্করের "সঙ্গীত-দামোদর" এবং ঘনশ্যামদাসের "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" গ্রন্থগুলির মধ্যে।

মোটকথা, কীর্তনে রাগ-রাগিণী, তাল ও শাস্ত্রনিয়মানুবর্তিতা থেকে মনে হয় যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতেরই পূর্ণ আদর্শ নিয়ে কীর্তনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ঠাকুর নরোত্তমের প্রবর্তিত কীর্তনগান আলাপ বিস্তার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সমস্ত পদ্ধতিকেই অনুকরণ করেছে। তাই ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ রয়েছে—

অনিবদ্ধ, নিবদ্ধগীতের ভেদদ্বয়।
অনিবদ্ধগীত গোকুলাদি আলাপয় ॥ ৫৩১ ॥
অনিবদ্ধগীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল,—কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥ ৫৩২ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥ ৫৩৩ ॥
গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না হয় ॥ ৫৩৪ ॥
নরোত্তম বেষ্টিত এসব পরি করে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥ ৫৩৫ ॥

* * *

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট-কারণে ॥ ৫৩৮ ॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা ॥ ৫৩৯ ॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক-সুধা নহে তার সম ॥ ৫৪০ ॥

* * *

ক্রমে ক্রমে গীতবাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে।
শ্রীপ্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে ॥ ৫৪২ ॥[৩৮]

এ সত্ত্বেও কেহ কেহ মনে করেন, এখনকার কীর্ত্তন-গায়করা শাস্ত্রানুসারে রাগ-রাগিণী অবলম্বনে কীর্তনগান করেন না, কিন্তু এ-ও বলা যেতে পারে যে, তাঁরা হয়তো প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত রাগ-রাগিণীর আশ্রয় নিয়ে এখনো কীর্তনগান করেন, কিন্তু পূর্বপ্রচলিত সেই রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমাদের সুপরিচয় নেই। এ কথা বলার সুসংগত কারণ আছে। রত্নাকরের সময়কার রাগ-রাগিণীর নামের সঙ্গে এখনকার রাগ-রাগিণীর নামের মিল হয়তো ঘটতে পারে, কিন্তু স্বরশুদ্ধতা সম্ভবপর নাও হতে পারে, কেননা একটি নিদর্শন থেকেই সেটি অনুমান করা যায়। যেমন পূর্বের শুদ্ধমেল ছিল কাফী অর্থাৎ গ, ন কোমল। বর্তমানের শুদ্ধমেল বিলাবল অর্থাৎ সব স্বর শুদ্ধ। তা হলেই দেখতে পাই, পূর্বে যে স্বরটি ছিল শুদ্ধ, এখন সে হয়েছে বিকৃত। এখনকার যে স্বর শুদ্ধ, তখন সে ছিল বিকৃত। এর থেকে আমরাও ধরে নিতে পারি যে, কীর্তন হয়তো তার পূর্বেকার শুদ্ধরূপ পরিবর্জন না করে তেমনি শাস্ত্রীয় পদ্ধতির নিয়মানুগ হয়ে

---

৩৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যাম-দাস। ১০ম তরঙ্গ, পৃঃ ৪২৩

আজও দাঁড়িয়ে আছে সমানভাবে, একচুলও সরে পড়েনি অভিজাত সংগীতের মর্যাদার ক্ষেত্র থেকে। সেখানে অপরিচিতের অজ্ঞতা-স্বীকৃতির চেয়ে কীর্তনের রাগ-শুদ্ধতার অস্বীকৃতি কি অপরাধ নয়?

মীমাংসার মনোবৃত্তি নিয়ে বিচার করলে, কোনো-না-কোনো একটি সূত্র বেরিয়ে পড়ে, যার থেকে সংশয়ের নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব নয়। দোষগুণের হিসাব খতিয়ে দেখতে গেলে, বর্তমানে অভিজাত সংগীতের গায়নপদ্ধতির মধ্যেও অনেক দোষত্রুটি বেরিয়ে পড়বে এবং পূর্বপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে অনেক অমিল দেখতে পাওয়া যাবে। এটি যে বর্তমান যুগের গায়কদের দোষ তা নয়। রাগাঙ্গের সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, দলগত সংকীর্ণতা ও আত্মাভিমানী গায়কদের শাস্ত্র না মানার স্পর্ধা, অজ্ঞান ও অসংস্কৃতির নিষ্পেষণের জন্যই এরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। তেমনি হয়তো কীর্তনের বেলায়ও ঘটতে পারে, তা বলে কীর্তন অভিজাত সংগীতের মধ্যে গণ্য হবে না, এ কথা বলা চলে না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে অনেকখানি। বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, সংগীতের যেটি সত্যিকারের প্রাণবস্তু, যার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কার ও ধর্মের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, যে সংগীতের দ্বারা আত্মশুদ্ধি, আত্মতৃপ্তি, এমনকি ব্রহ্মোপলব্ধি পর্যন্ত সম্ভব হ'ত, সে সংগীত আর নেই, লুপ্ত হয়ে গেছে কালোপযোগী মানুষের মনোবৃত্তি ও অনমুভূতির নিবিড় তমসার অন্তরালে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলেও বোধ হয় এমনিতরই আভাস পাওয়া যাবে, কেননা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই উদ্ভূত হয়েছিল এই ভারতীয় বিশিষ্ট সংগীত। বৈদিক যুগের ঋষিগণের চেতনাভাণ্ডারে যে সংগীত ধরা দিয়েছিল পরমসুন্দর পরমপুরুষের রূপ নিয়ে, যে স্বরপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল সংগীতসাধনার সোপান প্রস্তুতের জন্য, তার মধ্যে

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যে ছিল নিশ্চিতরূপে, সে সংশয়ের অবকাশ নেই, কেননা, সেই কোন আদিযুগে ঋষিদের সৃষ্ট স্বরাদির বর্ণনির্ণয় যে অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরাও নিঃসংশয়চিত্তে স্বীকার করেন। যে যে স্বরের যে যে রং বর্ণিত হয়েছে, vibration-এর (পরিমাণিক) প্রভেদের জন্য সেই সেই স্বরের যে বর্ণবৈষম্য ঘটে, এ প্রমাণিত হয়েছে। এ যদি সত্য হয়, স্বরাদির যদি বর্ণসম্ভব হয়, তা হলে স্বরপ্রকৃতির সঙ্গে যে বিশ্বপ্রকৃতির যোগাযোগসূত্র স্থাপিত হবে, এ আর অসম্ভব কি?

জনশ্রুতি আছে, মল্লারে মেঘের সৃষ্টি হ'ত, দীপকে অগ্নি প্রজ্বলিত হ'ত, বাহারে বৃক্ষাদি পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হ'ত, গৌরসারঙ্গে বৃক্ষ হতে পর্ণ পতিত হ'ত। প্রকৃতির উপর স্বরপ্রকৃতির এই যে ক্রিয়া ও আধিপত্যসাধন, কম্পনের ব্যতিক্রমে এও সাধিত হ'ত। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরমসাধনায় যে পরমবস্তু পেয়ে ঋষিরা বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানবজাতির কল্যাণে, বিশ্বের দরবারে সে সংগীত হারিয়ে গেছে কোন যুগের ফাঁকে। সূর্য অস্তমিত হলেও যেমন তার শেষ রশ্মির আভাস জেগে থাকে কিছু সময়ের জন্য অসীম নীলিমার বুকে, তেমনি ঋষিসৃষ্ট সেই সংগীতের শেষ রেখাটুকুই জেগে আছে বর্তমান যুগের সংগীতাকাশে। মল্লার গাইলে আর বৃষ্টি নামে না, দীপকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, মালবে পাষাণ গলে না। দীপক হারিয়েছে তার দীপ্তি, মল্লার হারিয়েছে তার মেঘসম্ভার, মালব হারিয়ে ফেলেছে কারুণিক প্রস্রবণ। এ তো হবেই, কেননা সে অনুভূতি, সে ধীশক্তি, সে সাধনা কিছুই এখন নেই। তাই যমুনার নীলরেখার মতো অবশিষ্ট রয়েছে সংগীতধারার। সর্বস্ব হারালে যেমন এ-বেলার মানুষকে ও-বেলা চেনা যায় না, রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রেও দাঁড়িয়েছে তাই, তেমনিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার রূপ। যে শ্রীরাগ একসময়ে ছিল খাম্বাজ ঠাটে, আজ সে এসে পৌঁছেছে পূর্বী

ঠাটে। স্বরপরিবর্তনের জন্য রাগের প্রকৃতি ও ধর্ম সবই গেছে পাল্টে। তা হলে কি করে আর সম্ভবপর হবে সংগীতের দ্বারা পূর্বে যা সাধিত হ'ত, সেইসব? এতে যদি বর্তমানে সংগীতের ক্ষেত্রে এখনকার সংগীত অভিজাত সংগীতের মর্যাদা পায়, তা হলে পদাবলীকীর্তন সংগীতে যদি একটু আধটু চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটেই থাকে, তাতে এমন কিছু যায় আসে না।

সাহিত্যের দিক থেকে, সংগীতের দিক থেকে, এমনকি যে-কোনো দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, বৈষ্ণবপদাবলী জগতের যে-কোনো সাহিত্য ও যে-কোনো সংগীতের চেয়ে অনুন্নত নয়, বরং উন্নতই এবং এর প্রমাণ মেলে তার ভাবে, ভাষায়, রসে, রাগে, তালে, নৃত্যে ও ছন্দে। বর্তমানের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত যে-যে উপকরণ, যে যে সম্পদ, যে-যে অলংকার নিয়ে আত্মমর্যাদার গৌরব করে, বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই পদাবলী লীলারসকীর্তন তার চেয়ে কোনো অংশে কম সম্পদশালী নয়। বৈষ্ণব কবিদের রচিত কীর্তিগাথা এই গীতিকবিতা যেন বসুধার অমিত সুধাভাণ্ডার। দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করে পেয়েছিলেন হলাহল ও অমৃত, আর বিশ্বের মনীষীগণ বৈষ্ণব-গীতিসাহিত্য মন্থন করে পেয়েছেন চিরানন্দদায়ী অমৃতরূপী প্রেমের সন্ধান। সুখদুঃখে ভরা পৃথিবীর বুকে এই অমৃতপ্রস্রবণী পদাবলী সংগীতধারা বয়ে এনে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার প্রতিটি মানবের অন্তরকে করে তুলেছেন রসসিক্ত, প্রেমাবিষ্ট ও ভাবযুক্ত। বিশ্বকাব্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিশ্ববিমুগ্ধকর এই বৈষ্ণবসাহিত্য।

ঢপকীর্তন

পদাবলী কীর্তন ব্যতিরেকে আরো দুইরকম কীর্তনগানের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন ঢপকীর্তন ও কালীকীর্তন। এই ঢপকীর্তনটির সৃষ্টি হয়েছিল পদাবলী কীর্তন থেকেই। কীর্তি থেকে কীর্তন

হয়েছে। দেবতাদি করে মানবাদিরও যশাদি কীর্তিত হওয়ার নাম কীর্তন। অর্থাৎ সংগীতের মাধ্যমে গুণাদি বর্ণনা ও যশকীর্তি আদি অবলম্বনে রচিত কাহিনী প্রকাশই কীর্তন। ঢপকীর্তনে এই বিষয়েই শুধু কীর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। সেজন্য একে কীর্তন নামে অভিহিত করা হয়। কীর্তনের অন্য উপাদান এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

পদাবলীর নায়কনায়িকা যেমন কৃষ্ণরাধা এবং তাঁদেরই পারিষদবর্গ ব্রজের অন্যান্য নরনারী, ঢপকীর্তনেরও নায়কনায়িকা এবং বিষয়বস্তু ব্রজলীলারই ঘটনাবলী। তবে বর্তমানের কীর্তনগান থেকে ঢপকীর্তনের খানিকটা বিশেষত্ব ছিল এবং সে নিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র রূপ, যেটি কীর্তনগানের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। পদাবলী কীর্তনের বিষয়বস্তু নিয়ে ঢপকীর্তন গাওয়া হ'ত বটে, কিন্তু এই গানের গায়নপদ্ধতি ছিল ঠিক খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী গানের গায়নপদ্ধতির মতোই। খেয়াল গানের মতো এর মধ্যে সুরবিস্তার এবং তানকর্তব সমস্ত ব্যবহৃত হ'ত। এ ছাড়া কীর্তনগানে যেটি স্বকীয়তার সন্ধান দেয়, অর্থাৎ সেই আখরটির ব্যবহার ঢপগানে হ'ত না। এক কথায় বলতে গেলে, এখনকার অভিজাত সংগীতের সুস্পষ্ট রূপ ঢপকীর্তনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। কী রাগ, কী তাল, কী পদ্ধতি—অভিজাত সংগীতের সমস্ত কিছুই এর মধ্যে ছিল পুরোপুরিভাবে। তবে খেয়াল গানের পুরোপুরি রূপ যে এতে ছিল, ঠিক তা নয়, কিন্তু টপ্পা গানের পদ্ধতি ও আলংকারিক প্রয়োগের সম্পূর্ণ রীতিনীতিরই অনুসরণ করেছিল ঢপকীর্তন। এর সঙ্গে বেহালা, তবলা কোনো কোনো সময় মৃদঙ্গও সংগত হ'ত। এর ভাষা অনুপ্রাসবহুল হলেও, সুললিত পদসঞ্চয়নে ও ভাবাভিব্যক্তির নিগূঢ় রসপরিবেশনায় পরম মাধুর্যময় ছিল। পরজ, মঙ্গলবিভাস, জয়জয়ন্তী, দেওগিরি, সর্ফদা, ঝিঁঝিট, সুরট, বেহাগ, সুরমল্লার, খাম্বাজ, বিভাস, কালাংড়া, সিন্ধু, কানেড়া, বাহার, ভৈরবী, মঙ্গল-

বিভাতি, পরজবাহার, সোহিনী প্রভৃতি রাগ এবং তিওট, ঢিমেতেতালা, মধ্যমান, খয়রা, গড়খেমটা, কাওয়ালী, আড়া, ঠুংরী, বা একতালা প্রভৃতি তালের উল্লেখ দেখা যায় মধুসূদন রচিত ঢপকীর্তনে।

এই ঢপকীর্তনের বিশিষ্ট ও প্রধান কবি এবং সুরকার ছিলেন যশোহর জেলার উলুশিয়াগ্রাম নিবাসী মধুসূদন কান (১২২০-১২৭৫)। ইনি যেমন ছিলেন সুকবি, তেমন ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। এঁর পরিবারবর্গ সকলেই ছিলেন সুগায়ক ও সুগায়িকা। তাঁদের নিয়েই প্রথম তিনি ঢপকীর্তনের দল গঠন করে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে এই ঢপকীর্তনের প্রচার করেন। এই ঢপকীর্তন একসময়ে উচ্চশিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। রাধাকৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয় বহু গান তিনি রচনা করে গেছেন। গানগুলি পড়লে মনে হয়, তিনি যে শুধু কবি ছিলেন তা নয়, একজন পরম ভক্তকবি ছিলেন। সুন্দর উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে কয়েকটি নূতন ধরনের ঘটনাবলীর অবতারণা করেছেন। তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

শ্রীরাধার উক্তি

"(গো) কি কাজ ভূষণে
শ্যাম দরশনে—
(যাঁর) নয়নভূষণ
রূপ দরশন
শ্রবণ ভূষণ
বাঁশীর গানে।
দেহের ভূষণ ছিল মোদের
কালাচাঁদের দেহ
সে ভূষণ বিহনে মোদের
সদা অঙ্গ দাহ।

আর কি পুন পাব তাহে
মিলন করব দেহে দেহে
দেহের ভূষণ সাজবে দেহে
শীতল হব তাপিত প্রাণে।
হৃদিপদ্মে শ্রীপাদপদ্ম
ছিল যেই ধন
পদ্মে পদ্ম রেখেছিলেন
করিয়ে যতন।
পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গেছে
আর কি পদ্ম তাহে সাজে
পদ্ম মুদি পদ্ম আছে
শ্রীপাদ পদ্ম বিহনে।
তোমরা সব সখী মিলে
কর এই কাম
আমার অঙ্গে প্রতি অঙ্গে
লিখ কৃষ্ণনাম।
যে নাম নিয়ে দেহ আছে
(সেই) নাম লিখ হৃদয় মাঝে
সূদন বলে লেখা আছে
(ও রাই) দেখ না চেয়ে চরণে।"

যশোদার উক্তি

সোহিনী—আদ্ধা

এস দেবকী
(তোমায়) গোপাল দেব কি?

স্তনদুগ্ধ, দেও না মুখে
দেখি কেমন মা ?
নইলে আমি দেব মুখে
দেখ মা কি না ?
(যার) গোপাল তার কোলে যাবে
তারে মা বলে ডাকবে
পায়ের ধূলা মাথায় নেবে
সভা সম্মুখী।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমাকাওয়ালী

দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত।
কিন্তু নয় কাঙ্গালিনী এত
তা হলে কাঁদবে কেন এত ॥
আয় রে গোপাল গোপাল বলে,
করাঘাত হানে কপালে,
বলে এই ছিল কপালে,
আসতাম না রে জান্‌তাম যদি এত।
মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা,—
যদ্যপি কাঙ্গালিনী হত,
তবে তখনি ধন চাইত,
ধনহারা কাঙ্গালিনী নয় ত,
কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণ-গত।
মুক্ত কেশে মুখ্‌ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে মলাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর মোরে,—

স্দন কয় চেন না দ্বারী,
উনি ত রাজার মাতারি,
এই দশা হয় যে মা—তারি,
দেখিলাম হে মাতারি কত শত ॥[৩৯]

এই ঢপকীর্তন সৃষ্টির দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমটি, জনসাধারণের মধ্যেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের রসানুভূতির প্রসার ও জনসাধারণের কোনো কোনো অংশের উচ্চাঙ্গ সংগীতে আসক্তি। দ্বিতীয়টি, আদি ঢপকীর্তন রচয়িতা নিজে ছিলেন অভিজাত সংগীতের পূজারী। তাই অভিজাত সংগীতজ্ঞদের মধ্যেও তাঁর রচিত সংগীত যাতে বিশেষ করে সমাদৃত হয় এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে অভিজাত সংগীতসেবীদের কণ্ঠে গীত হয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই ধারার প্রবর্তন করেন। কবি ছিলেন সুচতুর, তাই এমন একটি চরিত্র ও কাহিনী অবলম্বনে এই সংগীতাবলী রচনা করেছিলেন, যেটি জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত ও প্রিয়; সেই নিমিত্তই এই ঢপকীর্তন সমস্ত শ্রেণীর লোকসমাজে সমাদর পেয়েছিল যথেষ্ট। উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়নপদ্ধতি এবং ধ্রুপদাঙ্গীয়, খেয়ালাঙ্গীয়, টপ্পাঙ্গীয় সমস্ত রাগ-রাগিণী ও তাল সন্নিবেশিত করে এবং কৃষ্ণলীলার প্রেমবৈচিত্র্যমাধুর্য ও ভক্তিরস-পরিষিক্ত উভয়-সংমিশ্রিত এই অপূর্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'কুল-রক্ষা। কাহিনীর নিমিত্ত জনসাধারণ হয়েছে আকৃষ্ট এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধারা রক্ষার নিমিত্ত সংগীতজ্ঞরাও হয়েছেন আকৃষ্ট। উভয় কুলই রক্ষা করেছেন সুচতুর কবি। এ ছাড়া তদানীন্তন বাঙালী সমাজে খেয়াল-টপ্পার প্রচলন শুরু হয়েছিল এবং বিশেষ করে সেই প্রভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন কবি খানিকটা।

৩৯ গীতি-কণিকাবলী। মধু কানের ঢপ-কীর্তন। শ্রীপাঁচকড়ি দে সংকলিত। পৃঃ ২২৭-২২৮

বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে এই গীতিরচনাগুলির যেমন তুলনা মেলে না, সুর বা সংগীতের দিক থেকেও তাই। বাংলা সাহিত্য যেমন বাংলার গীতিধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছে, বাংলার গীতি বা গানও তেমনি বাংলা সাহিত্য ও কাব্যধারার সঙ্গে জড়িত। দুটির সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি-জীবন সত্যই সুষমায়িত ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে আছে।

ভবানন্দের হরিবংশ

আদিরসাত্মক কৃষ্ণলীলাকাব্যের অন্যতম নিদর্শন ভবানন্দের "হরিবংশ"। ভবানন্দ নিজে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। হরিবংশের ভাষা সরল ও স্বাভাবিক এবং বর্ণনীয় ভাব রসের পক্ষে অনুকূল। এই কাব্যের ভাষা এবং রসভাবের বিষয় আলোচনা করলে মনে হয়, কাব্যটি কৃষ্ণকীর্তন ও মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে পূর্ব ময়মনসিংহ, কুমিল্লা বা পশ্চিম শ্রীহট্টে রচিত হয়েছে। হরিবংশের সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথির লিপিকাল ১০৯৬ সাল (১৬৮৯-৯০)। এই কাব্যে তৎকালীন সমাজের অপরিমার্জিত ভাষা এবং উন্নত রুচির বিরোধী বহুপ্রকার শব্দ ও অর্থগত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, কবি ও শিল্পী ভবানন্দের রচনাপদ্ধতি তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।

ভবানন্দের হরিবংশে বিবিধ পুরাণ-কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। শুধু ভাগবতের বিষয়বস্তুই যে অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য থেকে এই কাব্যকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে তা নয়, অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যের নায়কনায়িকা ও পাত্রপাত্রাদির নাম থেকেও এঁর রচিত কাব্যের পাত্রপাত্রাদির নামসকল বিভিন্ন। ললিতা, বিশাখার পরিবর্তে সখীর নাম শ্রীমতী এবং রাধা বা কৃষ্ণকীর্তনের চন্দ্রাবলীর নামান্তর "তিলোত্তমা" পাওয়া যায়। বিমলা রাধার মাতা এবং বড়াই

মাতামহীরূপে অভিহিতা হয়েছেন। শাশুড়ী ও ননদিনীর নাম জটিলা ও কুটিলার স্থলে সর্বত্র বুঢ়ী (বুড়ী) ও মহোদা নাম লক্ষিত হয়। রাসনৃত্য প্রসঙ্গ নেই। তা ছাড়া বস্ত্রহরণ ও ব্রজগোপীদের বিলাস-বর্ণনায়ও পুরাণবর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে বিরোধ দৃষ্ট হয়।

ভবানন্দের অঙ্কিত শ্রীরাধিকা হলেন কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র। প্রেমলীলার বর্ণনায় বিশেষ করে রাধিকার চরিত্রের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর এই কাব্যে। পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীর ন্যায় অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা যদিও এর মধ্যে নেই বটে, কিন্তু প্রেম, অভিমান প্রভৃতি মানবীয় ভাব ও রসের অতি উজ্জ্বল চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সমাজের বাস্তব চিত্র অবলম্বনে রচিত নয়, বরং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনুপম দেবচরিত্র-বর্ণনাই কাব্যের আখ্যায়িকা। শ্রীরাধার মাথুর-বিরহ রূপ অতি সহজ সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এই মাথুরবিরহের বর্ণনায় গীতিকাব্যোচিত রস ও ভাবের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মহাকাব্যোচিত সেই রস ও ভাবের গাম্ভীর্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। করুণ বিপ্রলম্ভরসের সৃষ্টিতেও কবির দক্ষতা কম নয়। হর-গৌরীর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীন করেই কবি সকল দিক বজায় রেখেছেন এবং এই ঘটনাকে ঠিক মিলনান্ত অথবা বিয়োগান্ত কোনোটাই বলা চলে না। ভবানন্দ যে তাঁর কাব্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমন সুন্দর নূতন অপূর্ব এক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করতে পেরেছেন, তা থেকে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। "শ্রীরাধার ভাবী বিরহ" অংশ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করলেই তা বোঝা যায়—

কাহ্নু বোলে "শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর। (৬৮২০)
যাইয়া-মাত্র আসিবাম-ব্যাজ নাহি মোর॥
শোক না ভাবিও প্রিয়া কমল-নয়ানি।
এক-চিত্তে হরষিতে দিয়ার মেলানি॥

আসিমু তোমার কাছে দিন-দুই ব্যাজে।
হাসিয়া মেলানি দেহ-পরিহর লাজে॥" (৬৮২৫)

পুনরপি বোলে রাধা "শুন প্রাণেশ্বর।
তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর॥"
তাকে শুনি গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়-বাক্যে।
"মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্যে॥
আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রূর। (৬৮৩০)
হাসিয়া মেলানি দেহ—যাই মধু-পুর॥
তথা গেলে ব্যাজ মোর নাহিক অনেক।
আসিব কংসেরে বধি—অপেক্ষা দিনেক॥"

বারে বারে গোবিন্দে রাধার ঠাঞি কহে।
তথাপিহ রসবতী প্রত্যয় না হয়ে॥ (৬৮৩৫)
পুনরপি বোলে হরি "শুন প্রিয়া রাধা।
মেলানি দিয়ার যাই—না করিও বাধা॥
দিনেক বিদায় মোরে কর প্রাণেশ্বরি।
তুষ্ট হৈয়া বোল যদি—যাই মধু-পুরী॥"

এহি মত বারে বারে বোলে যদু-পতি। (৬৮৪০)
তখনে স্বরূপে জানিলা রসবতী॥
নিশ্চয় জানিল যদি যাইব মধু-পুরী।
গোবিন্দ-চরণে ধরি কান্দেন সুন্দরী॥
সকরুণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিষাদ।
"কেমনে কুক্ষেণে মোর পড়িল প্রমাদ॥ (৬৮৪৫)

আচম্বিতে কিবা কথা শুনিলু অখন।
প্রাণ মোর স্থির নহে—বিকলিত মন॥'

বিষাদ ভাবিয়া গোবিন্দের পদে ধরি।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে রাধিকা সুন্দরী॥[৪০]

এই কাব্যে শতাধিক গীতিকবিতা এবং তৎসহ বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। এর থেকে অনুমান হয় এই কাব্যটি সম্পূর্ণ গীতিধর্মী ছিল এবং পূর্বে "পাঠক" অর্থাৎ কথকদের দ্বারা গীত হ'ত। বিবিধ রাগরাগিণীর সমাবেশ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই পুঁথিখানি রাগাশ্রিত অভিজাত সংগীতেরই আশ্রয় নিয়েছিল। এই কাব্যে ভাটিয়াল, বসন্ত, ধানশ্রী, নাগুদা, বরাড়ী, নট্ট, গৌরী, সুহি, বেলআর, কেদার, বেলাবরি, মল্লার, আহীর, সিন্ধুড়া, তুড়ি, কামোদ, ভৈরব, ধামাইল, নাগুদা ভাটীয়াল, গান্ধার, পঠমঞ্জরী, শ্রী, নাগুদা কাফি, নাগুদা খোলতা, মালসী, সায়র, ভাটীয়াল বসন্ত, মোহন কামোদ, বিভাষ, গামট্ট, নাগুদা তুড়ি, কর্ণাট, সোম, ভূপালী, কল্যাণ, করুণ ভাটীয়াল, আসয়ারি, নট্ট বেলআর, হেমমঞ্জরী, হেমভাটীয়াল, দুঃখীভাটীয়াল, বিভাষ নাগুদা, হেম তুড়ী, মোহন, শ্যামগড়া, দুঃখী বরাড়ী, প্রেম বরাড়ী, মালশী, সরলি, নাগুদা সায়র প্রভৃতি রাগের নাম পাওয়া যায়।

ভবানন্দ রচিত হরিবংশের ভূয়সী প্রশংসা করে সম্পাদক মহাশয় তাঁর ভূমিকাতে বলেছেন,

"ভবানন্দের কাব্যের গীতগুলি বাস্তব-ভাব-সম্পদে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে হীন নহে; বরং অনেক স্থলেই উহার সমকক্ষ এবং ক্বচিৎ

৪০ কবি ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। পৃঃ ১৫৭

কোনও স্থলে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। শুধু এই গীতের জন্যই ভবানন্দ চিরস্মরণীয় হওয়ার যোগ্য।"[৪১]

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল

শিবায়ন সাহিত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে নীলোৎসবের প্রসঙ্গ এবং এর ছড়াগুলি ও শিবের গাজনের কথা, কেননা শিবায়ন সাহিত্যের মূল উৎসই হ'ল নীলোৎসবের ছড়া এবং শিবের গান। এই নীলোৎসব অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং আরো অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার কয়েকটি গ্রামে এর বহুল প্রচার দেখা যায়। এই নীলোৎসব শিবঠাকুরকে নিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। চৈত্রসংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্বে উৎসব আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর অবসান হয়। এই উৎসবের পাঁচটি অংশ আছে, যেমন—গম্ভীরা, খেজুর-ভাঙ্গা, পাটস্নান (জলবিহার), গিরি-সন্ন্যাস, ছেদভেদাদি। অন্যান্য পূজায় দেবতাদের মতো নীলপূজা উপলক্ষে মৃত্তিকার দ্বারা শিবঠাকুরের কোনো মূর্তি গঠিত হয় না বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে প্রশস্ত স্থানের একপার্শ্বে প্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়। দেবগৃহের বাইরে শিবলিঙ্গেরই অনুকরণে বৃহদাকারের একটি মূর্তি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হয় এবং তাকে বলা হয় কামদেব। কামদেবের পূজা হয় এবং ছাগপশু বলিদানান্তর তার শোণিতধারায় কামদেবকে স্নান করানো হয়। এটিও নীলপূজারই একটি অঙ্গ।

প্রথম দিনে হয় গম্ভীরা-উৎসব। এখানে পৃথকভাবে গম্ভীরা

৪১ কবি ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। পৃঃ ৫॥৵০ (ভূমিকা—সম্পাদক)

সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—প্রায় সর্বত্রই গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে স্থানভেদে এই গম্ভীরা-উৎসবের বিবিধ নামকরণ হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। গম্ভীরা কোথাও গাজন, কোথাও সাহীযাত্রা, কোথাও বা নীলোৎসব এমনি বহু নামই নিয়েছে এবং এই শিবের গাজন অথবা ধর্মের গাজন বঙ্গদেশ ছেড়ে উৎকলেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছে নির্বিঘ্নে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত, মূলতঃ এই গম্ভীরা-উৎসবেরই প্রকারান্তর উৎসবাদি একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে নানারূপে রূপায়িত হয়ে যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। সাধারণতঃ গঙ্গা ও পদ্মার পূর্বতীরেই এই গম্ভীরা-উৎসবের বহুল প্রচার ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, বর্ধমান, বীরভূম, নবদ্বীপ, হুগলি, চব্বিশ পরগনা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই গম্ভীরা-উৎসবের মতো যে-সব অনুষ্ঠান হয়, সেগুলি বেশীর ভাগই গাজন বা নীলোৎসব নামে পরিচিত। এর মধ্যে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলার কোনো কোনো পল্লী অঞ্চলে গাজন-উৎসবের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গম্ভীরা শব্দটি দৃষ্ট হয়। পূর্বে হয়তো এই অনুষ্ঠানাদি সর্বত্রই গম্ভীরা নামে প্রচলিত ছিল এবং পরে বিশেষ কোনো কারণবশতঃ গাজনে পর্যবসিত হয়েছে। এই উৎসবের আদিম ভাব এখনো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, বিশেষরূপে মালদহের গম্ভীরা-উৎসবের মধ্যে। বর্তমানকালে মালদহ জেলায় অনুষ্ঠিত শিবের গাজন উপলক্ষে চাষ করবার যে একটি নিয়ম পালন করা হয়, তার ছড়ার নমুনা দেওয়া হ'ল—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ॥

কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া॥
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত॥
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী॥[৪২]

—শিবনাথ কি মহেশ।

মালদহের উৎসবকালীন গম্ভীরা-মণ্ডপাদির সাজসজ্জা অন্যান্য স্থানের উৎসব গৃহাদির সাজসজ্জা থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। পূজাগৃহ ব্যতিরেকেও নৃত্যমণ্ডপ স্থাপিত হয়েছিল। যে অংশে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হ'ত, সে স্থানে কোনোরূপ আসনাদির ব্যবহার দেখা যায় না। নৃত্যগীতকারীরা ধূলির উপরেই নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই আদ্যের গম্ভীরায় ও ধর্মের গাজনে পদ্মপরিশোভিত মণ্ডপের প্রচলন হয়ে আসছে। তাই সেই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য স্বভাবপ্রস্ফুটিত পঙ্কজের অভাববশতঃ কাগজনির্মিত বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্পরাজির দ্বারাই সজ্জিত করা হয় বর্তমানের এই গম্ভীরা-মণ্ডপসমূহ। সাধারণতঃ চৈত্রসংক্রান্তিতে এই সব মণ্ডপে হরগৌরীর প্রতিমূর্তি ও শিবলিঙ্গাদির পূজা হয়। কিন্তু কোনো কোনো পল্লী অঞ্চলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও এই গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এবং স্থানভেদে এর অনুষ্ঠানপর্ব নয় দিন, আট দিন, সাত দিন, পাঁচ দিন এবং তিন দিন ধরেও উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ অগ্রগামী এবং নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির দ্বারাও এই গম্ভীরা-উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উৎসব পরিচালিত হয় মণ্ডলদের দ্বারা।

৪২ আদ্যের গম্ভীরা। শ্রীহরিদাস পালিত। পৃঃ ৩১

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল নির্ণীত হয়। মণ্ডল শব্দে এখানে প্রধান বোঝায়। যে গ্রামে যে জাতির মধ্যে যাঁকে প্রধান বলে মেনে নেওয়া হয়, তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয় সেই গ্রামের সেই জাতির গম্ভীরা-উৎসব। পূর্বে জমিদারবর্গ এই মণ্ডলদের সাহায্যার্থে ও পূজা উৎসবাদির ব্যয়ের নিমিত্ত কিছু কিছু নিষ্কর জমি প্রদান করতেন এবং তা থেকেই চলত এই উৎসবাদির ব্যয়সমূহ। মণ্ডলরাও সানন্দে উৎসব সমাধান করতে উৎসুক হতেন বাধ্যতামূলক প্রথায় এবং আন্তরিকতায়। এমনি করেই এই উৎসবের জন্য গম্ভীরার সম্পত্তিরও বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্বে হয়তো একটি বিরাট উৎসবই সম্পাদিত হ'ত ছত্রিশ জাতি কিংবা ছত্রিশ গ্রামের নরনারী মিলে। তাই ছত্রিশ গম্ভীরামণ্ডপও দেখতে পাওয়া যায় এবং এটিই বোধহয় আদি গম্ভীরার স্মৃতি বহন করে চলেছে আজের গম্ভীরা নাম নিয়ে। পরে গ্রাম্য বিবাদবশতঃ হয়তো বা বহু দলের সৃষ্টি হওয়ায় বহু গম্ভীরা-মণ্ডপেরও সৃষ্টি হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে। এরা নাম পেয়েছে সখের গম্ভীরা। কোনো সখের গম্ভীরাই প্রাচীন গম্ভীরার কোনো সম্পত্তির অধিকারী হয় না। এই "ছত্রিশী-গম্ভীরা"-উৎসব উপলক্ষে আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি সকল জাতিরই সমাবেশ হ'ত একটি স্থানে। জাতিভেদ ও লঘুগুরু ভেদাভেদের অহংকার ত্যাগ করে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আলাপ আলোচনা হ'ত নির্বিকার চিত্তে।

এই উৎসবের গম্ভীরা নামকরণেরও কারণ রয়েছে। আদিমযুগে দেবগৃহমাত্রেই গম্ভীরা নাম নিয়েছিল। চণ্ডীমণ্ডপাদি থেকে আরম্ভ করে যে কোনো দেবতার পূজাগৃহই গম্ভীরাগৃহ বলে পরিচিত ছিল। গৌড়, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দ্বিতীয় ধর্মপাল এবং গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের সময়ে সমস্ত দেবগৃহ "গম্ভীরি" বা "গম্ভীরা" নামে অভিহিত হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোবিন্দচন্দ্রের গীতে। উপরন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখতে পাই গম্ভীরা

শব্দে দেবগৃহই নির্দিষ্ট হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শ্মশানক্ষেত্রে পিণ্ডদানের মন্ত্রেও গম্ভীরা শব্দের উল্লেখ আছে এবং তা থেকেও গম্ভীর শব্দে গৃহই বোঝায়। উৎকলের গম্ভীরা-উৎসবে মহাদেবের বন্দনা থেকেও বোঝা যায় যে, গম্ভীরা শব্দের অর্থ দেবগৃহ। এই উৎসবের নাম গম্ভীরা হওয়ার আরো দুটি কারণ আছে। "গম্ভীর" শব্দে পদ্ম-পুষ্পকেও বোঝায় এবং এই উৎসবের দেবগৃহাদি প্রস্ফুটিত ঘনসন্নিবিষ্ট পঙ্কজাদি দ্বারা শোভিত হ'ত। হয়তো বা সেজন্য এই উৎসব নাম নিয়েছে গম্ভীরা। আবার শিবসংহিতায় পাওয়া যায় যে শিবের একটি নাম "গম্ভীর" এবং সে-কারণেও এই উৎসবের নাম গম্ভীরা-উৎসব হতে পারে। তাছাড়া এই উৎসবটি শিবদেবতাকে উপলক্ষ করেই অনুষ্ঠিত হ'ত। মহাদেব এবং পদ্মের নামের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে বলেই গম্ভীরা নামের সার্থক যুক্তি উভয়সংশ্লিষ্ট।

বিভিন্ন সমাজ ও স্থানের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার, নিয়ম, পদ্ধতি প্রভৃতি সবের মধ্যেই যেমন কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তেমনি স্থান, কাল, পাত্রভেদে এই উৎসবের বিবিধ অঙ্গাদির মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। কিন্তু তা বলে মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর কোনো প্রকার পার্থক্য ঘটেনি। এই উৎসবে শিববন্দনায় এবং সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনায় যে সমস্ত ছন্দোবদ্ধ কথা-সমষ্টির প্রয়োগ দেখা যায়, সেগুলিকে ছড়ার আখ্যা দেওয়া চলে, কিন্তু অন্যান্য যে কবিতাংশ শিবায়ন কাব্যের ঘটনাবলীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায় (৺শিবের চাষবাস এবং কার্পাস বুনে তার থেকে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা প্রভৃতি প্রসঙ্গ), সেই কবিতাগুলিকে গীতিকবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট রাগ, তাল বা সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। তথাপি বর্তমান কালের শিল্পীগণ স্ব স্ব ইচ্ছামতো সুর যোজনা করে থাকেন এই সকল কবিতায় এবং সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু রাগের সন্ধানও মেলে।

পূর্বোক্ত প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা-উৎসবের তিন দিন পূর্বে শিবমূর্তিটি জলাভ্যন্তরে রাখা হয়। তৃতীয় দিনে শিবঠাকুরকে জল থেকে তোলা অর্থাৎ নিদ্রোত্থিত করানো হয় এবং সে সময় সুরের মাধ্যমে কতকগুলি বাংলা মন্ত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে। এইদিনে জগৎসৃষ্টি, ধূপের সৃষ্টি, দীপের সৃষ্টি এবং নীলসন্ন্যাসীদের হাতে যে বেত্রচৌসার থাকে, সেই বেত্রচৌসারের জন্মকথা ছন্দোবদ্ধ ছড়াগুলির ভিতরে নিহিত। এর সঙ্গে সুর যোজনা করে নীলসন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ বালাগণ যখন উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে, তখন একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দিনে হয় পাটস্নান বা জলবিহার-উৎসব। নিম অথবা বেলকাঠে এই পাট তৈরী হয়। এই পাটখানি প্রস্থে আট অঙ্গুলি এবং দৈর্ঘ্যে চার বা পাঁচ হাত পরিমিত হয়। শঙ্খ, চক্র, কোশাকুশি প্রভৃতি বিচিত্র রকমের খোদাই করা থাকে এর সম্পূর্ণ গাত্রে। নূতন বস্ত্রে পাটখানি আবৃত থাকে এবং আরো একখানি নূতন বস্ত্র দ্বারা বাণ, বর্শী, পাশবাণ, বেত্রশলাকা, চৌসার ইত্যাদি বন্ধন করে রাখা হয়। পরে ঐ সকল সমেত পাটখানিকে পুষ্করিণীর জলে স্নান করানো হয়। এই নীলোৎসবে পাটস্নানের দিন বহু নরনারী নীরোগ ও পুত্রবতী হওয়ার আশায় দেশ বিদেশ থেকে ঐ জল গ্রহণ করতে আসে। তৃতীয় দিনে হয় খেজুরভাঙ্গা উৎসব। ঐদিন বালাগণ একটি খেজুর গাছ থেকে দুই-তিন ছড়া খেজুর পেড়ে নিয়ে পাটের সঙ্গে বেঁধে রাখে। গাছে উঠবার সময় কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করে এবং বেত্রচৌসার হাতে নিয়ে তারা খেজুর গাছটিকে প্রদক্ষিণ করে। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, শিবঠাকুরের বরে কণ্টকবহুল খেজুর গাছটি যেন নিষ্কণ্টক হয় এবং একটি কণ্টকও যেন বালার অঙ্গে বিদ্ধ না হয়। কার্যতঃ হয়েও থাকে তাই এবং বালার গায়ে একটি কাঁটার আঁচড়ও লাগে না। চতুর্থ দিনে হয় গিরিসন্ন্যাস। এই উৎসবের ঘটনা এই যে,

দুটি কৃশ গরুকে চাষী ক্রয় করে এবং বরণ করে ঘরে নিয়ে আসে। শিবকৃপায় তারা সুস্থ সবল হয়ে ওঠে এবং পরে বাঘ গরু দুটিকে আক্রমণ করে। সেই বাঘকে বধ করে চাষীরা গরু দুটি উদ্ধার করে এবং লজ্জা নিবারণের জন্য শিবকে বাঘের চামড়া বস্ত্ররূপে দান করে। ঐদিনে শিব-উৎসব উপলক্ষে শিবের সম্মুখে যে সমস্ত লোক যে যে কাজ করেছে, তাদের সকলেরই মুদ্রাদি প্রদর্শন করে নৃত্যের ভঙ্গীতে শিবকে জানাতে হয় শত বা সহস্র প্রণাম। পরে গভীর রাত্রে ভোগ সরানো হয় অর্থাৎ দেওয়া হয় শিবভোগ। এর উপাদান হয় খিচুড়ি ও আগুনে পোড়া গজাল (শাল) মাছ। বালাদের সঙ্গে ঢাকী ঢাক বাজিয়ে চলে গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং বালাগণ সুরে সুরে বলতে থাকে, "ধর ধর কালীকা মা, জেতা থুয়্যা মরা খা।" পরদিন প্রত্যূষে হয় ছেদভেদাদি অর্থাৎ বাণ, পাশবাণ, বর্শী ইত্যাদি ফোঁড়া। আট বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে ৪০।৫০ বছর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ এই বাণ, বর্শী শিবের সম্মুখে ফুঁড়ে নৃত্য করে এবং চড়কগাছে ঝুলে বলতে থাকে, "এইবার উদ্ধার কর জয় মহাদেব।" এই হ'ল নীলোৎসবের ঘটনা।

উৎসবের প্রতিদিন একটি কাঠের দোলা নীল ফুল নামে একরকম ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং ঐ ফুল ঠিক নীলোৎসবের সময়েই প্রস্ফুটিত হয়। দোলাভ্যন্তরে শিবঠাকুরকে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ শিবঠাকুরকে প্রণাম করে ফলমূলাদি ভেট দেয়। আরো একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উৎসবের শেষদিন রাত্রে সমস্ত শ্রেণীর লোককেই এই শিবমূর্তিটিকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। যাঁরা এই শিবঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের প্রত্যেকের ঘরে সেদিন শিবঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয়। এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে নিয়ে যাবার সময় সারিবদ্ধভাবে শুয়ে পড়ে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোক এবং তাদেরই বুকের

উপর দিয়ে পুরোহিত শিবঠাকুরকে বুকে করে হেঁটে যান। সেদিন আর জাতিভেদ থাকে না, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে পরস্পর পরস্পরকে করে আলিঙ্গন এবং এক একজন করে প্রত্যেকেই শিবঠাকুরকে বুকে মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে। এই উৎসব উপলক্ষে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই চলে এসেছে মিত্রতা এবং উৎসবের বালাগণ প্রায়শঃই নমঃশূদ্র এবং রজকশ্রেণীভুক্ত হয়।

পূর্ববাংলায় শিবের গাজন বলে একপ্রকার সংগীত হয়। গাজন, গান ও ছড়াগুলি রহস্যজনক হাস্যকৌতুকপরিপূর্ণ। এই রচনাবলীর বিশেষত্ব এই যে, নিন্দাবাক্যের মধ্য দিয়ে শিবঠাকুরের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এমন সুন্দর ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে শিবঠাকুরের একদিকে নিন্দাবাদ অপরদিকে স্তুতিবাদ উভয়টি প্রকাশিত হয়েছে। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অর্থাৎ নীলোৎসব উপলক্ষে ছড়ার মতো কতকগুলি রচনা বালারা সুর করে গেয়ে থাকে, সেগুলির অর্থ অস্পষ্ট—

আদা কাটি চাক্ চাক্
রক্ত পড়ে ধীরে।
শিবের খাজনা খাটি
মহাদেবের বরে।

একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই ছড়াগুলির মধ্যে অর্থসংগতি না থাকলেও, তাল ও রাগসংগতি মেলে। এই ছড়াটির মধ্যে বর্ত্তমানের একতাল (১২ মাত্রা) ও ঝিন্‌জোটির রূপ সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এমনি হেঁয়ালিতে পরিপূর্ণ ছড়া শিবঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক পাওয়া যায়। যেমন শিবকে নিদ্রোত্থিত করবার ছড়া—

ব র ণ।

চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্মমাস।
সন্ সন্ন্যাসী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস॥

শিব শিব বলিয়া বালা ডাকে ঘন ঘন।
চৈতন্য হইয়া প্রভু দিলেন দরশন ॥[৪৩]

বিবাহ আসরে শিব।

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়াপড়্শী দেখ্তে এল বিয়ার কথা শুইনা ॥
টিপ্ টিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙ্গায় গুণ্ গুণ্ করে।
খৈস্যা পড়্লো ব্রগোচর্ম্ম শিব ল্যাঙ্গ্টা হইয়া নাচে ॥
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে।
পাগ্লা জামাই দেখ্যা সবে আউয়াছিয়া করে ॥
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ।
তুইটা চক্ষু ফুইড্যা রইছে পঞ্চখানি মুখ ॥
না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর।
ডঙ্কা মাইর‍্যা পাগল জামাই বাড়ীর বাইর কর ॥[৪৪]

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের "শ্রীকরুণানিধান-বিলাস" কাব্য আনুমানিক ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। তিনি তাঁর কাব্যে চরক সম্বন্ধে বলেছেন—

চরক সন্ন্যাস লীলা। আড়ানা একতালা ॥ চৌপদি ॥ চৈত্র-শেষে সন্ন্যাস চরক ব্রত। গোপী মনে হইল উপস্থিত ॥ ১ ॥ বাণভক্ত লাগিয়া করিল সঞ্চার। ব্রজেতে গোপিনী করিল প্রচার ॥ ২ ॥ হিংসক জন্তুর মুখে বিন্ধি লোহা বাণ। উরুকুক্ষি ছেন্দি বর্শী সূত্রাসন ॥ ৩ ॥ সে পশু নরতনু ধারণ করি। অত্যা-বধি বাণ ফোড়ে দেশ ভরি ॥ ৪ ॥ পাপীর শাসন জন্য হিতকারী।

৪৩ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম খণ্ড)। দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ১৫৯
৪৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম খণ্ড)। দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ১৬০

রচিল বাণের লীলা সহনারী ॥ ৫ ॥ নীল দেবে নীল পূজে ব্রজ গোপী। করিল প্রাণমন তন সঁপি ॥ ৬ ॥ সন্ন্যাসিনী বেত্র ছাটি করে ধরি। গলিত কেশে নাচে বলি হরি ॥ ৭ ॥ ফুল খেলে কাঁটা ভাঙ্গে দেয় ঝাঁপ। গাজনের মূল রাধার প্রতাপ ॥ ৮ ॥ হাটঘাট সন্ন্যাস ফলতোলা। ফুল কাড়ান কৃষ্ণের পদে খেলা ॥ ৯ ॥ হরির মহিমা গায় তরজায়। শুনিয়া ভক্তের শ্রবণ জুড়ায় ॥ ১০ ॥ ত্রিপদি ॥ বাছিয়া বিশালশালঃ কাটিয়া তাহার ডালঃ মোচ বেড়ি থাকুই বনায়। বাঁশের বেড়ুঁড়ি বান্ধিঃ চরখি সহিত ছান্দিঃ এক মুখে ঝুলায় শিকায় ॥ ১১ ॥ আর দিগে প্রেম রসিঃ গোপিনী ঘুরায় কষিঃ শিকামধ্যে বসি ব্রজরায়। কখন গোপিনী সঙ্গেঃ ঘুরিতেছে প্রেমরঙ্গেঃ ঢাক বাদ্যে ভুবন কাঁপায় ॥ ১২ ॥[৪৫]

নীলোৎসবের এই ছড়া ও শিবের গাজনের সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও, শিবায়ন সাহিত্য সৃষ্টি করতে তা যে সাহায্য করেছিল, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য ও সংগীতের কৌলীন্য হয়তো সে কোনোদিনই পাবে না, তবুও তারই সান্নিধ্যে তাকেই অবলম্বন করে এই শিবায়ন সাহিত্য যে ভদ্র রূপ নিয়ে ভদ্রসমাজে স্থান পেয়েছে, এই তার গৌরব। এই নীলোৎসবের ছড়াগুলির চালক অর্থাৎ কবি-দের নাম পাওয়া যায় না। পুরুষানুক্রমে ছড়াগুলি পেয়ে এসেছে নীলোৎসবের নির্দিষ্ট সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ বালারা। তবে ছড়াগুলি যে গীতিধর্মী ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীলসন্ন্যাসীগণ ছড়াগুলি সুরে সুরেই বলত, কিন্তু সেই সুরগুলিই যে একটি নির্দিষ্ট রাগকে নিয়ে হ'ত, এ-খবর তারা রাখত না। তাদের অজ্ঞাতসারেই অসংস্কৃত ছড়াগুলির মধ্যে রাগসংগীতের প্রকৃষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। শিবায়ন সাহিত্যও সুরের আশ্রয় নিয়েছিল, তাই শিবায়নের প্রসার হয়েছে

৪৫ শ্রীকরুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ৩৪৬

জনগণের সংগীতপ্রিয়তা ও শিবপ্রিয়তার নিবন্ধন হেতু। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আদি যুগ থেকেই সাহিত্য ও সংগীতে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শিবায়ন কাব্যও সে সংগতি রক্ষা করেছে। লৌকিক সাহিত্য বলে শিবায়নের আখ্যা না থাকলেও, এটি যে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর ধারা অন্যান্য সাহিত্যের চেয়ে খানিকটা স্বতন্ত্র এবং হাস্যকৌতুকপরিপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক।

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে যেমন দেবতাদের উপর ধনী মানবের অশ্রদ্ধাবশতঃ, দেবরোষে পতিত মানবের লাঞ্ছনা ও অনেক দুঃখকষ্টের পরে, পুনরায় দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ও তাঁদের পূজাপ্রচারে, সেই মানুষই এগিয়ে গিয়েছে দেবতাদের রোষ বিমুক্তির হেতু, শিবায়ন কাব্যে সেই গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের কর্মতৎপরতা যখন শ্লথ, শস্যোৎপাদন পরিমিত অপেক্ষাও স্বল্প, অভাব অনটন যখন রুদ্রমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে জনসমাজে, তখনই কৃষকরূপী রুদ্রের (শিবের) কল্পনা করেছেন কবি। তিনি দেখিয়েছেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে দেবতারও জোটে না আহার, বস্ত্র। তাই কুবের যাঁর ভাণ্ডারী, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর কন্যা, বেদবাদিনী বীণাপাণি যাঁর দুহিতা, সেই পরমৈশ্বর্যবান শিবকেও কবি সাজিয়েছেন নিরক্ষর পরম দুঃস্থ ভিখারী সামান্য নিম্নশ্রেণীর কৃষক। বিশ্বের অন্ন যিনি যুগিয়ে চলেন, সেই অন্নপূর্ণার হাতে দিয়েছেন ভিক্ষাপাত্র তুলে। জোটে না তাঁর বস্ত্র, জোটে না তাঁর আয়তির নিদর্শন সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা। এই নিয়ে চলেছে দিবারাত্রি শিব-পার্বতীর কোন্দল, প্রতিদিনই শিবকে সচেষ্ট হতে অনুনয় বিনয়, এমনকি গালাগালি করতেও প্রবৃত্ত হয়েছেন গৌরী। সংসারের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য তিনি স্বামীকে কৃষিকার্যে নিয়োজিত হতে বলেছেন। রামাই পণ্ডিতের "শূন্য-পুরাণে" শিবের চাষ বিষয়ক প্রাচীন শিব-গীতিকার একটি নমুনা—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুমি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥ ৬
পুখরী কাঁদাএ লইব ভূমখানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥ ৭
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥ ৮
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব ॥ ৯
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড় ॥ ১০
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতিগুলা গাএ ॥ ১১
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামর্ত্তর আস ॥ ১২
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দবব পাই জেন ধম্মপূজার বেলা ॥ ১৩ ॥[৪৬]

খ্রীঃ দশম-একাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের রচিত "শূন্য-পুরাণে"র এই অংশ থেকে বোঝা যায়, সংসারের অসচ্ছলতা দূর করতে কবি দেবতার কৃষিকার্যের দৃষ্টান্তে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন দেবতার আদর্শেই কৃষিকার্য করবার নিমিত্ত। এমনি যখনই সমাজে নানা দিক থেকে এসেছে নানারূপ উপদ্রব, তখনই অর্ধচেতন মানবদের সচেতন করতে কবিরা হয়েছেন সচেষ্ট, তাই লৌকিক শিবের কৃষক-রূপ সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ মানবীয় প্রকৃতির মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবিগণ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য।

৪৬ শূন্য-পুরাণ। রামাই পণ্ডিত। পৃঃ ১০৮-১০৯

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যাদির পালায়, দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্ব ও মিত্রতার মিলিত ঘটনাবলীর মধ্যে, সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নায় মিশ্রিত নায়কনায়িকার জীবনের বিবিধ বিস্তৃত ঘটনাবলীর সন্নিবেশ দেখা যায়। প্রধান নায়ক কিংবা নায়িকার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন দেবতাদেরই একজন এবং অন্য অংশ নিয়েছে যে কোনো একজন নর কিংবা নারী। কিন্তু শিবায়ন পালার প্রধান নায়ক-নায়িকারূপে শিব ও গৌরীকেই কবি সাজিয়েছেন। এই কাব্যে আরো একটি বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে এই যে, অতি সাধারণ নীচজাতির সঙ্গে শিবঠাকুরের পরম মিতালি ছিল। এমনকি ডোম, হাঁড়ি, বাগদী এদের সঙ্গে তিনি দেবত্বের গরিমা পরিবর্জন করে, সমগোত্রীয় দেবতাদের সঙ্গে যেমন করে মেলামেশা, আদানপ্রদান, হাস্যপরিহাস, ক্রীড়াকৌতুক করতেন তদনুরূপই আচরণ করতেন উচ্চমানবসমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য নীচজাতির নরনারীদের নিয়ে। এখানে মহাদেবের উদারতা বিশেষ করে দেখাবার জন্য কবিদের যে প্রচেষ্টা, এ থেকে কবি ও মহাদেব এই উভয়েরই সাম্যবাদের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট করে দেয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে "শিবায়ন" নামে এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। এঁর লেখা পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সৌন্দর্য সরলতায় ভরপুর এবং সুপরিমার্জিত রুচির পরিচায়ক। কবি-রচিত শিবায়ন কাব্যেই প্রথম রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—সারেঙ্গ, মঙ্গলগুর্জরী, পঠমঞ্জরী, মালশী, শ্রীরাগ, ধানসী, কামোদ, নট, গুর্জরী, ভৈরবী, পাহিড়া, মহাবারাটিকা, বিহাগড়া কেদার, সিন্ধুড়া, বারাড়ি, আহিরী, করুণাশ্রী, গৌরী, মঙ্গল-কামোদ, সুহই, মহারাটি, করুণা, রামক্রী, মঙ্গল প্রভৃতি।

শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতির বর্ণনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের গার্হস্থ্যচিত্র অধিকতর বাস্তবরূপ নিয়ে ফুটে

উঠেছে। হরগৌরীর কোন্দলই নিন্দা ও স্তুতিবাদের অপূর্ব নিদর্শন।

মহারাষ্ট্রী রাগ।

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি
সেজে সাপ করে ইলিবিলি।
এমত সুখের শয্যা ইথে পতি পরিচর্য্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥ ১॥

ভোলানাথ, আমি যেই তেঁঞি সে সম্বরি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পালাইত হৈয়া দিগম্বরী॥ ধ্রু॥
ধ্যানে যদি পাও সুখ ক্ষণ প্রায় যায় যুগ
বলদেরে না মিলে আহার।
জিয়ে পরমায় বলে ক্ষীর গুণে নাহি চলে
ভৃঙ্গি দেখ অস্থিচর্ম্মসার॥
যাও যদি ভিক্ষাটন ঘর হয় পাসরণ
কোচের নগরে নাট গীত।
কোচিনী ভুলাও তালে নাগরালি বুড়াকালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত॥ ২॥[৪৭]

৪৭ শিবায়ন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত। পৃঃ ২৩৭

শিবঠাকুরের সম্বন্ধে এই রসকৌতুকপরিপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে কাব্যধর্মের অভাব ঘটেনি, তবে এই রচনাবলী পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন কাব্যে। শিবায়ন কাব্য ব্যতীত রামেশ্বর সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লিখেছেন। রামেশ্বর সাধারণ চাষী গৃহস্থের জন্য শিবায়ন ও পাঁচালীসমূহ রচনা করে গেছেন, কিন্তু এই সমস্ত পাঁচালীর মধ্যে তাঁর যে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে বলতে পারা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। শিবায়ন আটপালার পাঁচালী কাব্য এবং এ শুধু বাংলাদেশের কোনো একটি বিশিষ্ট কাহিনী নিয়ে লেখা নয়। পদ্মাপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও নন্দিকেশ্বরপুরাণ থেকে কোনো কোনো আখ্যায়িকা নিয়েও শিবায়ন কাব্য রচিত হয়েছে। রামেশ্বরের লেখাগুলি অনায়াসসুন্দর, সুখশ্রাব্য ও সরল। তাছাড়া তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যও আছে প্রচুর। কবির লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য লেখকের আদিরসাত্মক কাব্যের মতো স্পষ্টতর অশ্লীলতার স্থূলতা এতে নেই। গ্রাম্য অতি সাধারণ চাষাভূষার জন্যই এঁর পাঁচালী লেখা বটে, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভদ্রসমাজের মধ্যে ভদ্রকাব্যরূপে একে প্রকাশ করা। তাই তিনি তাঁর ভণিতার মধ্যে বার-বার উল্লেখ করেছেন—

চন্দ্রচূড়-চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর ॥[৪৮]

শিবসংগীতকে গ্রাম্য পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে রামেশ্বর যথার্থই প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং তাঁর সেই প্রচেষ্টা সত্যই ফলবতী হয়েছে ভদ্রকাব্য রচনায়।

পার্বতীর গৃহস্থালি বর্ণনায় একটি চিরদরিদ্র এবং লোভী বাঙালী

৪৮ শিবায়ন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত। পৃঃ ৮১

ব্রাহ্মণ পরিবারের সুন্দর চিত্র কবির লেখায় ফুটে উঠেছে। দেব-চরিত্রগুলির দেবমহিমার অস্তিত্ব এখানে নেই।

পিতাপুত্রের ভোজন—

যোগ করি পুত্র দুটী লয়ে দুই পাশে।
পতিত পুরট-পীঠে পুরহর বসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥[৪৯]

দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত অসচ্ছল সংসারে স্বামীর কাছে পার্বতীর শঙ্খ প্রার্থনার সুন্দর আলেখ্য কবি চিত্রিত করেছেন—

প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্কিণী সে রঙ্কনাথে শংখ দিতে বলে॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ॥
দুঃখিনীর হাতে শংখ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছুই না চাই॥
লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
... ...

৪৯ শিবায়ন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত। পৃঃ ৩২

পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।
তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে ॥
শংখের সম্বাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা ॥

... ...

ভিখারির ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তাঁরে।
জন্‌জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥[৫০]

প্রাচীন বাংলার সমাজে মঙ্গলকাব্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তার গীতিরূপের প্রকৃতি ও ধারা অনুসন্ধান করলে একথাই বলা যায় যে, তা আসলে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল। সংগীতশাস্ত্রে "মঙ্গল" গানের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিশেষ করে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে এর উল্লেখ রয়েছে—

বদনং চচ্চরী চর্যা পদ্ধড়ী রাহড়ী তথা।
বীরশ্রীর্মঙ্গলাচারো ধবলো মঙ্গলস্তথা ॥ ৩২ ॥[৫১]

অন্যত্র শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলচ্ছন্দসাথবা ॥ ৩০৩ ॥[৫২]

অর্থাৎ—কৈশিকী বা বোট্টরাগে, বিলম্বিত লয়ে এবং মঙ্গলছন্দে যে গান গাওয়া হ'ত, তা মঙ্গলগান নামে অভিহিত ছিল। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আবার কল্লিনাথ বলেছেন—

৫০ শিবায়ন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত। পৃঃ ৮৯-৯০

৫১ সঙ্গীতরত্নাকর। শার্ঙ্গদেব। Vol. II, চতুর্থঃ প্রবন্ধাধ্যায়ঃ। পৃঃ ১৯৭

৫২ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩০৮

মঙ্গলং লক্ষয়তি—কৈশিক্যামিতি। কৈশিকীরাগে বোট্টরাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈর্বিলম্বিতেন লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথ বা মঙ্গলনাম্না ছন্দসা ॥ ৩০৩ ॥ ইতি মঙ্গলপ্রবন্ধঃ ॥[৫৩]

তাছাড়া কল্লিনাথ মঙ্গলছন্দের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—

পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতিপাদগতাশ্চে-
ন্মঙ্গলমাহুরিদং সুধিয়ঃ খলু বৃত্তম্ ॥[৫৪]

এর প্রতিপাদে ছিল পাঁচটি চতুর্মাত্রিক "গণ" অর্থাৎ এক একটি পাদে কুড়িটি করে মাত্রা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এটি হ'ল মঙ্গলগানের আদিরূপের বর্ণনা। বোট্টরাগটি উৎসবকালে গীত হ'ত। পরবর্তীকালে অবশ্য মঙ্গলগানে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

মঙ্গল, পাঁচালী, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি গান একসময়ে সহজ সরল পল্লীগীতিরূপে পরিচিত থাকলেও, খ্রীষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দী থেকে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর সমাজে অভিজাত শ্রেণী হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল—যাতে করে তারা পদমর্যাদা লাভ করেছিল "মঙ্গল" বা "মাঙ্গলিকা", "পাঁচালী" বা "পাঞ্চালিকা", "ঝুমুর" বা "জম্ভলিকা", "দোহা" বা "দ্বিপাদিকা", "চাঁচরি" বা "চর্চরিকা", "ছপ্পয়" বা "ষট্‌পদী" প্রভৃতি নামে ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। সুতরাং বহু অভিজাত প্রবন্ধগান আজও পল্লীর সমাজে লোকসাহিত্যের নাম নিয়ে বেঁচে আছে।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন সাহিত্যের জগতে এক অমূল্য অবদান, তেমনি সংগীতের ধারার সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অক্ষুন্ন আছে। সংগীতের

৫৩ সঙ্গীত-রত্নাকর। শার্ঙ্গদেব। Vol. II, চতুর্থঃ প্রবন্ধাধ্যায়ঃ। পৃঃ ৩০৮
৫৪ ঐ ঐ ঐ "

দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলিকে বিচার করলে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে সনাতন সম্পর্কের ধারা এদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে। মোটকথা মঙ্গলকাব্যগুলি সুর ও সাহিত্যের সংমিশ্রণে বাংলাদেশের বুকে সৌন্দর্যমন্দাকিনীর সৃষ্টি করেছে। এখন কি ভাবে মঙ্গলকাব্যে গীতিরূপ আত্মপ্রকাশ করল, তার আলোচনাই এখানে কিছু করব।

প্রগতির সূত্রে ব্রতকথার কিয়দংশ এসে পৌঁছেছে মঙ্গলকাব্যে। জৈবিক চেতনা সক্রিয়তা লাভ করেছে অভাববোধে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা, রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থান্তর, জলকষ্ট, অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট যাবতীয় দুঃখদৈন্যের সৃষ্টিই করেছে অভাব-বোধের চেতনা। এই অভাববোধ বিশ্বস্রষ্টার জীবমাত্রেই আছে। তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি কোনোদিনই কোনো প্রাণী, চেষ্টা চলেছে অভাবদূরের নিমিত্ত আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত। আতপতাপ নিবারণে, বারিপাতে, ঝঞ্ঝাবাত্যায় আত্মরক্ষার্থে, আদি মানব খুঁজে বের করেছে গুহাশ্রয়। মানুষেতর জীবও খুঁজে নিয়েছে আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল যে যতটুকু পেরেছে।

মানুষ যখন ক্রমোন্নতির পথে পা বাড়িয়েছে, স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে যখন সমাজ সংসার গড়ে তুলেছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যখন তাদের লড়বার শক্তি অকিঞ্চিৎকর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বিধ্বস্ত অসহায় বলে মনে করেছে নিজেদের প্রবল শক্তির কাছে, যখনই পরাভব মেনেছে বার-বার, তখনই এসেছে দেবতাকল্পনা। অলঙ্ঘনীয় অমোঘ শক্তির কাছে তখনই করেছে মানুষ মাথা নত। তাই দৈবশক্তির আনুকূল্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছে পূজাপার্বণ। এই দেবত্ব আরোপিত হয়েছে কখনো অদৃশ্য শক্তিতে, কখনো মানবে, কখনো স্থলচর জলচর জীবজন্তুতে, লতাবৃক্ষে, এমনকি সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, মৃত্তিকা যাবতীয় পদার্থে। মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের দিকে দৃষ্টি দিলেই তার

সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, সর্প—যাদের দ্বারা মানুষের ক্ষতিসাধন হ'ত, নিরস্ত্র মানুষ যাদের কাছে হ'ত বিব্রত, তাদের কৃপালাভ করবার জন্য, তাদেরই তুষ্টিসাধনের জন্য যুগিয়ে এসেছে সাধ্যমত পূজাপার্বণের ভেট। তবে এই দেবতা অর্চনার কারণ তৎকালীন মানবসমাজের মঙ্গলের নিমিত্তই। তাই এই সমস্ত দেবতাদের নিয়ে যে সমস্ত উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে, যে কাব্য ও যে সাহিত্যের উদ্‌ভব হয়েছে, তাদেরই নাম মঙ্গলকাব্য। এখানেও মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিকেরা সমাজের মঙ্গলই সাধিত করেছেন, মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকার দৃষ্টান্তে জনসমাজকে অনুপ্রেরিত করে।

খ্রীষ্টপরবর্তী যুগে বিভিন্ন পুরাণাদির সৃষ্টি হয়েছিল যে উদ্দেশ্য নিয়ে, বিবিধ মঙ্গলকাব্যগুলিরও সেই একই উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্তও এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষ এক প্রকার ধর্ম আখ্যায়িকা নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির সাধনা চলেছে। এই সাহিত্য পারমার্থিক নয়, একেবারেই পার্থিব সংসারের সুখদুঃখ নিয়ে তখনকার সমাজের স্মৃতি বহন করে চলেছে আজ পর্যন্তও।

এই মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে দেবদেবীকে আশ্রয় করে। সমাজ ও মানবজীবনের বিচিত্র পরিবেশ ও অবস্থার প্রতিচ্ছবিও তার সঙ্গে সম্পর্কিত আছে। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি গীতিরূপা। এই কাব্যের প্রচার এবং প্রসার হয়েছে সংগীতকে অবলম্বন করে। সাধারণতঃ সংগীত মানুষকে যত সহজে আকর্ষণ করে, শুধু সাহিত্য জনসাধারণকে ততটা আকর্ষণ করে না। তাই আনন্দের মধ্য দিয়ে, সাহিত্যানুভূতির সুযোগ পেয়েছিল তখনকার মানুষ সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে। সেজন্য সাধারণ সমাজে মঙ্গলকাব্য সমাদর পেয়েছিল সমধিক। মঙ্গলকাব্যগুলি গীত হ'ত। মঙ্গলকাব্যের আখ্যায়িকা বা ধর্মচেতনার যে একটি বিশেষ আকর্ষণ

ছিল, তা অনস্বীকার্য। তবুও মনে হয় সংগীতের সহযোগিতায় এই আকর্ষণ আরো তীব্র ও বহুপ্রসারিত হয়েছে। এর সঙ্গে মৃদঙ্গ, করতাল এবং ঢোল বাদ্যাদির ব্যবহার ছিল। এই মঙ্গলকাব্যগীতি-সমষ্টি শুধু দেবতাদের স্তুতিবাদ ছাড়া আরো একটি বিষয়কে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। তার মূল বস্তুটি সত্যই দেখবার মতো। সাধারণতঃ যে দেবতাদির মর্তে পূজার প্রচলন ছিল, মঙ্গলকাব্যের প্রায়শঃ দেবদেবীগণই তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজে এঁরা ছিলেন অপাংক্তেয়, কাজেই নিজেদের প্রচারে নিজেরাই হয়ে পড়লেন ব্যস্ত। তাই কোনো দেবী বণিককে, কেউ বা ব্যাধকে আশ্রয় করে নিজের দুর্বার শক্তির পরিচয় দিয়ে সাধারণ জনসমাজে প্রথম প্রবিষ্ট হতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল এবং তাঁদের আসনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আংশিকভাবে কোনো একটি গণ্ডীবদ্ধ সমাজের মধ্যে। পরে সকল সমাজেই তাঁদের নিয়েছিল অন্য দেবতাশ্রেণীর সমগোত্রীয় করে। মঙ্গলকাব্যের রচনার বিশেষ দিক এইটি।

পৌরাণিক দেবদেবী সূর্য, গৌরী, ভবানী, দুর্গা, অন্নদা, কমলা, গঙ্গা এবং লৌকিক দেবদেবী মনসা, ধর্ম, কালিকা, শীতলা, রায়, ষষ্ঠী, সারদা প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই মঙ্গকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সমস্ত মঙ্গলকাব্যই যে সংগীতধর্মী তা নয়; এর মধ্যে চণ্ডী, মনসা, শীতলা ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি গীতিধর্মে পরিপূর্ণ। ঐগুলি গান ছাড়া শুধু পাঠ করা হ'ত না এবং বর্তমানেও হয় না। এর মধ্যে চণ্ডী, মনসা, কমলা, অন্নদা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে জনসমাজে সংগীতের সান্নিধ্যহেতু। কালকেতুর উপাখ্যান, চাঁদসদাগরের উপাখ্যান, ধনপতিসদাগরের উপাখ্যান প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাখ্যানের মধ্যেই করুণরস, বীররস ও হাস্য-রসের সুন্দর পরিবেশ দেখা যায়।

সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই মঙ্গলকাব্য রচনা শুরু হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীতে। ঐ যুগে সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন মনসামঙ্গলের রচয়িতা বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, দ্বিজবংশীদাস প্রভৃতি, চণ্ডীমঙ্গল-স্রষ্টা মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি এবং ধর্মমঙ্গলকার মাণিক গাঙ্গুলি প্রভৃতি শক্তিশালী কবিদের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষেই সমৃদ্ধ কাব্যের পথে এগিয়ে চলেছিল এবং সাহিত্যসম্ভারেও পরিপুষ্ট হয়েছিল সংস্কৃত কাব্যের আনুকূল্যে, কিন্তু ভাষা ও কল্পনার দিক থেকে পরিপূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়নি তখনো। সমুন্নত সাহিত্যক্ষেত্রে সে সমুন্নতিলাভ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। সুললিত শব্দঝংকারে, সুমধুর ছন্দবিন্যাসে, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যে, সুমার্জিত যমক শব্দা-লংকারের উজ্জ্বল ছটায় সেই মঙ্গলকাব্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র গ্রাম্যতামুক্ত করে বিশিষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যশালী যুগ বলতে গেলে এই অষ্টাদশ শতাব্দীকেই বলতে হয়। পূর্ববর্তী যুগের কবিদের সরল সহজ ভাষা, সুখবোধ্য ভাবকল্পনা এবং প্রত্যক্ষ সত্যসৃষ্টির যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের প্রকাশ অন্তর স্পর্শ করত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি এই যুগের কবি ঘনরাম এবং ভারতচন্দ্র সেই একই বস্তু নিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যে নূতনের সন্ধান দিয়েছেন এবং শব্দসঞ্চয়ন, রচনাপারিপাট্যে যে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। এক অভিনব পদ্ধতিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে, যেভাবে নবরূপ দান করে তাঁরা নিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, মধ্যযুগের সাহিত্যে এমন সুনিপুণতার পরিচয় সম্ভবতঃ আর কেউ দেননি। তাই সমস্ত মধ্যযুগের সাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পদ এই বিশিষ্ট দুই কবির কাব্যসৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের প্রথম দুই অংশের কাহিনী গতানুগতিক ধারায়ই চলে এসেছে, তার মধ্যে নিজস্ব মৌলিকত্ব বিশেষ প্রকাশ পায়নি, তবে শেষের দিকের ছোট ছোট বিষয়গুলি এবং ছোট ছোট কবিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর স্বকীয়তা। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণামঙ্গলের গীতসমূহ সত্যই গতানুগতিক ধারা ত্যাগ করেছে। এঁর পূর্বের রচিত সব কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক এবং দেবদেবী বিষয়ক। শুধু অন্নপূর্ণামঙ্গলে গানের মধ্যেই তাঁর বাক্‌ভঙ্গীর নূতন চাতুর্য লক্ষিত হয়। শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্র বিবিধ ছন্দপারিপাট্যে, শব্দঘটা ও বাক্যবিন্যাসের চমকপ্রদ চটকে তাঁর কাব্যকে শব্দশিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজসভাকবি রায়গুণাকর কাব্যশিল্পের নানা কারুকার্যে অন্নদামঙ্গলের গানগুলিকে সুললিত, সুসজ্জিত এবং রসাল করে পূর্ববর্তী কবিদের থেকে নিজেকে যোগ্যতর কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইনি যেমন ছিলেন সুপণ্ডিত, তেমনি ছিলেন ভাষাবিশারদ। সংস্কৃত, হিন্দী, ফারশী, বাংলা প্রভৃতি সমস্ত ভাষাতেই ছিল তাঁর অধিকার। তাই এই সমস্ত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে বেছে বেছে ইচ্ছানুরূপ সুশব্দ চয়ন করে এবং শব্দচাতুর্যের চূড়ান্ত প্রয়োগপ্রভাবে, ভারতের মঙ্গলকাব্যকে ভারতচন্দ্র ভারাক্রান্ত করেননি। ভারতসাহিত্যক্ষেত্রে, বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যকে সমুজ্জ্বল মঙ্গলগ্রহের মতোই উজ্জ্বলতর সাহিত্যের দৃষ্টান্তরূপে তিনি রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে গীতিধর্মী এই কাব্যের তুলনা নেই। তাঁর রচিত একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা নিম্নে দেওয়া হ'ল :

পুরবর্ণন।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে ॥

নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে।
নয়ন-চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ-সুধাকর হাসিসুধা ওহে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে ॥[৫৫]

কবিবর বিজয়গুপ্ত প্রণীত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে কৌ, কেদার, ভাটিয়াল, সিন্ধু, গান্ধার এবং মালসী প্রভৃতি রাগ এবং পয়ার ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গৌরী, মল্লার, করুণ, মঙ্গল, ধানশী, পাহিড়া, শ্রী, পঠমঞ্জরী, মালশী, কামোদ, সুহই, ললিত, বসন্ত, বরাড়ী, সিন্ধুড়া, ত্রিকূট, বিভাস, মঙ্গলগুর্জরী, আলিয়া প্রভৃতি রাগ, ত্রিপদী, পয়ার, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ এবং মালঝাঁপ ও যৎ তালের সন্নিবেশ দেখা যায়।

গীত—উত্তরমশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব।
রাগিণী আলিয়া—তাল যৎ

মা এবার রক্ষা কর।
গণেশ-জননি, শিবসীমন্তিনি,
কোথা নারায়ণি, দুস্তরে নিস্তার ॥
বিক্রম-কেশরী বধে গো মশানে,
গতি নাই তারা তব চরণ বিনে,
দেহ পদছায়া দেখি অভাজনে,
বারে বারে মা এবারেতে তার।

৫৫ প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। পৃঃ ৩১৫

শালবান যখন কাটে গো আমায়,
সে বারে ত রক্ষা করিলে এ দায়,
কলুষ-নাশিনি রাখ গো আমায়,
তোমা বিনে আর কে আছে আমার ॥[৫৬]

মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গলে করুণা, মঙ্গল রাগ এবং ত্রিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত মেলে। বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে কামোদ, গৌরী, শ্রী, সুহই, বসন্ত, করুণা, বরাতি প্রভৃতি রাগ, পয়ার ও একাবলী ছন্দ এবং ঝাঁপতালের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া গোবিন্দদাসের সুবৃহৎ কালিকামঙ্গলে সর্বত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ এবং ছন্দের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

প্রথম যুগে মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মমূলক কাহিনী অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল। সেদিক থেকে তাদের কাব্যপ্রধান বলা যেতে পারে। কিন্তু রচয়িতাগণ মঙ্গলকাব্যকে সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য তাল ও রাগের সংমিশ্রণ অপরিহার্য বলে মনে করলেন। তখন রাগ, তাল ছাড়া বাংলার চণ্ডীমণ্ডপগুলিতে মঙ্গলগানের অনুশীলন হতে থাকল না এবং পরিশেষে দেখা গেল যে, কাব্যের সীমানা ছাড়িয়ে তারা গীতির পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। অর্থাৎ মঙ্গল-কাব্যের রচনায় কাব্য বা কথার সমাবেশ থাকলেও গীতিরূপই তাতে প্রায় প্রাধান্যলাভ করল। এজন্যই অনেকে মঙ্গলকাব্যকে গীতিধর্মী বলে থাকেন, কেননা গীতিরূপ ছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলির ঠিক রূপায়ণে সার্থকতা প্রকাশ পেল না।

অতএব এই মঙ্গলকাব্য যে সম্পূর্ণই শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সংগীতে পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিবিধ প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগরাগিণীর মাধ্যমে, সহজ সরল রসমাধুর্য ও পাণ্ডিত্য-

৫৬ কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। পৃঃ ২৯৮

পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী মঙ্গলকাব্যের লেখাগুলি সুরের একঘেয়েমিকে পরিবর্জন করে, বাঙালী সমাজের উচ্চতর শিক্ষিত নরনারী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যেই প্রবিষ্ট ও সমাদৃত হয়েছিল। তাই তো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই মঙ্গল-কাব্যগীতি শুনতে অগণিত স্ত্রীপুরুষ সমবেত হ'ত এবং সেই গান ধৈর্য-সহকারে শুনে প্রচুর তৃপ্তিলাভ করত। বাংলা সাহিত্য এই মঙ্গলকাব্য, ভারতীয় অভিজাত সংগীতের ধারাকেই আশ্রয় করে প্রগতির উচ্চ-সোপানে এসে পৌঁছেছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাবপ্রয়োগে পরিপূর্ণ এই মঙ্গলকাব্যগীতির অবদান বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

ব্রতকথা পাঁচালী

চর্যাপদগীতিকার রচনার ধারা ও ভাষার অস্পষ্ট রূপ এবং নাথ-গীতিকার রচনাবলীর ভাব ও ভাষার স্পষ্টতর রূপ থেকে খানিকটা অনুমান করা যায় যে, চর্যাপদের পরবর্তী যুগে কিংবা প্রায় সমসাময়িক সময়ে নাথগীতিকার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ব্রতকথার অন্তরেই আদি বাংলা সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল কিনা, সেটিও ভেবে দেখবার বিষয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে ও কথাসাহিত্যের অঙ্কুর উৎপাদনের জনক হিসাবে এর মর্যাদা পাওয়া সমীচীন কিনা, সেটিও ভেবে দেখতে হবে। সংগীতের আংশিক রূপ নিয়ে ব্রতকথা আদিম যুগ থেকে স্ত্রীজাতির সাংসারিক জীবনের সংশ্লিষ্ট হয়ে, তাদের মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে। সংগীতের ক্ষেত্রে তার মূল্য না থাকলেও, একটি সুরকে বহন করে নিয়ে চলেছে সে চিরদিন।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী পরিবারের প্রতি ঘরে ঘরে বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক, দৈনিক ব্রতাদি উদ্‌যাপনের ধারাবাহিক নিয়ম প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। এক একটি ব্রতকথার

ছড়ার আকারে গল্প রচনা হ'ত এবং এক একটি ঋতুতে, মাসে, দিনে সংসারের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীলোকগণ এক একটি দেবতাকে বেছে নিত। তার কোনো একটির নামকরণ হয়েছে "মাঘমণ্ডল"। এই ব্রত বালিকা অবস্থা থেকে যৌবনোদ্গমের পূর্ব পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। সূর্যকে এই ব্রতের দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। সাধারণতঃ সূর্যের মতো গোলাকার একটি কোট মৃত্তিকার উপর অঙ্কন করে মৃত্তিকায় গঠিত একটি মূর্তি পূজা করা হয় এবং পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই কোট অঙ্কনেরও পদ্ধতি আছে। এর সাতটি চক্র থাকে। ব্রতপ্রতিষ্ঠার দিনে সাতটি রং দিয়ে এই সাতটি চক্রকে সজ্জিত করা হয়। সূর্যের মুখ, চোখ, কান, হাত, পা সবই কল্পনারূপ অঙ্কিত হয় এবং ব্রতানুষ্ঠানকারিণী সাধারণ সময়ে সূর্য-মণ্ডলের স্থানে স্থানে মাদার, পলাশ, অতসী প্রভৃতি পুষ্প দিয়ে এই জাতীয় ছড়াগুলি বলে থাকে—

উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
তোমারে পূজিব আমি রক্তজবা দিয়া॥
উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না আমি হিমানীর লাগিয়া॥[৫৭]

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাওরে॥
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়েরে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাওরে॥[৫৮]

এই মাঘমণ্ডলব্রতের আরো বহুপ্রকার ছড়া আছে। এমনি প্রত্যেক ব্রতকথাই সুরের আশ্রয়ে বহুধারায় নারীকণ্ঠের মাধ্যমে

৫৭ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৭০৮
৫৮ ঐ ঐ ঐ

উচ্চারিত হয়ে এসেছে। পূর্বে উল্লিখিত ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে তারা সূর্যঠাকুরের শৈশব, যৌবনপ্রাপ্তি, বিবাহ ও পুত্রলাভ ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের নানারূপ সাধ অভিলাষ ব্যক্ত করে থাকে। পূর্ববঙ্গের কুমারী নারীগণ কর্তৃক মাঘ-মাসে অনুষ্ঠিত এই মাঘমণ্ডলব্রতের ভিতর দিয়ে প্রাচীন বাংলার সূর্যোপাসনার একটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই মাঘ-মণ্ডলব্রত উপলক্ষে যে সূর্যের পাঁচালী গীত হয়ে থাকে, তা শিথিলগ্রন্থি কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতারই সমষ্টি এবং গীতিকবিতার আকারেই মুখে মুখে প্রচলিত। সেজন্য এই পাঁচালী কোনো পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ লাভ করতে পারেনি। কবি রামজীবন ১৬৩১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যমঙ্গল রচনা করেন।

সরস্বতী-মাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে দয়ারামের "সারদামঙ্গল" বা "সারদাচরিত"-এর নাম করা যেতে পারে। দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করাই এর উদ্দেশ্য ছিল বলে সাধারণ অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই মঙ্গলকাব্যের কোনো সমাদর ছিল না। তৎকালীন সমাজে ধনশালী ব্যক্তিদের সন্তানের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে এবং সরস্বতী পুজোর সময় "সারদামঙ্গল" গীত হ'ত। দয়ারামের "সারদামঙ্গলের" কাহিনী রূপকথা-ধরনের। তাঁর রচিত কাব্য আকারে ছোট এবং পাঁচালীর লক্ষণাক্রান্ত। তাঁর রচনায় বিশেষ কোনো কাব্যগুণ নেই এবং এই "সারদামঙ্গল" সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল।

গঙ্গাতীর-বাসী দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রামদাস প্রভৃতির দ্বারা অনেক-গুলি ছোটবড় আকারের "গঙ্গামঙ্গল পাঁচালী" অষ্টাদশ শতকে লেখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে দুর্গাপ্রসাদ মুখুটির "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচিত হয়েছিল। ইহা পুরাপুরি "অষ্টমঙ্গলা" পাঁচালী কাব্য, গানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে বহুবিধ

রাগ ও তালের নির্দেশ রয়েছে এবং গায়নেরা চণ্ডী ও রামায়ণের মতো মন্দিরা সহযোগে এই কাব্যটি গান করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করত, তবে কিনা "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"কে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মূলতান, ইমন, হামির, বাগেশ্বরী, কানেড়া, ভীমপলাসী, ভূপাল, মালকোষ, পরজ, বেহাগ, সরফরদা, সোহিনী, শ্রীরাগ, রামকেলী, বসন্ত, সিন্ধু, পূরবী, গৌরী, ভৈরবী, ভৈরব, বিভাস, ললিত, সারঙ্গ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগ এবং তেওট, আড়া, কাওয়ালী, যৎ, ধামাল, মধ্যমান, ঝাঁপ, একতালা ও খয়রা প্রভৃতি তালের উল্লেখ দেখা যায়।

কৃষ্ণকিঙ্কর এবং মনোহরের "পঞ্চানন-মঙ্গল" বা পঞ্চাননের ব্রত-কথা (বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব বা ক্ষেত্রপালদেবতা), অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা রুদ্ররাম চক্রবর্তীর "ষষ্ঠীমঙ্গল", বল্লভ, নিত্যানন্দ প্রভৃতির "শীতলামঙ্গল", ১৬০৮ শক বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণ-রামের "রায়মঙ্গল" (ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ে "দ্বিজরামপ্রসাদ", "মাধবীলতা" প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত সুবচনীর পাঁচালী পাওয়া গেছে। সেখানে সাধারণতঃ বিবাহ উৎসবানুষ্ঠানে ঐ সকল ব্রতকথা পাঠ হয়।

ব্রতকথা পাঁচালীগুলি গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। সেখানেও মানুষের সঙ্গে দেবতাদের বৈরীভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই পাঁচালীগুলি জনসমাজে স্ত্রী ও পুরুষজাতির মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সকল সমাজেই যে কয়টি দেবদেবীকে নেওয়া হয়েছে গার্হস্থ্যজীবনে সুখ-দুঃখের সমভাগী করে এবং যাঁদের করুণা ভিক্ষা করা হয়েছে কায়মনোবাক্যে গৃহকল্যাণের হেতু, সেই দেবতাদের নিয়েই আখ্যায়িকা রচিত হয়েছে নানা কবির দ্বারা। তার মধ্যে সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৈকুণ্ঠনাথ মাঝির "লক্ষ্মীমঙ্গল" এবং আরো অনেক কবির লেখা

"লক্ষ্মীচরিত্র" অর্থাৎ লক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঁচালী পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির মধ্যে অন্দরমহলে প্রবেশ করছেন লক্ষ্মী দরিদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করতে। এক হাতে তাঁর ধান্যগুচ্ছ, অপর হাতে অর্থসম্পদের স্বর্ণ-কোটরা। স্বাস্থ্যসম্পদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের অনুকূলে গৃহকর্ত্রীকে অনুপ্রেরিত করতে, শ্রীহীন সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে, চিরোজ্জ্বল করে তুলতে সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর, অর্থসম্পদের সঙ্গে স্বর্ণঝাঁপিতে সংগৃহীত তাঁর সীমন্তসম্ভার সিঁদুর। গৃহলক্ষ্মীকে হরিপ্রিয়ারই অনুরূপ সাজে সজ্জিত করার ইঙ্গিতে, পদবিলাসের যাবকপত্র নিয়েছেন সঙ্গে করে। তাই তো স্ত্রীজাতি স্বামীর জয়শ্রী সুখসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৃহকল্যাণীরূপা কমলাকে স্থাপিত করেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্তে গৃহকোণে এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে কামনা-বাসনার বেদীপাদমূলে। সেখানে একান্তে ঐকান্তিকতায় কামনা-বাসনা, আবেদন-নিবেদন জানায় তাঁর পায়ে। একান্ত আপনার জনের মতোই তাঁর কাছে চলে আকাঙ্ক্ষাপূরণে আবদার অভিযোগ। তাই তো স্ত্রীজাতির এত প্রিয় এই প্রিয়ম্বদা। সকরুণ আবেদনের সুরে তাই তো সকল শ্রেণীর সকল স্ত্রীজাতিই গৃহশ্রী বৃদ্ধি করতে ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রীতির নিমিত্ত এই ব্রতকথা পাঠ করে থাকে।

অপর দিকে পুরুষজাতি নিয়েছে শনি ও সত্যনারায়ণ ঠাকুরকে, পাড়াপড়শী পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগের অবসরে, গ্রহবৈগুণ্য অপসারণ ও বাণিজ্যাদিতে লাভের জন্য। তাই পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই স্থান পেয়েছেন এই দুজন। এই শনি সত্যনারায়ণের বিষয়ে অনেক কবিই নানা ছন্দে উপাখ্যান রচনা করেছেন পাঁচালী আকারে। এর মধ্যে পুস্তকাকারে সংকলিতও হয়েছে অনেক। অধিকাংশ শনির পাঁচালী উনবিংশ শতাব্দীতে সিলেট-চাটিগাঁ অঞ্চলে লেখা। কবির নাম যথাক্রমে দ্বিজবিনোদ,

যদুনাথ, কালিদাস প্রভৃতি। সত্যনারায়ণ পাঁচালীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন কবির নাম পাওয়া যায়। আবার আজ পর্যন্ত ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়নি, এমনি শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী, হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথিও অনেক পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার পশ্চিমপাড়া গ্রামনিবাসী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী। পাঁচালীর মধ্যে প্রায়শঃই দুটি ছন্দ পাওয়া যায়। একটি পয়ার, অপরটি ত্রিপদী। কিন্তু কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচালী রচনাবলীর মধ্যে আরো একটি ছন্দের উল্লেখ দেখা যায় এবং তার নামকরণ তিনি করেছেন চন্দ্রাবলী। তা ছাড়া এই পাঁচালীগুলির এক-এক ছন্দের এক-একটি অংশ বিশেষ রাগে ও তালে দু'তিনজন মিলিত কণ্ঠে গেয়ে থাকে। এই পাঁচালী শুনতে বহুলোকের সমাগম হয়। প্রায়শঃই গায়কগণ বিভাস, ভূপালী অথবা দেশকার রাগে চন্দ্রাবলী ছন্দযুক্ত পাঁচালীর অংশগুলি গেয়ে থাকেন। লক্ষ্মীর পাঁচালী কিংবা অন্যান্য পাঁচালী একটি সুর অবলম্বনে গাওয়া হয় বটে, কিন্তু সেগুলিতে কোনো রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী যে সম্পূর্ণরূপে গীতিধর্মী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যে ভোরের দুটি রাগের (বিভাস ও দেশকার) যে প্রয়োগ দেখতে পাই এর কারণ, পূর্বে বোধ হয় এই পাঁচালী ও ব্রতের অনুষ্ঠান সকালবেলার দিকে হ'ত। পরে এক পরিবারের সঙ্গে অপর পরিবারের মেলা-মেশার সুযোগের জন্য, সন্ধ্যার পরে অবসর সময়ে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে ব্রত ও পাঁচালীর সময়। আবার কোনো কোনো পাঁচালীপাঠকের মধ্যে দেখা যায় যে, সকালবেলার আরো একটি রাগ আলাহিয়া বিলাবলে চন্দ্রাবলী অথবা ত্রিপদী ছন্দের পাঁচালীর

অংশটি তাঁরা সুর করে পাঠ করছেন। অতএব এই ব্রতাদি যে দিবার প্রথমভাগেই অনুষ্ঠিত হ'ত, এটি অনুমান করা বোধ হয় অসংগত হবে না। কারণ তিনটি রাগই দিনের প্রথম প্রহরের দেখা যায়। সকল পাঁচালীই আংশিকভাবে সংগীতের অনুসরণ করেছে, কিন্তু শনি ও সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পাঁচালী পরিপূর্ণভাবে সংগীতের স্পর্শ পেয়েছে।

পূর্ববঙ্গগীতিকা

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নরনারী কবিদের দান সামান্য নয়। এর মধ্যে অনেক কবি ছিলেন যাঁরা নিরক্ষর, তাই বলে যে তাঁদের রচিত সাহিত্য অবজ্ঞার বস্তু, একথা বলা চলে না। এর মধ্যেও গানের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখা যায়।

অন্যান্য সাহিত্য যেমন সংগীতের আশ্রয় নিয়েই প্রসারলাভ করেছে এবং অনেক সাহিত্যই যেমন পূর্ণাঙ্গ সংগীতকে নিয়ে জনসমাজে সমাদৃত হয়েছে সমধিক, এই "মৈমনসিংহ-গীতিকা" এবং "পূর্ববঙ্গ-গীতিকা" সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সংগীতকে আশ্রয় না করলেও, গীতিধর্মী হয়েছে বলেই তার সমাদর তৎকালীন সমাজে হয়েছিল অন্যান্য সাহিত্যের মতোই সমভাবে। এই গীতিকাগুলি প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব প্রাদেশিক কথ্যভাষায় রচিত হয়েছিল বলে, স্বীয় অঞ্চল ব্যতীত এরা বাইরে প্রসার লাভ করতে পারেনি। সুতরাং গীতিকার ভাষা জীবন্ত হলেও এর ব্যাপ্তির ক্ষেত্র যে ছিল সীমাবদ্ধ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই গীতিসাহিত্য পল্লীগ্রামের সাধারণ নরনারীর নিছক পার্থিব প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনীর মতো আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন না হলেও উচ্চস্তরের প্রেমাভাস এর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রেমৈকান্তিকতায় সে হার মানেনি কোনো সাহিত্যের

কাছে। এই গীতিসাহিত্যের প্রধান সুরই হয়েছে বিরহ। ব্যর্থ বা অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকাগুলির মূল আশ্রয় বা অবলম্বন। কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে চরম দুঃখের শেষ সোপানে। গীতিকাগুলিতে নায়ক চরিত্রের প্রাধান্য কম, বরং নায়িকা চরিত্রই এখানে শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের অধিকারিণী হয়েছে। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মবোধ সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেজন্য পরপুরুষের সংস্রবে এসেও একমাত্র অতুলনীয় প্রেমের শক্তিতে তাঁরা অনায়াসেই তাঁদের সতীধর্ম রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

"আমাদের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘন-বিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্বত্যনদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-সংকুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্মসম্মান-বোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্যরক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্যসভ্যতা ও ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা এই আরণ্য বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র সুদুর্লভ। ইহার নায়িকারা শাস্ত্রের অনুশাসন-বাহুল্যের দ্বারা বিড়ম্বিত না হইয়া সতীত্বের আসল মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, দেশাচার লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়বাণীর অনুবর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের অন্তরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শাস্ত্রানুশীলনের শান্তিবারি-সেচনে একেবারে স্তিমিত-নির্বাপিত হইয়া যায় নাই। ইঁহাদের চরিত্রদৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা ইঁহাদিগকে অসাধারণ গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছে। উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্ব-সূচনার দিক্ দিয়া মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বথা স্বীকার্য।"[৫৯]

---

৫৯ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ১২-১৩

তা ছাড়া কয়েকটি কাহিনীর ধারা কিছুটা নূতনত্বের সন্ধানও দেয়। সাধারণতঃ এই দেশের গীতিকা-সাহিত্যে যেটি মেলে না, অর্থাৎ নিছক কাল্পনিক না হয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সংশ্লিষ্ট বাস্তব ঘটনাবলী নিয়ে লেখা গান এদের মধ্যে আছে। ঠিক এই জাতীয় গীতিসাহিত্য বোধ হয় এর পূর্বে খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো গীতিকায় যে-সব ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তা দেখে অনুমান করা যায় যে, এগুলি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছিল।

মৈমনসিংহ জেলার আইথর গ্রামনিবাসী (পোঃ কেন্দুয়া) ৺চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ই প্রথম এই গীতিকবিতা সংগ্রহ করে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পান ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহায়তায়। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনেকগুলি "মৈমনসিংহ-গীতিকা" ও "পূর্ববঙ্গগীতিকা" নামে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পালাগানগুলির মধ্যে রাণী কমলা, কঙ্ক ও লীলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খাঁ প্রভৃতি ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক সত্যতা আছে। কিছু কিছু ঘটনা শুধু পারিবারিক এবং কাল্পনিক বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যতা সম্বন্ধেও অস্বীকৃতি চলে না। মলুয়া, মহুয়া, কঙ্ক ও লীলা, আঁধাবধু, রাণী কমলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খাঁ, শ্যামরায়, নুরন্নেহা, মাণিকতারা প্রভৃতির গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অমার্জিত পল্লীভাষায় পালাগুলি রচিত হলেও ভাবসম্পদে, কাব্যসম্ভারে ও সরলতায় প্রত্যেকটি পদই যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আড়ম্বরশূন্য বর্ণনায়ও যে অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, এই গীতিসাহিত্য তার একটি সুন্দর নিদর্শন।

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়্‌ল ঢাকা॥[৬০]

---

৬০ মৈমনসিংহ-গীতিকা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ২১ (মহুয়া)

শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন্ পুরুষেরে॥
এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল॥[৬১]

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান॥
আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী॥[৬২]

তবে চর্যা থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবপদাবলী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সংগীতের যে বিশিষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায় এবং রাগ ও তালের সন্ধান মেলে, এই গীতিকা-সাহিত্যে তেমনি রাগ ও তালের কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয়, এই কবিতাগুলি যে-কোনো একটি সুরের আশ্রয় নিয়ে ছড়া বা পাঁচালীর মতোই পল্লীতে পল্লীতে গাওয়া হ'ত। এই রচনারীতিতে ছন্দের কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই পরিচিত ছন্দ এর মধ্যে সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। এই গীতিকায় শেষ পর্যন্ত স্বরাঘাত দ্বারা মাত্রা রক্ষিত হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দ ও তালের উল্লেখ না থাকলেও, চতুর্মাত্রিক ছন্দের যোগসমষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখলে, প্রতি চরণের পাদপূরণের সমষ্টিমাত্রা চতুর্মাত্রিক ছন্দের ষোলমাত্রিক ত্রিতালের মধ্যেই পড়ে। অক্ষরাবৃত্তিতে হয়তো বা মাত্রায় কমবেশী হতে পারে, সেটি পূরণ হয়ে থাকে হ্রস্ব, দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা। এই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত উচ্চারণের দ্বারা যতিরক্ষিত হয়ে ছন্দপূরণ ও মাত্রাপূরণ হয়। যথা—

৬১ মৈমনসিংহ-গীতিকা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৪৯ (মলুয়া)
৬২ ঐ ঐ পৃঃ ১১২ (চন্দ্রাবতী)

০	১	+	৩
দে খি তে সু	ন্দ র না গর	চা ন্দে র স	মা । । ন
ঢেউ য়ে র উ	প র ভা সে	পু ষ্প মা সীর	চা । । ন
আঁ খি তে প	ল ক না হি	মু খে নাই সে	বা ণী । ।
পা রে তে খা	ড়াই য়া দে খে	উ মে দা কা	মি নী । ।

একে বর্তমানের ত্রিতাল, কাহারবা অথবা উত্তরভারতীয় চার মাত্রার আদিতালও বলা যায়। কেননা, এর একটি অংশে চার মাত্রা, দুটি অংশে আট মাত্রা, চারটি অংশে ষোল মাত্রা রয়েছে। আদিতাল, কাহারবা তাল এবং ত্রিতাল যথাক্রমে চার, আট এবং ষোল মাত্রার সমন্বয়। এর প্রত্যেক অংশেই এক-একটি ছেদ রয়েছে। অতএব একটি অংশে আদিতাল, দুটি অংশে কাহারবা এবং চারটি অংশে ত্রিতাল, এর কোনোটিই অসংগত নয়। এই তিনটি তালেরই তালসংগতি এতে মেলে।

॥ আধুনিক যুগ ॥

দাশরথি রায়ের পাঁচালী

নব্য বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বের শেষ শক্তিশালী কবি দাশরথি রায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায়, বর্ধমান জেলার পীলাগ্রামে মাতুলালয়েই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করে অতি সামান্য বেতনে নীলকুঠিতে তিনি কর্মগ্রহণ করেন। দাশুবাবু উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও, একটি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোকের কবির দলে গানরচয়িতা হিসাবে ভর্তি হলেন। এই স্ত্রীলোকটির নাম ছিল "অক্ষয়পাটুনি" (অক্ষয় বাইতিনী অথবা "আকা বাই")। জনশ্রুতি আছে, দাশু রায় এই রমণীর কাছেই গান শিক্ষা করেছিলেন। পরে আত্মীয়স্বজন ও তাঁর মাতার বিশেষ অনুরোধে তিনি ঐ রমণীর কবির দল পরিত্যাগ করে পাঁচালী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তৎকালীন পাঁচালী-রচয়িতা হিসাবে এঁর মতো সুখ্যাতি কেউ অর্জন করেননি। ইনি নানা বিষয়ে পাঁচালী রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাঁচালীই প্রধান। তাঁর রচিত এই নূতন ঢংয়ের পাঁচালী-গীতি একসময়ে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল ও প্রভূত সম্মান পেয়েছিল বাঙালী সমাজে। তবে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাঁচালীতে যেমন এঁর সুরুচির পরিচয় মেলে, অন্যান্য বিষয়ক পাঁচালীতে তেমনি কুরুচিরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। এঁর পাঁচালীর মধ্যে অনুপ্রাস, যমকপদ ও তুলনার ঘটা ছিল। সমস্ত শ্রোতৃবর্গ হয়তো তাঁর এই শব্দঘটার যমক-অনুপ্রাসের অর্থবোধ করতে পারত না, তা হলেও শব্দসঞ্চয়নে ও সাজানোর পারিপাট্যে তিনি শ্রোতৃবর্গকে উৎফুল্ল করেই তুলতেন।

শ্রোতৃবর্গ যেন এই সমস্ত রচনা শোনবার জন্য উৎসাহিত হয়ে কবিকে উৎসাহিত করত ততোধিক। এঁর লেখার মধ্যে ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তির কটাক্ষ স্থানে স্থানে অশ্লীল হয়ে উঠলেও, সেগুলি সরলতায়, স্বচ্ছতায় ও রচনা-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশ করত তাঁর রচনাসমূহ। তা ছাড়া এই অশ্লীলতা তৎকালীন সমাজের রুচির পরিপোষকই ছিল। এঁকে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের কবিই বলা চলে। কোনো ধর্মের উপরেই তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না। তাই দেবী-বিষয়ক, কৃষ্ণ-বিষয়ক—এই উভয় বিষয়েই তিনি বহু গান রচনা করে গেছেন। তিনি যে শুধু পৌরাণিক বিষয় নিয়েই লিখেছেন তা নয়, তৎকালীন সমাজের সামাজিক খুঁটিনাটি এবং সামাজিক ঘটনাবলী নিয়েও তাঁর রচনার অভাব নেই। কিন্তু পৌরাণিক বিষয়ে কমপক্ষে তাঁর পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোনো সমাজ, কোনো ধর্মের উপর যেমন তাঁর বীতরাগ ছিল না, আবার তেমনি কোনো সামাজিক দুর্নীতি ও ধর্মের ভান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যেমন সমাজ ও ধর্মকে ভালবাসতেন, আবার তাদের বুকে আঘাত হানতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। দুর্নীতির উচ্ছেদকল্পে তাঁর সরস লেখনী সবসময়ই ছিল সচেতন, তাই সমাজের উপকার সাধন করতে, সুধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে, অধর্মের স্বরূপ ও সামাজিক কুনীতির রূপ প্রকাশ করতে তাঁর লেখনী হয়ে উঠত উত্তেজিত। যেমন, তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

ললিত-বিভাস-ঝাঁপতাল

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয়! আমার ভক্তি
হবে রাধা-সতী॥

মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
(আমার) ধর ধর জনার্দ্দন
পাপ-গিরি-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি,
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্ট—এই মিনতি ॥
(আমার) প্রেমরূপ-যমুনাকূলে,
আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি ;—
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার,
দাস হবে এই দাশরথি ॥[১]

এর থেকে বোঝা যায়, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের ব্যভিচারও যে তিনি সহ্য করতে পারেননি এবং বৈষ্ণব সমাজের দুর্নীতির প্রতি কষাঘাত করতেও যে তিনি কুণ্ঠিত হননি, তাও তাঁর এই লেখাটি থেকে প্রমাণিত হয়।

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া,
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ত্রে উপাসনা,
নিতাই বলে নৃত্য করে, ধুলায় গড়াগড়ি ॥

১ দাশরথি রায়ের পাঁচালী। কলঙ্কভঞ্জন। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১১৬

গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে,
বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখতে নারেন চক্ষের শূল
কালীনাম শুন্‌লে কাণে হস্ত ॥

… … …

কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা দেবদাসী,
ভজন কুঠরি আইরি কাঠের বেড়া।
গোসাঞিকে পাঁচসিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে,
জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া ॥
ভজহরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস,
শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু।
এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কি সিদ্ধান্ত,
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥[২]

তিনি এই শ্লেষোক্তি দ্বারা সমাজের চেতনাই জাগাতে চেয়েছেন। এই আঘাত করে তিনি সত্যিকার সমাজসেবী সাহিত্যিকেরই পরিচয় দিয়েছেন। কেননা সাহিত্যিকের কর্তব্যই হ'ল সাহিত্যরচনার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি, জনসাধারণের জ্ঞান ও সুধর্মের নির্দেশ দান করা। এই গুরুদায়িত্ব সুসাহিত্যিক মাত্রেরই। তিনি যেমন প্রকাশ করবেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের খারাপ দিকটা, তেমনি নির্দেশ দেবেন সুসমাজসৃষ্টি ও সুধর্মপ্রতিষ্ঠার পথের। দাশরথি রায়ের লেখার মধ্যে সেটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলন করলেন, তখন তৎসম্বন্ধে "বিধবার বিবাহ" পালা নাম দিয়ে কবি দাশরথির রচনা প্রকাশিত হ'ল।

২ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত। পৃঃ ৬৩২-৬৩৩

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাঁর যে সশ্রদ্ধ উক্তি তা সত্যিই উপভোগ্য—

বিধবার বিবাহ-কথা, কলির প্রধান কলিকাতা,—
নগরে উঠিছে এই রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখ্‌ছি বলবান্‌,
হবার কথা হয়ে উঠ্‌ছে সব ॥১
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর তাতে আবার কোম্পানীর,
হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক ॥২
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নি সেটা।
তারা ক'র্‌লে অর্ডার জেতে করে অর্ডার,
চটুকে বুদ্ধি, আটকে রাখিবে কেটা ?৩
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম-বৃদ্ধি প্রজাবৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হ'লে পরে।
বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,
এতে রাজার রাজ্য হ'তে পারে ? ॥৪
হিন্দুধর্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না ব'লে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিক্‌বে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত ॥৫ [৩]

এর থেকে বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না।

৩ দাশরথি রায়ের পাঁচালী। বিধবাবিবাহ। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৬২৫।

তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, সত্যস্রষ্টা ও সত্যপ্রকাশক কবি। এঁর রচনা শব্দচ্ছটা ও অলংকারে পরিপূর্ণ হলেও অতিশয় সরল এবং ছন্দের সূক্ষ্মানুভূতিসূচক। দাশরথি রায়ের পরবর্তীকালে পাঁচালী রচনা ও গান করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ঠাকুরদাস দত্ত, রসিকচন্দ্র রায় এবং দাশরথি রায়ের সত্যিকারের ভাবশিষ্য ভক্তকবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তবে এঁর লেখা কৃষ্ণ-যাত্রাই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। দাশরথি রায়ের লেখার ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি মেলে নীলকণ্ঠের লেখা সংগীতে। তাই এক কথায় বলতে গেলে, তৎকালীন পাঁচালীস্রষ্টাদের মধ্যে কবি দাশরথিই আদি স্রষ্টা। তাঁর রচিত পাঁচালীর শব্দসঞ্চয়ন দেখলে বলতে ইচ্ছা হয়, বাংলা শব্দভাণ্ডারের তিনি কুবের। তিনি একাধারে সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন, তাই তিনি তাঁর পাঁচালী-সংগীতে সুসন্নিবেশিত করতে সমর্থ হয়েছেন অভিজাত সংগীতের রাগ ও তালাদির। এঁর পাঁচালী-সংগীতের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত বহুবিধ রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ দেখা যায়। তাই দাশুবাবুর পাঁচালী সাহিত্য-সম্পদ ও সংগীত-সম্পদ—এই উভয় সম্পদেই সমৃদ্ধিশালী। কবির সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই পাঁচালী-সংগীতের ধারা। বাঙালী সমাজে কবির এই দান সামান্য নয় এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাঙালীর অমিত সাহিত্য ও সংগীত -ভাণ্ডারের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

সুরট, জয়জয়ন্তী, বেহাগ, খাম্বাজ, ঝুমঝিঝিট, আড়ানা, মিঞামল্লার, কানেড়া, খট্‌ভৈরবী, ঝিঝিট, অহংসিন্ধু, ললিতবিভাস, ললিতরামকেলী, সিন্ধুভৈরবী, বাহার, আলেয়াবিভাস, সিন্ধুখাম্বাজ, ললিতভৈরোঁ, ললিত, মল্লার, পরজ, সুরটমল্লার, বিভাস, আলেয়া, অহংঝিঝিট, ললিত ঝিঝিট, গাড়াভৈরবী, সাহানা, পরজ কালেংড়া, সুরটখাম্বাজ, আড়ানা-বাহার, টোরী, সরফরদা, বসন্ত, রামকেলী, অহং, অহংমঙ্গল,

সিন্ধু, ছায়ানট, ললিতবসন্ত, ভূপালী, ললিতভৈরবী, বারোঁয়া পিলু, অহংললিত, মুলতান, বিভাস-আলিয়া, সোহিনী বাহার, বারোঁয়া, জয়জয়ন্তীমিশ্র, বাহারদিজংলা, মঙ্গল, বিভাসমিশ্র, খট, বাহার-বাগেশ্বরী, সুরটআড়ানা মিশ্র, আড়ানা বাগেশ্রী, মুলতানবাহার, ভৈরবী, ইমন, ভৈরোঁ, সুরটখাম্বাজ, কালাংড়াবাহার, বসন্তবাহার, দেশসিন্ধু, পরজবাহার, কানাড়াবাগেশ্রী, সুরটজয়জয়ন্তী, ভৈরোঁ রামকেলী, ইমনকল্যাণ, কানাড়াবাহার, সারঙ্গ, জয়জয়ন্তীপিলুমিশ্র, কালাংড়া, পূরবী, লুম, জয়জয়ন্তীমল্লার, সাহানাবাহার, শ্রীরাগ, কানাড়া-বসন্ত, কামোদ, বেহাগজংলা, মুলতানকানাড়া, সোহিনী, খাম্বাজ জয়জয়ন্তীমিশ্র, আলেয়ামিশ্র, পিলু, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ এবং ঝাঁপতাল, একতাল, যৎ, কাওয়ালী, তেতালা, আড়খেম্‌টা, খেম্‌টা, মধ্যমান, পোস্ত, ঠুংরী, তিওট, ধামার, খয়রা, পঞ্চম সওয়ারী, চৌতাল, রূপক, আড়কাওয়ালী প্রভৃতি তাল পাওয়া যায় দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে। সুরের মধ্যে সিন্ধুভৈরবী রাগ এবং তালের মধ্যে যৎ তাল দাশরথির খুব প্রিয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগীত

অন্য দেশীয় মনীষীদের চিন্তাধারা থেকে ভারতবর্ষীয় মুনিঋষিদের চিন্তাধারা কিছুটা স্বতন্ত্র। বহিঃপ্রকাশের বৈচিত্র্য তাঁদের দৃষ্টির পথ রোধ করেনি। ক্ষণসুখকর সুরের বিচিত্র লীলায় শ্রুতিপথ হয়নি বন্ধ। তাই বহির্জগতের অবাস্তব বস্তুসত্তা,—বহিরিন্দ্রিয়ের বহির্ভূত নিরাকার নির্বিকার নিত্যপ্রাণসত্তার অনুসন্ধিৎসায় জ্ঞান-বুদ্ধি-মন নিয়োজিত হয়েছিল অব্যাহত নিয়মে। তাই ভারতীয় সাহিত্যসাধনা, ভারতীয় শিল্পসাধনা, ভারতীয় সংগীতসাধনা, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা, সবই এনেছে বহন করে অভাবনীয় এক নূতন লোকের সন্ধান। বাহ্য থেকে অন্তর, কল্পনা থেকে অকল্পনীয়, ইন্দ্রিয় থেকে

অতীন্দ্রিয়, লৌকিক থেকে অলৌকিক, মৃত্যু হতে জীবন, এমনি করে স্থূল হতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর স্তরে গিয়ে চিত্তবৃত্তি সমাহিত হয়েছে সত্যানুসন্ধানে। এই সাধনার ধারা প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্তও প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ভারতবর্ষের প্রতিটি মনীষীর অন্তরে অন্তঃসলিলা স্বচ্ছ ফল্গুধারার মতোই। সেই সাধনা, সেই অনুভূতি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুভূত হয় এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক ঋষিকল্প কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও সংগীতে।

বৈদিক যুগের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু এ-যুগে সাহিত্য ও সংগীতকে এমনি করে উপলব্ধি আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। কবিগুরুর চিন্তাধারা, অনুভূতি, দৃষ্টিশক্তি, কাব্যসৃষ্টি, সাহিত্য-সৃষ্টি ও সংগীতসৃষ্টি বিশ্বের কোনো-একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে গিয়ে সমাপ্ত হয়নি। ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে, বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বসৃষ্টি-সম্ভারের যা-কিছু বস্তুনিচয়, কোনোটিই তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধপাত্র থেকে দুগ্ধটুকুই মাত্র গ্রহণ করে, পাত্রস্থিত জল পাত্রেই পড়ে থাকে, কবিগুরু তেমনি বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে তাঁর পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত, যত কাব্য, যত সাহিত্য, যত সংগীত সব থেকেই গ্রহণ করেছেন শ্রেষ্ঠ সম্ভারটুকু। কাউকেই তিনি অবহেলা করেননি, তাঁর দৃষ্টি কোনোদিন ব্যাহত হয়নি কোনো-কিছুর বাধাবিঘ্নে। ডুবুরী যেমন জলধির অতলতলে ডুব দিয়ে কুড়িয়ে আনে বহুমূল্য রত্নাদি, কোনো বিপদ কোনো বাধাই তাকে পারে না নিরাশ করতে, বিপদসংকুল পথেই এগিয়ে চলে তার আহরণ-কুশল মন, তেমনি বিশ্বসাহিত্য-জলধির গভীর অন্তরে ডুব দিয়ে কবিগুরু কুড়িয়ে নিয়েছেন সংগীত ও সাহিত্যের প্রাণসত্তা বস্তু। ছোটই হোক, বড়ই হোক, কারোর কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে, জেনে নিতে কোনোদিন তাঁর মনে কোনো সংকীর্ণতা আসেনি।

কবিগুরু ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু

মধুর, সবই তিনি ছিনিয়ে নিয়েছেন প্রকৃতির কোল থেকে গ্রহীতা-রূপে, দস্যুরূপে নয়। তাঁর কাঙাল নয়ন ফিরেছে সৌন্দর্যের যাচনা করে প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে। তিনি পর্যটন করে বেড়িয়েছেন দেশবিদেশ, গিরি-মরু-বন-বনান্তর এবং উপলব্ধি করতে পেরেছেন বিশ্বস্রষ্টার মর্মগাথা। তাই তো তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন মরমিয়া সংগীতের সুর, শুনতে পেয়েছেন বজ্রনির্ঘোষে অজানা বাঁশরিয়ার বংশীবিলাপ, ঝরাপাতার মর্মরে অনুভব করেছেন পত্রচ্যুত বৃক্ষের মর্মবেদনার আকূতি, আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছল ঝরঝর কলকল ঝরনার কলতানে শুনেছেন নিত্যপ্রবহমান প্রাণশক্তির গতির আহ্বান।

তাই তাঁর সাহিত্যসংগীতধারার গতিবেগ শ্লথ হয়নি, এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, চিরনবীনতার নবানুরাগে নব নব পথে, নব নব সৃষ্টির দিকে। এই প্রেরণা তাঁর যুগিয়েছে বেদ ও উপনিষদের চিরপুরাতনী বাণী। সন্ধান পেয়েছেন তিনি সাহিত্য ও সংগীতের প্রাণস্পন্দনের মূল উৎসের। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্ব-সাহিত্যপ্রতিভার কেন্দ্রীভূত সমষ্টিগত প্রতিভার প্রতীক। তাই গতানুগতিক ধারা থেকে তাঁর সাহিত্য এবং সংগীতের ধারা স্বতন্ত্ররূপে রূপায়িত হয়েছে ও মর্যাদা পেয়েছে বিশ্বসভায় বিশিষ্টরূপে। মধ্যযুগের সংগীত যে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে, কবিগুরুর সাহিত্যসংস্রবে এসে সেই সংগীতের হয়েছে বিশেষ করে স্ফুরণ, সুগম হয়েছে তার অগ্রগতি, সুযোগ পেয়েছে সে পরিপূর্ণ প্রকাশের, কথার আনুকূল্যে সে বিকশিত হয়ে উঠেছে প্রস্ফুটিত গোলাপের মতোই। এতদিন সে খুঁজে বেড়িয়েছিল মনের মতো স্বামী যার সান্নিধ্যে, যার সংস্পর্শে সে হয়ে উঠবে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এতদিন যে গুমরে গুমরে কেঁদে মরেছে কুঁড়ির বুকের গন্ধের মতো, আপনাকে সে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি তারই জন্য। অন্ধ স্বামীকে যেমন বয়ে নিয়ে বেড়ায় উপায়হীন স্ত্রী, এক

প্রহরের পথ অতিক্রম করতে যেমন কেটে যায় দিন, চলার পথ হয়ে ওঠে তার কাছে ভার, জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ, তেমনি বহুকাল সুররানী বহন করে চলেছিল অন্ধ, খঞ্জ, বধির, চলৎশক্তিরহিত, অপরিমার্জিত, অপরিপুষ্ট, সৌন্দর্যবিহীন, সরসতাহীন, ভাববিত্ত ও শব্দসম্পদ -রহিত, প্রাচীন, স্থবির হিন্দী কাব্যকে। মনের মতো করে সাজাবার অবসর তার আসেনি, সুযোগ পায়নি সে সাহিত্যালংকারে ভূষিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের মর্মসভায় প্রবেশ করবার, কবির দরবারে পায়নি সে সমাদর, প্রবাহিত হতে পারেনি তার প্রাণস্পন্দনধারা অপ্রতিহতভাবে, সাহায্য পায়নি সে কাব্যসাহিত্যের, তাই স্বাবলম্বী হয়ে যতটুকু তার এগোবার সম্ভাবনা, তাই সে এগিয়েছিল। আজ সে পেয়েছে পথ, দেখতে পেয়েছে সে আলো, মুক্তি পেয়েছে সে নিজেকে প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টা থেকে। রবীন্দ্রসাহিত্য আজ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে সুদূর-বিস্তৃত সম্ভাব্য সূচনার ক্ষেত্রে। আজ আর তার দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, সংকোচ নেই কোনো স্থানেই প্রবেশের। আজ তার মিলন হয়েছে যোগ্যের সঙ্গে, নেই তার আর ঠুন্‌কো কাচের আভরণ, বাহ্যিক আড়ম্বরের গুরুভার পরিত্যাগ করে পরমপ্রিয় সাহিত্যকেই করে নিয়েছে অঙ্গাভরণ। আজ তাকে সত্যি মানিয়েছে সুসাহিত্যের পাশে। আর তার আভরণেরই বা প্রয়োজন কি? যে লাভ করেছে অমর সাহিত্যের সান্নিধ্য, ব্যাপ্তি যার বিশ্ব, প্রাণস্পন্দন যার বিশ্বাত্মায়, সৌন্দর্য যার পরমসুন্দরে, অনির্দিষ্টকালের জন্য যার স্থিতি, মহাকাল যার দ্বারে এসে থেমে যায়, কালের শাসন অমান্য করে উন্নতশিরে চলেছে যার জয়ের অভিযান, আজ সে তার আশ্রিতা, আজ সে তারই অর্ধাঙ্গিনী। আর তার কিসের ভয়, কিসের লজ্জা, কিসের সংকোচ?

সত্যসুরসন্ধানী কবিগুরুর সাহিত্যচয়ন সুরেরই মায়ালোকে। সুরে-সুরেই তাঁর সাহিত্যের উদ্‌ভব, সাহিত্যের বিস্তৃতি এবং

সাহিত্যের স্থিতি। সুরের মায়ালোকেই খুঁজে পেয়েছেন তিনি বিশ্ববেদনার করুণ বাণী। স্রষ্টা যেমন পিছনে পড়ে থাকে সৃষ্টির, তেমনি সুরে-সুরে গড়া ভাষাদেহের পিছনেই ঢাকা পড়ে গেছে সুরের সৃজনীরূপ। আজ এর অন্তরে রয়েছে সুর, বাইরে প্রকাশ কাব্যসাহিত্যের। এমনি সমৃদ্ধ সাহিত্য, যার পাশে সুর হয়ে পড়ে ম্রিয়মাণ। এমন উচ্চসাহিত্য জগতে বিরল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরমাদর্শ স্থাপিত রয়েছে এই সাহিত্যের অন্তরে। বাংলা ভাষার এমন পরিপূর্ণ বিকাশ আর দেখতে পাওয়া যায় না। বিরাট ভাবকে সরল ভাষার বন্ধনীতে বেঁধে, বাক্যাতীতকেও বাক্যের বেষ্টনীতে এমন করে ধরে রাখা আর কোথাও মেলে না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে, কোনোদিনই কোনো কবি এমন উচ্চাদর্শের রচনা প্রকাশ করেননি, যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

শঙ্করা। চৌতালা

আমারে করো জীবনদান,
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥
আসিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ ॥
দাও মোরে মঙ্গলব্রত, স্বার্থ করো দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান ॥[৪]

৪ স্বরবিতান, চতুর্থ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৩৪

নাচারি টোড়ী। ধামার

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥[৫]

সাহানা নবতাল

নিবিড় ঘন আঁধারে— জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে— হোস নে দিশেহারা।
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা।
রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির-আশা—
শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালবাসা।
সংসারের সুখে দুখে চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধাধারা ॥[৬]

সুরট্ মল্লার একাদশী

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥
মজিয়া অনুখন লালসে রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥
আমারে রহে যেন না ঘিরি সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি বহুল সংগ্রহ আশয়ে।

৫ স্বরবিতান, চতুর্থ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৬৪
৬ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩২

অনেক নৃপতির শাসনে না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥[৭]

আদি রসাত্মক প্রেমগীতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের তুলনা নেই, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞাতব্য-বিষয়ক সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক অতি উচ্চস্তরের ভাবসংবলিত সংগীত-প্রকাশভঙ্গির এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অন্য কোনো গীতিকাব্যে মেলে না। বেদোপনিষদের কথা স্বতন্ত্র, অন্য কোনো সাহিত্যে এমনি একটি পদও দেখতে পাওয়া যায় না—

আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত ॥[৮]

এই যে জগৎসৃষ্টির মূল উৎসের সন্ধান মিলেছে সংক্ষিপ্ত এই কয়টি কথার মধ্যে, এমনি নিদর্শন আর কোথায় ?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য গীতিধর্মী সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এঁর সাহিত্যের সুর সর্বকালের মর্মমথিত বিরহের করুণ কান্না। কবির এই বিরহ কোনো জাগতিক বস্তুর অভাব নয়। যাঁকে দেখলে সব-কিছু দেখার সাধ মিটে যায়, যাঁকে জানলে সব-কিছু জানা যায়, যাঁর সান্নিধ্যলাভে সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার হয় অবসান, যাঁর সংস্পর্শে সমস্ত বন্ধন পায় মুক্তি, যাঁর প্রাণস্পর্শে আসে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি, যাঁকে পেলে আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার হয় অবসান, যাঁর জ্যোতিস্পর্শে ধুয়ে মুছে যায় চির-অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকার, যাঁর মিলন এনে দেয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তাঁরই অভাববোধ এই বিরহ। এই অসীম বিরহের মর্মন্তুদ বাণী তাঁর প্রতিটি কবিতায়। অনাদি

৭ স্বরবিতান, চতুর্থ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২২
৮ গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫৫৯

অনন্ত কালের এই বিরহের সুর তাঁর অন্তরে দিয়েছিল ধরা, তাই তিনি দয়িতবিরহে বিরহিণী দয়িতার মতোই বলেছেন—

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে ॥[৯]

অন্তরলোকে চলেছে তাঁর অন্তরতমের সঙ্গে মিলনের অভিসার-লীলা, মিলনবিরহের দ্বন্দ্ব, বহির্মিলনকে তিনি পরিহার করেছেন, বাইরের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি সেখানে নীরব। একান্ত প্রাণের কাছে পেতে চেয়েছেন প্রাণপ্রিয়কে, তাই বলেছেন—

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে ॥[১০]

জগতের সমস্ত কবির, সমস্ত সাহিত্যিকদের সবচাইতে প্রিয় সুর যেটি, সেটি হচ্ছে বিরহ, কবিগুরুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি বিরহকে ভালবেসেছিলেন প্রাণের চেয়েও, বিরহেই তাঁর আনন্দ, না পাওয়ার মধ্যেই তাঁর চিরপ্রাপ্তির সুখস্বাদ সম্ভব, তাই কবি গেয়েছেন—

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত ॥[১১]

বিরহের মধ্যেই বিশ্বস্রষ্টার স্মৃতি জাগরিত করে রাখতে চেয়েছেন চিরকাল। যদি মিলন না-ই ঘটে, তবু বিরহের মধ্যেই যেন তাঁর অনুভূতি আসে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে যে সকলই ব্যর্থ, সকলই অসম্পূর্ণ, তাই কবি গেয়েছেন—

---

৯ গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৩৮৬
১০ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৪৩
১১ ঐ প্রথম খণ্ড। ঐ পৃঃ ২২০

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই, বাকি আছে সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে, হয়নি আনা সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥[১২]

এই বিরহের সুরই তাঁকে কবির জয়মাল্য পরিয়েছে। গীতি-কবিতাই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে বিজয়ের অভিযানে। "গীতাঞ্জলি" গীতিগ্রন্থই তাঁকে বিশ্বকবির সম্মানে ভূষিত করেছে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রেও কবির দান অপ্রচুর নয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঙ্গের সংগীতই তিনি রচনা করে তাতে সুরযোজনা করেছেন। যেখানে তিনি

১২ গীতবিতান, প্রথম খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৬৪-৬৫

রাগাঙ্গীভূত সংগীতের প্রকাশ দেখিয়েছেন, সেখানে তার পরিপূর্ণ রাগবিকাশের সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। বর্ষার বর্ণনায় মল্লার, প্রভাতের রচনায় প্রভাতী—এমনি আরো সব রাগ-রাগিণীর প্রযোজনা এবং পূর্ণানুভূতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

মিয়ামল্লার। ত্রিতাল

কোথা যে উধাও হোলো মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝর ঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে॥

II ণধা -র্সণা -ধণা া । পা মা পমা পা ।
কো ০০ ০০ ০ থা ০ যে০ উ

পা র্সা া পা । মজ্ঞা রসা রা া I
ধা ০ ও হো লো০ ০০ ০ ০

রণা ধপা ণধা া । মা পধপা -মপা মজ্ঞা ।
মো০ ০০ র ০ প্রা ০০০ ০০ ণ০

রা রা মা া । রা জ্ঞা জ্ঞসা া I
উ দা ০ ০ ০ ০ সী ০

ণ্া সা রা মা । পা ণধণা মা পা ।
আ জি ভ রা ০ ০০০ ০ ০

মা পা মপা নর্সর্রা । র্র্সা া ণর্সা র্র্সণর্সা I
বা দ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ণদা া া ণা । পা া া া II
০ ০ ০ ০

II মা পা মণা ণপা । না না না নর্সা ।
ঘ ন ঘ ০ ন গু রু গু রু ০

র্সা র্সা র্সনা র্সা । া া া া I
গ র জি ০ ছে ০ ০ ০ ০

ণধা ণধা ণধা ণধা । না র্সা র্সা া ।
ঝ ০ র ০ ঝ ০ র ০ না ০ মে ০

র্সা র্সা র্সা নর্সর্রগর্মা । র্রা র্জ্ঞা র্সা া I
দি কে দি গ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ তে ০

ধণা পা মগা পমগমা । রা া সা া ।
জ ০ ল ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০

মা পা পা ণধা । না র্সা র্সা নর্সা I
ম ন ছু টে ০ ০ ০ শূ ০ ০

র্সা র্সনা র্সা র্সা । ণধা না র্সা র্সা ।
ন্যো শূ ০ ০ ন্যো অ ০ ন ন্ তে

র্সা নর্সা র্রর্গা র্মা । র্রা র্জ্ঞা র্সা া I
অ শা ০ ০ ০ ন্ ত ০ বা ০

ণর্সা র্রর্সা ণর্সা ণদা । -া ণা পা া II II [১৩]
তা ০ ০ ০ ০ ০ সে ০ ০ ০ ০ ০

১৩ স্বরবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৪৮-৪৯

ভৈরোঁ। ত্রিতাল

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে, হৃদয়নাথ,
তিমির রজনী-অবসানে হেরি তোমারে ॥
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয় গগনে
বিমল তব মুখভাতি ॥

০ ১ ২´
গা গা II { মা মণদা দা দা। পা া দপদপা মা। মগা পম মা পম I
তু মি আ প০০ নি জা গা ০ ও০০ ০ মো০ ০০ রে ০০

৩ ৩
I (মগা মঋা গা গা) }। মগা মঋা ঋা গা।
০০ ০০ "তু মি" ০০ ০০ ত ০

১
মগা পা মা গা। ঋা ঋা সা া I
ব০ ০ সু ধা প র শে ০

২ ৩
I ন্‌া সা দ্‌া সা। া সা ঋা মা।
হৃ দ য় না ০ থ তি মি

গা ঋা সা সা। গা মা পা া I
র র জ নী অ ব সা ০

৩ ৩
I পদা পদর্ঋা র্সা না। দা দা পা মগা II
নে০ ০০০ হে রি তো মা ০ রে০

	৩					০					১				
II	দা	-া	দা	-া	।	না	া	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	া	র্সা	I
	ধী	•	রে	০		ধী	০	০	রে		বি	কা	০	শো	

	২´					৩				
I	র্সা	ঋা	র্সর্মা	র্গঋা	।	ঋা	ঋর্সা	র্সা	ান	।
	হৃ	দ	য়০	০০		গ	গ০	নে	০	

০									
দপা	মা	পা	দা	।	না	-া	া	র্সা	I
০০	০	বি	ম		ল	০	০	০	

	২´									
I	না	নর্সঋা	র্সা	না	।	দা	া	পা	মগা	II II [১৪]
	ত	ব০০	মু	খ		ভা	০	তি	০০	

জ্ঞানময় অবস্থায় যেমন চরম জ্ঞানানুভূতীয় অমৃতময়ী বাণী অজ্ঞাতে ঋষিমুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে বেদাখ্যা পায়, তদবস্থায় সব-কিছুই তাঁর কাছে হয়ে যায় অমৃতময়, চিরোদ্‌ভাসিত আলোকে তমসার হয় অবসান, কবিগুরুরও তেমনি অনুভূতির অমৃতময়ী বাণী অন্তর থেকে বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে নিজের অজ্ঞাতসারেই। এমন বাণী খেয়ালসংগীতে কখনো যোজিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

আড়ানা। একতালা

মন্দিরে মম কে আসিলে হে।
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে॥

১৪ স্বরবিতান, চতুর্থ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২১

সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥[১৫]

জ্ঞানমিলনের কী অপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে এই সংগীতে।

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো সুরের, ছন্দের, তালের ও তানের স্বাধীনতা কবিগুরুর রচিত উচ্চাঙ্গ সংগীতে নেই, তা হলেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের আদি স্বাভাবিক রূপ থেকে রূপান্তর ঘটেনি এর। সুরস্বাধীনতাই উচ্চাঙ্গ সংগীতের বৈচিত্র্যসৃজনের একটি বিশেষ উপকরণ এবং বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই সুর-স্বাধীনতাকেই কবিগুরু হিন্দুস্থানী সংগীতের শ্রেষ্ঠ উপাদান ও সম্পদ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা যেখানে সংকীর্ণ, সুরের প্রাধান্য সেখানে স্বাভাবিক। কেননা সুরভঙ্গিমাই গঠন করে সেখানে ভাষাদেহকে, অভাব পরিপূর্ণ করে ভাষার ভাবের অপ্রাচুর্যকে। কিন্তু সাধারণ লোক সেই সূক্ষ্মানুভূতির সীমানায় পৌঁছে, সুরে সুরে গঠিত রাগ-রাগিণীর নিরাকার ভাবদেহ ভাবদৃষ্টিতে সন্দর্শন করে, প্রকৃত সহজজাত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। তাই ভাষার প্রয়োজন আছে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জন-সাধারণের প্রিয় করে তুলতে।

নির্বাক অভিনয়ের দায়িত্ব অনেকখানি, গুরুত্বও যথেষ্ট এবং রূপদান করাও অতি সুকঠিন। শুধুমাত্র আভাসে ইঙ্গিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা চরম সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী ব্যতীত সম্ভব নয়। এক রঙে ছবি আঁকা যেমন কঠিন, তেমনি নির্বাক অভিনয়ে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করা আরো কঠিন। এর থেকেও দুরূহ কার্য শুধুমাত্র সুর সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাবাভিব্যক্তির কাল্পনিক ধ্যানচিত্রিত

১৫ স্বরবিতান, চতুর্থ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৫

রাগ-রাগিণীর রূপ প্রকাশ করা। সেজন্য শিল্পীকে সাহায্য করতেই সুসাহিত্যের প্রয়োজন। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত ভারতবর্ষীয় সংগীতকে উচ্চাদর্শের সাহিত্য-সংস্পর্শে উচ্চতম লোকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

ঠুংরী সংগীতের প্রতি কবিগুরুর বোধ হয় বিশেষ দৃষ্টি পড়েনি। কেননা তাঁর গীতিকবিতার মধ্যে এই শ্রেণীর সংগীত বড় দেখতে পাওয়া যায় না। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট নায়িকা উপেক্ষিতা উর্মিলার মতোই, বিশিষ্ট ভাবসম্পদে সজ্জিতা ঠুংরীগীতি, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদ সংগীত-সাহিত্যে উপেক্ষিতা হয়েছে। কিন্তু টপ্পাকে তিনি উপেক্ষা করেননি। টপ্পাজাতীয় বহু সংগীত রচনা করে, টপ্পার অঙ্গীভূত রাগ-রাগিণী ও তাল-সহযোগে তাকে তিনি সাহিত্যালংকারে ভূষিত করেছেন। তবে রচনার ধারা ও বিষয়বস্তু প্রাচীন সংগীতসাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবির রচিত অভিজাত সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, প্রেমগীতি, কীর্তন, বাউল, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক, প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক, সমস্ত সংগীতই ভাব-সম্পদে ও রচনাচাতুর্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে। টপ্পা সংগীত প্রাচীন অবস্থায় জাগতিক প্রেম ও বাস্তব আনন্দাদির বিষয় নিয়েই রচিত ও প্রচলিত হয়েছিল। কবিগুরুর টপ্পা পেয়েছে জগৎস্বামী হতে বিচ্ছিন্নের, বিরহের সুর। তাঁকে নিয়েই চলেছে মান-অভিমান, কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, ভয়-ভ্রান্তি, দ্বিধা-শঙ্কা, চেতন ও অবচেতন মনের ব্যাকুল কামনা বাসনার নিরন্তর অভিনয়। এমনি মধুর ভাব, এমনি ভাবপ্রাচুর্য, এমনি আন্তরিকতা, কোনোদিন কোনো যুগে আশ্রয় করেনি টপ্পা সংগীতকে।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥

যদি কোনোদিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝংকারে
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনোদিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনোদিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥*[১৬]

প্রকৃত নিরাড়ম্বর টপ্পার রূপটি এতে বিদ্যমান। এর থেকে মনে হয়, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এমনকি কোনো সংগীতেই সুরাড়ম্বর কবিগুরু পছন্দ করতেন না, কিংবা সাবলীল ভাষার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে পারেনি সুরবৈচিত্র্যের গতি। তা বলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালনিচয়কে তিনি উপেক্ষা করেননি কোনোদিন, বরং আঁকড়ে ধরেছেন ছন্দসৃষ্টির সাহায্যকল্পে।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো সাহিত্যিক এমনি একান্তভাবে সংগীতকে আঁকড়ে ধরেননি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবলম্বনরূপে। এমন করে সংগীতকে অনুভব করেননি কেউ। সুখে দুঃখে, শোকে সান্ত্বনায়, আনন্দ-উৎসবে, খেলাধুলোয়, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে, অন্তরে বাহিরে তনুতে তনুতে এমনি করে মিশে যায়নি সংগীত জীবনসঙ্গিনীর মতো কোনো কবির জীবনে মরণে। কবিগুরুর সাহিত্যে সংগীত যেন শ্যামরূপী তমালতরু, আর কবিতা যেন তারই আশ্রিতা রাধা-রূপী রাধালতা, তাই সংগীতই চলেছে অগ্রদূত হয়ে কবিগুরুর সাহিত্যবার্তা বহন করে। আগে আগে চলেছে সে বিজয়-অভিযানের পঙ্কিল পথ পরিষ্কার করে, আর কবিতা চলেছে তার পিছনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে মহানগরীতে, দেশ থেকে মহাদেশে জয়ের পতাকা উড়িয়ে বিজয়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে করতে

---

১৬ গীতবিতান, প্রথম খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৪৭

বিজয়িনী বীরাঙ্গনার মতো, হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে, নির্ভীক হৃদয়ে, উন্নত শিরে। ললাটফলকে তার বিজয়তিলক অঙ্কিত, কণ্ঠে তার বৈজয়ন্তী মালা, নয়নে তার আনন্দাশ্রুপ্লাবন; আজ সে বিজয়িনী, আজ সে গরবিনী, আজ সে স্মরণীয়া, বরণীয়া, অচিন্তনীয়া, অভাবনীয়া। বিশ্ব বিজয় করে আজ সে বিশ্বের বিস্ময়রূপে প্রতীয়মানা। তা বলে অবহেলা, উপেক্ষা, অবমাননা সে কোনোদিনই করেনি পরমপ্রিয় তার সেই সংগীতকে, যে এনে দিয়েছে বিজয়গৌরব, নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছে বিজয়মুকুট, সুখে-দুঃখে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যে চলেছিল ছায়ার মতোই তার পিছনে পিছনে। তাই কবিগুরুর সাহিত্য সংগীতকে শৃঙ্খলিত করেনি, দিয়েছে মুক্তি, দিয়েছে প্রাণ, এনে দিয়েছে অনন্ত কালের সংগীতসভার আমন্ত্রণলিপি।

যে-দেশের সাধনপ্রভাবে স্বয়ং ভগবান মানবরূপ পরিগ্রহ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হন ধর্মবিপ্লব থেকে পরিত্রাণ করতে জনগণকে, পতনোন্মুখ মানবধর্মের অভ্যুত্থানের নিমিত্ত, সেই ভারতবর্ষে ভারতমাতার ভারতীভবনে কবিপ্রতিভা যখন লুপ্তপ্রায়, আদি মহাকবি বাল্মীকি হতে বেদব্যাসাদি এবং বিক্রমাদিত্যের সভাকবি নবরত্নাদি পর্যন্ত যাঁরা মহাকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের স্থান পূরণ করতে যখন কোনো কবিই ছিলেন না অবশিষ্ট, যাঁদের হারিয়ে বিশ্বভারতীর চোখে এসেছিল জল, একান্তমনে কামনা করেছিলেন তাঁর প্রিয়পুত্রকবিদের শূন্যস্থান পূর্ণ ও অলংকৃত করতে তদুপযুক্ত পুত্রের, ভগবানের মতো ভারতীয় সাহিত্যের অভ্যুত্থানকল্পে, বঙ্গজননীর রঙ্গভূমে পূর্ণ ঐশীশক্তি, পূর্ণ কাব্যানুভূতি, পূর্ণ জ্ঞানশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন বাণীর বরপুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোয় ২৫শে বৈশাখ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর দিগন্তপ্রসারিত জ্ঞানদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশই এই কাব্যবিভূতি। জীবনকে এবং জীবজগৎকে এমন করে অনুভব ও পরিপূর্ণ ভোগ কোনো কবি কোনোদিন

করেছেন কিনা সন্দেহ। প্রকৃষ্ট দার্শনিক কবি বলতে গেলে কবি-গুরুকেই বলতে হয়। কেননা প্রতিটি কবিতার, প্রতিটি সংগীতের শেষ অর্ঘ্য পৌঁছেছে পরম কারুণিকের পাদমূলে। শঙ্করাচার্যের বেদভাষ্য পড়লে যেমন অনুভব করা যায় যে, বেদান্তের বিষয়বস্তুর প্রকাশই সেখানে মুখ্য, পাণ্ডিত্য গৌণ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গুচ্ছ পড়লে সম্পূর্ণই উপলব্ধি হয় যে, পাণ্ডিত্যাভিমান বর্জন করে অতি সরল ভাষার ব্যঞ্জনায় সুকঠিন বিষয়বস্তুর চরমার্থ প্রকাশ করতেই তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন মুখ্যতঃ।

আলোকস্রষ্টা, আলোকদাতা হিসাবে গ্রহাদির মধ্যে রবির স্থান যেমন সকলের ঊর্ধ্বে, তেমনি কাব্য ও সংগীত -স্রষ্টা হিসাবে কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান রবীন্দ্রনাথের। রবিরও ঊর্ধ্বে এঁর আসন প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতি, বাঙালীর সাহিত্য-সংগীতকে বিশ্বের লোকচক্ষুর সামনে এক উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলা মায়ের সুসন্তান, সুকবি, সুশিল্পী, সুসাহিত্যিক, সংগীতরসিক, সংগীতসেবী, সর্বগুণাকর মহামানব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবের কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এমন এক সময় ছিল, যখন প্রাচীন রীতির বহির্ভূত যে-কোনো কাজ করলেই প্রাচীনপন্থীদের রোষদৃষ্টিতে পতিত হয়ে তাঁদের বিদ্রূপ কটাক্ষ ও ব্যঙ্গোক্তি সহ্য করতে হ'ত। এমনকি সমাজপতিদের চূড়ান্ত নিপীড়নে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়ে, একপ্রকার সমাজের বহির্ভূত অবস্থায় মহাপরাধী দ্বীপান্তরবাসীর মতোই জীবনযাপন করতে হ'ত। সেই সময়ে যখন বাংলা গানে সবেমাত্র একটি নূতন যুগের সূচনা হয়েছে, তখন সংগীতের চিরাচরিত পুরাতনী রীতিনীতি

লঙ্ঘন করে, শত উপেক্ষা অবহেলার মধ্যেও যিনি নূতন পথে নূতন ধারায় নূতন সংগীতের সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং যাঁর প্রতি অকৃপণ বিদ্রূপাত্মক বাণী বর্ষিত হয়েছিল প্রাচীনপন্থীদের, বাংলা সংগীতে নূতন রূপ দানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান সেই কবি ও সুরস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণীয়।

কবির জীবনে ঘাতপ্রতিঘাত এসেছিল অনেক। সমাজ তাঁকে করেছিল একঘরে এবং সংগীতের ক্ষেত্রেও একঘরে কোণঠাসা করে রাখবার চেষ্টা করেছিল সেকালের রক্ষণশীলের দল। কিন্তু সে চেষ্টা তাদের সফল হয়নি, কারণ ইউরোপীয় ধারায় বাংলা সংগীতের সুরমিশ্রণে নূতনত্ব এনে তিনি দক্ষতাও দেখিয়েছিলেন যথেষ্ট এবং সমর্থনও পেয়েছিলেন সাধারণ জনগণের। রাগসংগীতে তাঁর অধিকার থাকায় তিনি বাংলা সংগীতে রাগসংগীতের মিশ্রণ সুন্দররূপে সাধিত করেছেন এবং তাঁর গায়নপদ্ধতিতে লোকরঞ্জনের একটি অপূর্ব ভঙ্গি ছিল। কবির রচনা ও সুরের মধ্যে কমনীয়তা ও বলিষ্ঠ ভঙ্গির সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। এটি কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু। কী সুন্দররূপে স্নিগ্ধ সুরের স্পর্শে, ভাবের আবেগে, মর্মস্পর্শী আকুলতায়, স্বাভাবিক সরলতায় ও স্বচ্ছন্দ গতির ছন্দস্রোতে প্রস্ফুটিত পূর্ণ বিকশিত পুষ্পপুঞ্জের মতোই ফুটে উঠেছে এঁর রচিত গীতগুচ্ছ। অন্য সকল কবি এবং সুরস্রষ্টা থেকে পৃথকভাবে প্রতিভাত হয়েছে এঁর সুরসৃষ্টি ও গীতলেখা। কবি যে শুধু প্রেমসংগীতেই এই নবসৃষ্টির রূপ দেখিয়েছেন, তা নয়। তাঁর রচিত নাট্যসংগীত, ভক্তিরসাত্মক সংগীত, কাব্যসংগীত, জাতীয় সংগীত, হাস্যরসাত্মক প্রভৃতি সকল প্রকার সংগীতের মধ্যেই নবসৃষ্টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানের অনেক সুরকারই পাশ্চাত্য সংগীতানুকরণে এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রয়োগানুসারে আধুনিক সংগীতে সুর দান করেন, কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো প্রয়োগকুশলতা ও সহজ

সরলতা এঁদের সুরমিশ্রণে পরিলক্ষিত হয় না। কবি পাশ্চাত্য সংগীতের প্রাণকোঠায় প্রবেশ করে, পাশ্চাত্য স্বকীয় ধারার মিশ্রণরীতিকে আত্মসাৎ করেছেন। তারপর একটি সাবলীল, স্বকীয়, অনুপম মিশ্রণভঙ্গির আবেষ্টনে বাংলা সংগীতের প্রকাশ করে, এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন, আধুনিক সুরকারেরা যার ত্রিসীমানায়ও পৌঁছাতে পারেন না। তবে কিনা এর কারণ আছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য এই উভয়বিধ সংগীত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে তাদের সুষ্ঠু মিলনে একটি বিশিষ্ট সুন্দর রূপ সংগীতে দান করা সম্ভবপর নয়। আজকালকার সুরকারেরা দু-একখানি পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ড থেকে কিঞ্চিৎ সুর আহরণ করে, বাংলা সংগীতে নবরূপ দান করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু না আছে তাঁদের ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞতা, না পাশ্চাত্য সংগীতের রীতিনীতি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান। তাই এঁদের সুরমিশ্রণে না হয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি, না দেখা যায় স্বরসংযোজনার সামঞ্জস্য, না থাকে কথার সঙ্গে অর্থ-প্রকাশক সুরের রীতিসংগতি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কেননা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য এই উভয়দেশীয় সংগীতে তাঁর রীতিমতো জ্ঞান ছিল। বহু অর্থব্যয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে ইনি শিক্ষা করেছিলেন পাশ্চাত্য সংগীত। কাজেই উভয়বিধ সংগীতের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল তাঁর। তাই স্বাভাবিক নিয়মে উভয়দেশীয় সংগীতের মধ্যে অকৃত্রিম মিলন সংঘটিত করতে তিনি অনায়াসেই সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালের সুররচনায় কৃত্রিমতা আছে বলেই এর নূতনত্বটি অস্বাভাবিক বিকৃত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। বিচিত্রতা এবং মিলনমধুরিমা অনুভূতিশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ তো করেই না, বরং তাঁদের দৃষ্টিতে বিসদৃশই ঠেকে। এই নূতন সৃষ্টির সত্যিকারের কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না। বাংলার সংগীত

যাঁদের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁদেরই একজন। সম্পূর্ণভাবে বাংলা সংগীত জানতে হলে তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না, কেননা তিনি ছিলেন একজন প্রধান সুরস্রষ্টা।

সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি সমাজ, কাল, ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। চিরপুরাতনই চিরনবীনতা লাভ করে এসেছে চিরদিন। চিরপুরাতন বেদবেদান্তের বাণী আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে এসেছে। প্রগতির পূর্ণ পরিণতিও তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারেনি চিরপুরাতনের অজুহাতে এই নূতন যুগে। তাই শিক্ষা, দীক্ষা এবং ইতিহাসের দিক থেকে আলোচনা করে দেখলে সংগীতের ক্ষেত্রে পুরাতন সংগীতরচয়িতা ও সুরস্রষ্টাদের কোনো প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করা চলে না। শুধু তাই নয়, প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে যে-সকল পুরাতন শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের নিদর্শন পাওয়া যায়, প্রগতির ক্ষেত্রে তারা চিরউন্নতেরই সাক্ষ্য দেয়। মনের প্রসার থাকলে এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হলে, পুরাতনের মধ্যেও রসপ্রবাহধারা মেলে এবং তার মধ্যেও প্রকৃত রসমাধুর্যের সুখস্বাদ উপলব্ধি হয়। যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-সংগীতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, সত্যিই তাঁরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টির দিকে চেয়ে।

নিছক সাহিত্যের কথা নয়, কিন্তু সাহিত্য যখন সংগীতের রূপ নিয়েছে, তখন তার সুরস্বাধীনতা থাকাই উচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের এই নূতন সৃষ্টি সুরস্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটায়নি, বরং সুরের সাবলীল গতির পথ উন্মুক্ত করেছে। সংগীত ও সুরস্রষ্টার এটি কর্তব্য এবং এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুরশিল্পীবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার এই সুর-স্বাধীনতার উন্মুক্ত পথে অনায়াসে বিচরণ করতে ও নব নব ভঙ্গিতে নূতনকে আরো নূতনতর করে তুলতে প্রয়াস পান।

কাব্য ও সংগীত -প্রতিভা কবির শিশুকালেই বিকশিত হয়েছিল এবং বারো থেকে সতেরো বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই তাঁর প্রথম গ্রন্থ

"আর্যগাথা"র প্রথম ভাগের রচিত গানগুলির সন্ধান মেলে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য সংগীতের উপর কবির প্রথম জীবনে শ্রদ্ধা তো ছিলই না, বরং অশ্রদ্ধাই এসে গিয়েছিল এবং তিনি নিজেই একথা স্বীকার করে গেছেন তাঁর জীবনীতে। এই অশ্রদ্ধাই তাঁর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছিল ইউরোপীয় সংগীতের রীতিনীতি অবগত হওয়ার জন্য, তাই তিনি প্রচুর ঔৎসুক্য নিয়ে শিখেছিলেন পাশ্চাত্য সংগীত। ইউরোপীয় সংগীতের ছন্দোবৈচিত্র্য, সাবলীল ধারা তাঁর পছন্দ হয়েছিল, তাই সেটুকুই সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগনিপুণতায় তিনি প্রযোজিত করেছেন বাংলা সংগীতের মধ্যে। তিনি যে ইউরোপীয় সমস্ত মতবাদকেই সমর্থন করতেন তা নয়, তাঁর অন্তরে ছিল স্বদেশ-ভক্তির অমৃতপ্রস্রবণ। কবির রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীতের মধ্যে তা বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়। মুমূর্ষু বাঙালী জাতির আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলতে বাঙালীর অভ্যুত্থানের নিমিত্ত এবং চিরপরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে, জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে, বাঙালী জাতি যাতে চিরদিন সকল জাতির কাছে আদর্শ হয়ে থাকে, এমনি শিক্ষামূলক দেশমাতৃকার ভক্তিমূলক রচনায় বাঙালীকে মাতিয়ে তুলতে, বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুই উৎসাহিত করেছিলেন কবিকে। তাঁরই প্রেরণায় কবি স্বদেশী গান রচনায় মনোনিবেশ করেন—

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ।
সপ্তকোটি মিলিতকণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ॥

সকরুণ অথচ ওজস্বিনী ভাষায় এই যে রচনা, বাঙালীর জীবনক্ষেত্রে এর মূল্য বহু। বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য এমন সুন্দর সংগীত রচনা দ্বিতীয়টি মেলে কিনা সন্দেহ। সংগীতে, সাহিত্যে এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে, নবজাগরণের এই অমোঘমন্ত্র দ্বিজেন্দ্র-লালের রচিত গীতিকবিতা, আত্মবোধ ও পরাধীনতামুক্তির প্রচেষ্টা এনে দিয়েছিল। এঁর অকৃপণ দান বাংলাকে এবং বাঙালী জাতিকে নূতনের সন্ধান দিয়েছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের গানে রাগের মিশ্রণ বহুল পরিমাণে থাকলেও, তা অভিজাত সংগীতের ধারাই বহন করে চলেছে। কবির রচিত "গান" পুস্তকখানি তার প্রমাণ। এর প্রত্যেক গানের উপরেই রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। চৌতাল, ধামার, সুরফাঁক, ঝাঁপ, রূপক প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গের তাল ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর গানে। তা ছাড়া খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীতে সাধারণতঃ যে-সব তালের ব্যবহার হয়, সেগুলিও প্রায় সবই রয়েছে তাঁর গানে। যেমন—একতালা, কাওয়ালী, আড়া, তেওরা, যৎ, আড়খেম্‌টা, খেম্‌টা, ঢিমাতেতালা, আদ্ধাকাওয়ালী, কার্ফা, জলদএকতালা, দাদ্‌রা, মধ্যমান, ভরতঙ্গা, তেওট, পোস্তা প্রভৃতি তালের নাম করা যেতে পারে। সুতরাং তিনি তাঁর গানে রাগমিশ্রণ যেমনি করেছেন, তেমনি আবার বহুগানে বিশুদ্ধ রাগের কৌলীন্যও বজায় রেখেছেন দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বহু কঠিন অপ্রচলিত রাগেরও সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গানে। জয়জয়ন্তী, ইমনভূপালী, ইমনকল্যাণ, ভৈরবী, বাগেশ্রী, ইমন, মিশ্র ইমন, পিলুবারোঁয়া, নটমল্লার, সিন্ধু, সিন্ধুখাম্বাজ, শঙ্করা, কাফিসিন্ধু, খাম্বাজ, বাগেশ্রীমল্লার, ভৈরোঁ, মিশ্রঝিঁঝিট, কালাংড়া, আলেয়া, গৌড়সারং, বেহাগ, মিশ্র সিন্ধু, মল্লার, বারোঁয়া, যোগিয়া, মিশ্রবেহাগ, বেহাগ খাম্বাজ, আশাবরী, বসন্ত, ছায়ানট, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, টোড়ী, গৌরী, সাহানা, মিশ্র জয়জয়ন্তী, মিশ্র ছায়ানট,

হাম্বীর, ভীমপলশ্রী, মিশ্র ভৈরবী, পূরবী, মেঘমল্লার, বাহার, ভূপালী, সিন্ধুড়া, মিশ্র ভূপালী, মিশ্র সিন্ধু খাম্বাজ, ললিত, মিশ্র মুলতান, মিশ্র কেদারা, মিশ্র বাগেশ্রী, ঝিঁঝিট, কাফি, সিন্ধু কানাড়া, বাগেশ্রী কানাড়া, ভৈরবী আশাবরী, পুরিয়া, দেওকিরী, কেদারা, সোহিনী, সারঙ্গ, মুলতানী, বিহগড়া, কানেড়া, আড়ানা, সুরট, গান্ধারী তোড়ী, হেমখেম, পিলু, মিশ্র হিন্দোল, আলেয়া, বসন্ত মালকোষ প্রভৃতি শুদ্ধ ও মিশ্র রাগের পরিচয় মেলে তাঁর সংগীতে। তিনি কীর্তন ও বাউলসংগীতও রচনা করেছেন।

মিশ্রশঙ্করা—জলদ একতালা

সুখের কথা বোলো না আর বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি আছি ভাল দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দু দণ্ডেরি হাসি হেসে মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে ;
চোখে বারি দেখলে পরে সুখ চলে যান বিরাগভরে
দুঃখ তখন কোলে করে আদর করে মুছায় আঁখি।

০ ১ + ৩
II র্সা র্সা া । না ধপা ক্ষা । পা না া । ধনা র্রসা না ।
সু খে র ক থা ০ ০ বো লো ০ না ০ ০ ০ আর

পা পা া । গা পা া । গা রগা া । রনা্ সা না ।
বু ঝে ০ ছি সু খ কে ব ল ফাঁ কি ০

া া সা । সা গা মা । পা পা া । না না া ।
০ ০ দুঃ খে আ ছি আ ছি ০ ভা লো ০

র্সা -া র্সা । র্গরা র্সা র্সা । না ধনা র্রর্সা । না ধপা ক্ষপা । II II
দুঃ ০ খে ই আ মি ভা লো০ ০ থা কি০ ০০

{ া া পা । পা নধা না । র্সা র্সা -া । র্সনা র্রর্সা নর্সা ।
০ ০ দুঃ খ আ০মার প্রা ণে র স০ খা ০০
চো খে০০বারি দে খ লে প০ রে ০০

র্সা র্গা র্গা । র্রর্গা র্পর্মা র্গা । র্সা র্সর্রা র্গর্রা । র্সা না া । }
সু খ দি য়ে ০যা ন চো খে০ র০ দে খা ০
সু খ চ লে ০যান বি রা গ ভ রে

া া র্সা । র্সা না ধপক্ষা । পা না া । ধনা র্রর্সা না ।
০ ০ দু দ ণ্ডে রি০০ হা সি ০ হে০ ০০ সে
০ ০ দুঃ খ ত খন কো লে ০ ক' ০০ রে

পা া পা । গা পা া । গা রগা া । রসনা্ সা া ।
মৌ ০ খি ক ভ ০ দ্র তা -া রা০০ খি ০
আ দ র ক রে ০ মু ছা য় আঁ খি ০

া া সা । সা গা গা । পা া পা । পা পা -া ।
০ ০ দ য়া ক রে মো র ঘ রে সু খ

না না া । র্রর্সা না া । ধা পক্ষা পা । মা গা া ।
পা য়ে র ধূ লা ০ ঝা ড়ে০ ন য বে ০

। । পা । পা পা পা । পা হ্মপা ধনা । ধা পহ্মা পা ।
০ ০ চো খের বা রি চে পে০ ০০ রে খে০ ০

গা গা মা । ধা পা হ্মপা । গা মা গা । রসন্‌া সা । ।
মু খে র হা সি ০০ হা স্‌ তে হ০০ বে০[১৭]

রজনীকান্ত সেন

বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে হয়তো কবি রজনীকান্ত সেন আসেননি, কিন্তু বাংলা সংগীতের মর্মস্পর্শী স্রষ্টা হিসাবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থলাভিষিক্ত। বহু সুরমিশ্রণে বিচিত্রতা সৃষ্টি করবার কষ্টসাধ্য প্রয়াস তিনি করেননি। তিনি চেয়েছেন তাঁর সংগীতের স্নিগ্ধ সরল নিবিড় করুণ রসে মানুষের মনকে আপ্লুত করে রাখতে। সবার যেটি একান্ত পরিচিত সুর, তাই নিয়ে তিনি করেছেন মিশ্রণ। তাঁর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে একটি পবিত্র শান্ত রসধারার রচনায়। কান্তকবি ভাষার পাণ্ডিত্য পরিহার করে, সরল সহজ রচনায়ই ব্যাপৃত হয়েছিলেন। যে-কোনো বিদ্যার বিশেষ অধিকারী না হলে, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে, নিবিড় অনুভূতি না পেলে, এমন সরল সুন্দর স্বাভাবিক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কবি তাঁর সুগভীর রসানুভূতি থেকেই এই সুন্দর সংগীত সৃষ্টির সূক্ষ্ম দৃষ্টি পেয়েছেন। তাঁর গহন হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ সরল সুখকর স্নিগ্ধ রসধারায় অভিষিক্ত কথা ও সুরের এই অপূর্ব মিলন মরমী স্রষ্টারই পরিচয় দেয়।

কান্তকবির ভক্তিগীতিই শ্রেষ্ঠ রচনা এবং ভক্তির উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে এঁর সংগীতাবলী। প্রচলিত সংগীতের কোনো একটি বিশিষ্ট ঢংয়ে গণ্ডিবদ্ধ করেননি তিনি তাঁর সংগীতকে। সেজন্য

---

১৭ দ্বিজেন্দ্র-গীতি, প্রথম খণ্ড। শ্রীদিলীপকুমার রায়

অন্য রচয়িতা ও সুরস্রষ্টাদের চেয়ে কিছুটা স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয় কবির ভক্তিমূলক গান-রচনা ও সুর যোজনায়। ললিতবিভাস, সিন্ধু খাম্বাজ, কাফি সিন্ধু, সুরটমল্লার, বসন্তবাহার, নাটবেহাগ, টোরী-ভৈরবী প্রভৃতি প্রচলিত রাগের মিশ্রণে তিনি সুরের এমন চমৎকারিতা দেখিয়েছেন যা অনবদ্য। এ ছাড়া বেহাগ, টোরী, নটনারায়ণ, আলেয়া, গৌড়সারঙ্গ, ভূপালী, কানাড়া, বসন্ত, মল্লার, সোহিনী, বাগেশ্রী, পরোজ, আশা, পিলু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, ভৈরবী, পূরবী, ইমন্, মুলতান, মালকোষ, সিন্ধু, ভয়রোঁ, গৌরী, বারোঁয়া, বিভাস, হাম্বীর, কালেংড়া প্রভৃতি শুদ্ধ রাগেরও উল্লেখ দেখা যায় তাঁর গানে। স্বদেশী এবং বাউলসংগীত রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব কম দেখাননি। কীর্তনাঙ্গ গানের মধ্যেও তিনি কেমন সুন্দর ছন্দ যোজনা করেছেন। এঁর সর্বজাতীয় সংগীতসৃষ্টির মাঝেও যেন জীবন্ত প্রাণস্পন্দন জেগে রয়েছে।

সংকল্প—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই ;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই ।[১৮]

পরপার—

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ;
যাবি যদি ও পারের সেই অভয়-নগরে ।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে ;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে ।
(তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই ;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই ।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম-দিগ্-দর্শনের কাঁটা ;
(আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা ।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড়,
(মাঝি) টের পাবে না, টে'নে নিয়ে জোরে মা'রবে আছাড় ।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ্, চোখ রেখে ভাই চলিস্ ;
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হ'য়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্ ।
(ওরে) এপারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি ।[১৯]

কবি রজনীকান্ত প্রথমোক্ত গানটি মুলতান রাগে ও গড়খেমটা তালে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর রচিত এই গানটি আসলে ভীমপলশ্রী রাগে গান করা হয়। ভীমপলশ্রী ও মুলতান রাগ দুটি রূপে ও বিকাশে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু প্রাচীন

---

১৮ বাণী। রজনীকান্ত সেন। পৃঃ ৮১

১৯ কল্যাণী। রজনীকান্ত সেন। পৃঃ ৬৪

অধিকাংশ গীতিকার কি জানি কেন, ভীমপলশ্রীকেই মুলতান নামে অভিহিত করেছেন। কারণ সত্যই অজ্ঞাত। যেমন রামপ্রসাদের "আয় মা সাধন সমরে" গানটি মুলতান রাগে গান করবার নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে গানটি ভীমপলশ্রী রাগেই গান করা হয়। যথাঃ—"ণ় স জ্ঞ ম প, ম প ণ ধ প ম প জ্ঞ র স, ণ় স জ্ঞ ম প"—এইভাবে ভীমপলশ্রী রাগে গান করবার নিয়ম। সুতরাং রজনীকান্ত সেনের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি মুলতানের পরিবর্তে ভীমপলশ্রীতেই গান করা হয়। আর তালের বেলায় বলা যায় যে, যদিও উচ্চাঙ্গ রাগে গানটি রচিত হয়েছে, তা হলেও সর্বসাধারণের পক্ষে গানের জন্য সাদাসিধা গড়খেম্‌টা তালের সমাবেশ আছে এবং তাতে গানের আভিজাত্য কোনো-মতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। দ্বিতীয় গানটি বাউলের সুরে ও কাহারবা তালে উল্লেখ করা আছে।

কবির সংগীতে সুরের স্বাধীনতাও রয়েছে যথেষ্ট, অথচ সীমা-লঙ্ঘনের সুযোগ সেখানে নেই, তাই কথা ও ছন্দের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। বহু তালে এবং বহু ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে এঁর বিশিষ্ট গানসমুচ্চয়, যেগুলি ভারতীয় সংগীতের মূলধারাকে অতিক্রম করেনি। কাওয়ালী, একতালা, যৎ, তেওড়া, মধ্যমান, গড়খেম্‌টা, আড়া, আড় কাওয়ালী, ঝাঁপ, খেম্‌টা, সুরফাঁক, আড়-খেম্‌টা, কাহারোয়া, ঠুংরী প্রভৃতি তালের প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর সংগীতে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গা-বাড়ী নামক গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই সংগীতে তাঁর প্রভূত অনুরাগ ছিল এবং সংগীতকেই জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। গান রচনা করবার সময় তাঁর ভাবতে হ'ত না, সুরের ভাবদেহ গঠনের জন্য ভাষা যেন আগেই এসে জুটত অভাবিতরূপে। অতি উচ্চাঙ্গের রচনা অল্প

সময়ের মধ্যেই সমাধা হ'ত, না হ'ত ছন্দপতন, না হ'ত অতিরঞ্জিত। তাল, ছন্দ ও সুরের সমতা রক্ষা করে, অতি স্বল্পায়াসে প্রকাশ পেত সংগীতের সংযত ভাবমাধুর্য। বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল কবির রচিত "বাণী" ও "কল্যাণী"র গান। তখনকার প্রত্যেক সমাজে, প্রতি ঘরে ঘরে এবং প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠে কান্তকবির ঐ সংগীত প্রতিধ্বনিত হ'ত। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিদের সংগীত ও সাহিত্যের পাশাপাশি সমভাবেই আদৃত হয়েছিল রজনীকান্তের সংগীত ও সাহিত্য। এমনি সুরুচিসম্পন্ন সাধককবির প্রয়োজন ছিল তখনকার দিনে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীতের মধ্যে চির অমরতা লাভ করেছেন কান্তকবি। ভক্তিসংগীত, প্রীতিসংগীত, আধ্যাত্মিক সংগীত, হাস্যরসাত্মক সংগীত, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি সকলপ্রকার সংগীতই ভারতীয় রাগসংগীতের ধারানুবর্তিত হয়ে, আদর্শ সংগীতের মর্যাদা অর্জন করেছে। বাংলার কোনো কবির চাইতে এঁর দান সামান্য নয়।

অতুলপ্রসাদ সেন

সমস্ত সাধনারই এক-একটি স্তর আছে এবং সব সাধকই যে সাধনার দ্বারা সব স্তরে পৌঁছাতে পারেন এমন নয়। এক-এক সাধক, এক-এক শিল্পী, এক-এক স্তরে গিয়ে পৌঁছান সাধনা ও প্রতিভা -প্রভাবে। বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্পী পৌঁছান একটি বিশিষ্ট স্তরে, যেটি পূর্ণানুভূতির উপলব্ধির স্তর। সেখানে শিল্পীর সমগ্র চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে শিল্পসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু খুব কম শিল্পীই এই স্তরে পৌঁছাতে পারেন। সংগীত ও সাহিত্য জগতে যাঁরা এই পূর্ণ অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। অতুলপ্রসাদ এই অল্পসংখ্যক সংগীত ও সাহিত্য -সাধকদের মধ্যে একজন। এঁর গীতিসাহিত্যের সুর চলেছে একটানা স্রোতে করুণ সুরকে বহন করে। তাঁর সংগীতের বাণী সরল এবং সুগভীর

অনুভূতির প্রতীক। এমন আত্মনির্ভরতা, এমন করুণ আকুল আবেদন, করুণ রসের এমনি মূর্ত ছবি, দুঃখ বেদনাকে চরম উপলব্ধি না করলে প্রকাশ পায় না। তাই সাধারণ লেখায় ও সাধারণ সুরের মধ্যেও, অসাধারণত্ব ফুঠে উঠেছে হৃদয়াবেগের আকুল আকূতির স্পর্শে। সংসার কবিকে বাঁধেনি গভীর স্নেহসুখস্পর্শে, যে স্পর্শ প্রেরণা জাগাবে জাগতিক সুখানন্দের ছবি আঁকতে। হেনেছে আঘাত, দিয়েছে দুঃখ, তাই বেদনাজর্জরিত হৃদয়ের পরম আবেদন তাঁর কবিতার কথায় কথায়, সুরে সুরে ছড়িয়ে পড়েছে, করুণ অনুভূতির অকরুণ নিষ্পেষণে মথিত মর্মের গোপনরুদ্ধ দ্বার খুলে বাইরে। জীবনবীণার ছিন্ন তারের করুণ ঝংকারই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবির জীবনসংগীতে।

কবির রাগমিশ্রণের ধারা ভারতীয় উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের রীতিকেই অনুসরণ করেছে। হিন্দীবাণীযুক্ত উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরূপ বহু গান তিনি রচনা করেছেন। সেই গানগুলি সম্পূর্ণ অভিজাত সংগীতের ধারা রক্ষা করেছে এবং উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীতের আসরে চিরদিন সমমর্যাদা পেয়েছে। এঁর রাগমিশ্রণের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই, যে-যে রাগগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সচরাচর সেই-সেই রাগই তিনি মিশ্রণ করতেন তাঁর অধিকাংশ গানে। এর থেকে সুরসংগতির মাধুর্য বিশেষ করে ফুটে উঠত কবির সংগীতে। ঝিঁঝিট খাম্বাজ, মিশ্র দেশ, বেহাগ খাম্বাজ, সুরটমল্লার, সিন্ধুকাফি, মিশ্র সাহানা, মিশ্র আশাবরী, পিলু খাম্বাজ, পিলু বারোঁয়া, মিশ্র বেহাগ, মিশ্র তিলক কামোদ, মিশ্র কালাংড়া, মিশ্র মল্লার, দেশ পিলু, ভৈরবী ভৈরোঁ, গুজরাটি খাম্বাজ, মিশ্র সিন্ধুখাম্বাজ, বসন্ত বাহার, মিশ্র কানাড়া এবং মিশ্র পরজ ভৈরোঁ প্রভৃতি মিশ্র রাগ এবং ভৈরোঁ, বেহাগ, ললিত, নায়েকী কানাড়া, খাম্বাজ, ভৈরবী, কালাংড়া, জয়শ্রী, কর্ণাটী, পিলু, সাহানা, সিন্ধু, পূরবী, হাম্বির, জৌনপুরী, আশাবরী, জয়জয়ন্তী,

নটমল্লার, বাহার, ভীমপলশ্রী, বাগেশ্রী, বারোঁয়া, ঝিঁঝিট, কাফি, টোড়ি, দেশ, ইমনকল্যাণ, মেঘ, পঞ্চম, নটনারায়ণ, শ্রী, বসন্ত, গৌড়মল্লার, কানাড়া, খট প্রভৃতি শুদ্ধ রাগের উল্লেখ দেখা যায় তাঁর গানে।

অতুলপ্রসাদ সেন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন, কাজরী, লগনী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, হোলি, রামপ্রসাদী মালসী এবং স্বদেশী প্রভৃতি সকল প্রকার গীতাবলীই সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির কৃতিত্ব অসাধারণ। যে গানে যে জাতীয় ভাষার প্রয়োজন এবং কথার সঙ্গে যে জাতীয় সুরের মিলন ঘটলে, রাগসংগীতের রূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হবে, কবির অনুভূতি-প্রখরতায় সেই কৌশল ধরা দিয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং তার পাশাপাশি ঘেঁষে চলেছে যে-যে সংগীত, এর প্রত্যেকটিরই স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য তো রয়েছেই, বরং ভাব ও ভাষার চমৎকারিতায় তাকে আরো করে তুলেছে মনোরম। এমনি কীর্তনে ও বাউলে অভাবনীয়রূপে বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। এই জাতীয় গানগুলির মধ্যে তাল, চলনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও বহু রসের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে, হিন্দুস্থানী সংগীতের যত প্রকার ধারা আছে, তার কোনোটিই কবির লেখনী থেকে বাদ পড়েনি। শুধু তাই নয়, সুসাহিত্যস্পর্শে হিন্দুস্থানী সংগীতের উর্ধ্বেই স্থাপিত করেছেন কবি তাঁর কাব্যগীতিকে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ঢাকা জেলায় কবি জন্মগ্রহণ করেন।

ভৈরবী

তাহারে ভুলিবে বল কেমনে ?
গাঁথা যে সে তব শত গানে,
যতনে !

কি হ'বে রুধিয়া দোর,
ভাঙ্গা যে হৃদয় তোর,
মানিবে না মনচোর
বাহিরের বারণে !

যাবি কোন্ দূর বিজনে
পাসরিতে সেই জনে ?
সেথাও তো গাহে পাখী
কাননে।
সেথাও তো ফোটে ফুল,
বরষা বিরহাকুল,
সেথাও তো ওঠে চাঁদ
রজনীর গগনে।[২০]

মিশ্র খাম্বাজ।

বল, বল, বল সবে শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।[২১]

কাজী নজরুল

একই প্রকৃতির কোলে মানুষ বড় হয়ে ওঠে এবং একই প্রকৃতির বুক থেকে বস্তু আহরণ করে, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতকার করে থাকেন

২০ গীতিগুঞ্জ। অতুলপ্রসাদ সেন। পৃঃ ১০৩
২১ ঐ ঐ পৃঃ ৮১

শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টি। কিন্তু প্রত্যেকটিরই রূপ প্রকাশিত হয় ভিন্ন-ভিন্নভাবে। কেননা প্রত্যেকেরই জীবনের ধারা স্বতন্ত্র। যিনি যেমন পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠেন, তাঁর লেখায়, সংগীতে, শিল্পে সেই জাতীয় প্রকৃতির ছাপ পাওয়া যায়। কেউ বা সুখ, শান্তি, সচ্ছলতা ও পরিপূর্ণ ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে, সংসারের শান্তিময় পরিস্থিতিতে, এবং সর্বরকম প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায়, জীবনের প্রথম থেকে শুরু করে শেষ সোপানে গিয়ে পৌছান। আবার কেউ বা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ও সুখশান্তিবিমুখ হয়ে, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় জীবনযুদ্ধে, ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ছন্নছাড়া জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেন অতিকষ্টে। অনেকে বা মুষড়ে পড়েন ভেঙে, আত্মসমর্পণ করেন প্রকৃতির কাছে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নিতে প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে। তাই কারো কারো সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে, প্রতিফলিত হয় ভাঙা মনের সকরুণ ছবির প্রতিচ্ছবি এবং প্রবাহিত হয় করুণ আবেদনের স্রোতোধারা। কিন্তু বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জীবনযাত্রা চলেছিল একটানাভাবে প্রকৃতিরই সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাই তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের প্রধান সুরই হ'ল বিদ্রোহাত্মক।

কাজী নজরুল ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সংগীতকার এবং সুরস্রষ্টা। রাগসংগীতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাই বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের উপর অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। এর থেকে তাঁর স্রষ্টার ও স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থিতিহীন বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবন, তাই তাঁর সাহিত্য ও সংগীতে শান্ত সমাহিতের ধীরাবেশ নেই, আছে চঞ্চলতার অনাবিল গতি, দুর্নিবার দম্ভোলির দীপ্তি, উল্কার বেগ এবং ঝরনার মুখরতা। তাই মুখর কবির লেখনী বন্ধ হয়নি কোনোদিন কোনো বিপর্যয়ের বিভীষিকায়। বৈদেশিক শাসনের উদ্যত দণ্ডবিধানের সম্মুখীন হয়ে, কারাদণ্ড বরণ করেও তিনি

নিবৃত্ত হননি লেখার মাধ্যমে বাংলাকে স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করতে। শত দুঃখদৈন্য সহ্য করেও, সাহিত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়ে কবি বৈদেশিক শাসনের দুর্নীতি ও অত্যাচারী পরবিত্তাপহারী ধনী বণিক্ সম্প্রদায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। অনাহারে ও অনিদ্রায় এমনকি কারাবাসে শৃঙ্খলিত অবস্থায়ও তিনি নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। সেখানে থেকেও তিনি লিখেছেন উদ্দীপক বিদ্রোহসংগীত—

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।[২২]

এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল।
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙ্গা কল॥[২৩]

বহুমুখী প্রতিভায় প্রতিভান্বিত কবি নজরুল ইসলাম প্রথম

২২ ভাঙ্গার গান। কাজী নজরুল ইসলাম। পৃঃ ১
২৩ বিষের বাঁশী। কাজী নজরুল ইসলাম। পৃঃ ৪৫

জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সময়োপযোগী বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও সংগীত রচনা করে এবং জনচেতনার নিমিত্ত সভাসমিতিতে ঐ সমস্ত উদ্দীপক সংগীত গেয়ে। "মিশুক স্বভাবকবি সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশতেন আপন পরিবারের মতো এবং তাঁর পরদুঃখকাতর হৃদয় সব সময়ই অনুভব করত নিপীড়িতের বেদনা দুঃখ কাতরতা। তাঁর সংগীত কিন্তু প্রধানত তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, সৌন্দর্যপিপাসু কবি-মনের রচনা। এখানে তাঁর উগ্র বিদ্রোহাত্মক মনোভাব এক মধুর, আত্মলীল অনুভূতিতে শান্ত হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি, প্রেম, ধর্মাকূতি বিষয়ক বিভিন্ন সংগীতে সূক্ষ্ম কারুকার্য, সুরের বিচিত্র লীলা ও অনুভূতির কোমল স্পর্শ প্রাধান্যলাভ করেছে। কবির জীবনও যেমন চঞ্চল, তাঁর কবিতার ছন্দোগতিও তেমনি চঞ্চলতা-পরিপূর্ণ। ধারাবাহিকভাবে চলেনি কখনো তাঁর রচনার সুর, এ বিচিত্রভাবে বিচিত্র রসে প্রকাশিত হয়েছে অগণিত মনের অনুভবগম্য রূপবৈচিত্র্য নিয়ে। উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধেও কবি ভেবেছেন অনেকখানি। তাই মানুষের উপযোগী করে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর সংগীতকে, তাল-বিচিত্রতায়, সুরলীলায়, ছন্দচটুলতায় এবং নবনিপুণতায়। সেজন্য একসময় নজরুল-গীতিকাব্য সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে উঠেছিল নির্জন গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে এবং জনকোলাহল মুখরিত নগরে নগরে। প্রকৃতির পরিহাসে আজ সেই মুখর কবি নীরব। আজ আর তাঁর মুখে ভাষা নেই, লেখনী আর চলে না নব নব সৃষ্টির পথে সম্মুখের পানে। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর পরিহাস বাঙালীর একটি জ্যোতির্ময় প্রতিভাকে নিষ্প্রভ নিশ্চল করে, বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অন্ধকারে পরিণত করেছে। তবুও কবি বাঙালীকে সংগীত ও সাহিত্যের যে প্রভূত সম্পদ দিয়ে গেছেন, তাই নিয়ে বহুকাল আনন্দে বেঁচে থাকবে বাঙালী জাতি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুল

জন্মগ্রহণ করেন। নজরুল ইসলামের গানে মান্দ্, মিয়াকিমল্লার, পিলু, ভৈরবী, রামকেলি, মালকোষ, ভীমপলশ্রী, মুলতান, দুর্গা প্রভৃতি শুদ্ধ রাগ, এবং খাম্বাজ গারা মিশ্র, পিলু খাম্বাজ, মিশ্র বেহাগ তিলক কামোদ খাম্বাজ, দেশপিলু, বেহাগ বসন্ত, তিলককামোদপিলু, ভৈরবী আশাবরী ভূপালী, দুর্গামান্দ্, মিশ্র কানাড়া প্রভৃতি মিশ্র রাগের সন্ধান পাওয়া যায়। কার্ফা, দাদ্রা, ঠুংরী, তেওড়া, একতাল আদ্ধা কাওয়ালী প্রভৃতি তালেরও সমাবেশ দেখা যায় তাঁর সংগীতে। এছাড়া তিনি কাজরী, গজল, কীর্তন এবং বাউল প্রভৃতি গানও রচনা করেছেন।

মালকোষ-তেওড়া

II { সা জ্ঞা জ্ঞা । সা া । দ্ া ণ্ া I সা সা সা । সণ্ া মা । মা া } I
গ র জে গ ম্ ভী র গ গ নে ক ॰ ম্ বু ॰

[র্সা র্সা ণা দা দা মা]
{ মা মা মা । মজ্ঞা া । জ্ঞা-জ্ঞমা I দা দা ণা । দণা -র্সা । র্সা -া } II
না চি ছে সু ॰ ন্ দর ॰॰ না চে স্ব য় ॰ ম্ ভূ ॰

II { মা মা মা । মজ্ঞা -া । জ্ঞা মা I দা দা ণা । দণা-ণর্সা । র্সা র্সা I
সে না চ হি ॰ ল্ লো লে জ টা আ ব ॰ র ॰॰ ত নে
ঝাঁ পে নী লা ॰ ঞ চ লে মু খ দি গ ॰ ঙ্ ॰ গ ণা

ণা ণা ণা । দা দা । দা দমা I দা দা ণা । দা-ণা । ণা ণা } I
সা গ র ছু টে আ সে ॰ গ গ ন প্রা ঙ্ গ ণে
মূ র ছে ভ য় ভী তা ॰ নি শি নি র ঞ জ না

র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্মা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্সা র্সা I
আ কা শে শূ ল হা নি শো না ও ন ব বা ণী

পা পা পা । পদা পদা । মা মা I জ্ঞা মা জ্ঞা । মা পা । পা -া II
ত রা লে কাঁ॰ পে॰ প্রা ণী প্র ণী দ শ ম্ ভু •

II {সা সা সা । ণ্া ণ্া । দ্া দম্া I জ্ঞা মা দা । দ্া ণ্া । ণ্া ণ্া I
ল লা ট শ শী ট লি॰ জ টা য়্ প ড়ে ট লি

সা সা সা । সা জ্ঞা । সা সা I ণ্া সা ণ্া । দ্া ণ্া । সা সা} III
সে শ শী চ ম কে গো বি জ লী ও ঠে ঝ লি

II র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্সা মা র্মা । র্মা র্মা । র্মা র্মা I
আঁ ধা রে প থ হা রা চা ত কী কেঁ দে সা রা

মা মা মা । জ্ঞা জ্ঞা । সা সা I ণ্া সা জ্ঞা । মা পা । পা । III
যা চি ছে বা রি ধা রা ধ রা নি র ম্ বু •

তৃতীয় খণ্ড

সংগীতের বিভিন্ন ধারা

বাউল সংগীত

বাঙালী সমাজজীবনের, কর্মজীবনের এবং ধর্মজীবনের গতানুগতিক ধারার একটি বিশিষ্ট রূপ পরিলক্ষিত হয় নৃত্য, গীত, শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, চাষী, ব্যবসায়ী সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই অধ্যাত্মজীবনের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়ভেদে নানারূপ সাধনপ্রণালীও দেখা যায় বাংলা সমাজের বাঙালীর মধ্যে। এর মধ্যে বাউল একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন ও জীবনযাত্রাপ্রণালী অন্য সকল সম্প্রদায় থেকে একেবারে ভিন্ন। নেই এদের জাতিবিচার, নেই এদের আপন-পর ভেদাভেদজ্ঞান, নেই এদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিরোধ, নেই এদের ঘরের ঠিক-ঠিকানা। সব ঘরই এদের ঘর, সব ঠাঁই এদের ঠাঁই, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এদের আত্মীয়, সবাই এদের আপন, যাযাবরের মতো স্থিতিহীন জীবনযাত্রা প্রায় পথে পথে চিরদিনই চলে এসেছে। বাউরী অর্থাৎ পাগলের মতোই এদের চলন-বলন ও ভাবভঙ্গি। এর থেকেই বোধ হয় বাউলী অর্থাৎ বাউল নামে অভিহিত হয়েছে এই সম্প্রদায়।

এদের সাধনা, এদের সংগীত প্রায় তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, তান্ত্রিক সংগীত ও বৈষ্ণব সংগীতের মাঝামাঝি বলে মনে হয়। তবে তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য নাথপন্থীদের পন্থা অবলম্বন করেই এই সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে বলা চলে। তান্ত্রিক যোগীদের ষট্‌চক্রভেদাদির রীতি এরাও নিয়েছে অনুরূপভাবেই। দেহজগতের মধ্যে বিশ্বজগৎকে স্থাপিত করে, বিশ্বাত্মার অবাঙ্‌মনসোগোচর, নিরাকার, নির্গুণ এবং

সাকার সগুণের মিলনক্ষেত্র পরিকল্পনা করে, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অনুভূতির অতীত, ঈশ্বরের অসীম গুণাতীত অবস্থাকে সগুণ পঞ্চ-ভৌতিক দেহসীমানায় পুরুষপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্ররূপে রচনা করে, এরা জীবনমৃত্যুর চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে চির-মুক্তির চিরাবচ্ছিন্ন আনন্দের নিমিত্ত। এরা বলে থাকে যে, ঘরামি যেমন ঘর ছাড়া বাস করে না, তেমনি ভগবান এই দেহ-ঘরকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও থাকেন না। দেহের মধ্যে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে জাগাতে হবে দৈহিক প্রক্রিয়ায়, কথাবার্তায়, আচারে অনুষ্ঠানে, সংগীতে অর্থাৎ প্রকৃতির গতিবিধির উলটো পথে। তাই এর এক নাম হয়েছে উলটা সাধন।

এই সংগীতের ভাষা, ভাব সবই আধো আধো। বাউল সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের সাধারণ লোক প্রায়শঃই এই সমস্ত ভাব ও ভাষার নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। এই গানগুলিও নাথ-যোগীদের ভাব ও ভাষারই ইঙ্গিত দেয়। এই সব গানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এ অতি সাধারণ সরল ভাষায় রচিত এবং সাধারণ সংসারের কথাবার্তা নিয়েই এর প্রকাশ; তা হলেও এর অন্তরে লুকোনো রয়েছে একটি অধ্যাত্ম এবং দেহতত্ত্ব -বিষয়ক বিশিষ্ট রূপ। সেটি ধরা পড়ে শুধু সাধক সম্প্রদায়েরই চোখে। সাধারণ লোকচক্ষে এই গানগুলি হেঁয়ালি ও পাগলামি বলেই মনে হয়। কেননা এই সংগীতের অন্তরের রূপ বাইরে প্রকাশিত হয় না। যেমন—

যেমন বেণী তেমনি রবে
　　চুল ভিজাব না।
জলে নামব জল ছড়াব
　　জল তো ছোঁব না।
এধার ওধার সাঁতার পাথার
　　করি আনাগোনা

জলে ডুব দিব
কাউরি কথা শুনব না।
ভোগ লাগাব
ভুখে মরব না
রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাড়িব
তবু আমি হাঁড়ি ছোঁব না।
গোঁসাই রসরাজে বলে
শুন গো নাগরি
রূপে সই বলিহারি
হব না সতী
না হব অসতী
তবু আমি পতি ছাড়ব না।

সাধারণ অর্থ ধরতে গেলে এটি পাগলামি বলেই মনে হয়। কেননা সাঁতার কাটতে হলে চুল ভিজবেই, রান্না করতে গেলে হাঁড়ি ছুঁতে হবে, তবে এই কথার সংগতি কোথায়? কিন্তু বাউল বলতে চেয়েছে অতি কঠোর সাধনার কথা। রাজর্ষি জনক যেমন রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেও, বিলাসসম্ভোগ এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছেন সংসারের সুখদুঃখাদি থেকে, তেমনি বাউলের এই সংগীতের বক্তব্য হচ্ছে যে, সংসারে থেকেও সকল আসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। বাসনা কামনা প্রভৃতির মধ্যে থেকেও সব থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হবে।

এই ভাবধারা, এই দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম -বিষয়ক বাউল সংগীত বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলাদেশে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে এই আধ্যাত্মিক সংগীতের ধারা। চর্যা, নাথগীতিকা, বৈষ্ণবসাহিত্য সবাই বহন করে চলেছে এই ধারাকে। এই বাউল সংগীত শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও ছিল বলে মনে হয়। রসে, তত্ত্বে, ভাবে, ভাষায়,

সংগীতে, সুরে, সাহিত্যে বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ এই বাউল সংগীতের অবদান বাঙালীর সমাজজীবনে কারো চাইতে কম নয়। কেননা দারিদ্র্যনিপীড়িত এই বাঙালী জাতি আজও বেঁচে আছে একমাত্র অধ্যাত্মরসসমুদ্রের চিরানন্দরূপী রসামৃত পান করে। বাংলাদেশে বহু বাউল কবির সন্ধান পাওয়া যায়। একসময় এই সাধনতত্ত্ব, এই সাধনসংগীত কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়েরই নরনারী মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল নির্বিচারে। এই বাউল গীতিকবিতার বিশিষ্ট কবি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাউল কবিদের মধ্যে লালন ফকীরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকা জেলার শানাল ফকীর এবং কলা-কোপার বলাই ক্ষেপার নাম বেশ পরিচিত। তাঁদের রচনা গভীর এবং মরমী। শিরাজ সাঁই লালন ফকীরের গুরু। তাঁর রচনার গভীরতা, কবিত্ব এবং রস-ব্যঞ্জনা বিস্ময়কর। উভয় বঙ্গের অপর প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে গঙ্গারাম বাউল, বাঙালী বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন, মেছেলচাঁদ, পাগলা কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বাউল সংগীত বাউল গুরুদের শিষ্যপরম্পরায় গীত ও প্রচলিত হয়ে এসেছে চিরকাল।

এই সম্প্রদায় অশিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত হলেও, এরা চরম শিক্ষা-প্রাপ্ত পরম বৈদান্তিকের জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করেছিল মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিচেতনার মাধ্যমেই। মানুষ ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মধ্যেই তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাই মানুষ জন্ম থেকেই জানতে চেয়েছে অজানাকে, চিনতে চেয়েছে আপনাকে, অগ্নি থেকেই যে অগ্নিকণা সেকথা সে ভোলেনি। বহু জন্মান্তরের জন্ম-মৃত্যুর সংঘাতেও সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি সম্পূর্ণরূপে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। তাই সে যখনই পেয়েছে দৃষ্টি, ফিরে তাকিয়েছে পিছনের পানে, খুঁজে নিয়েছে পথ, আত্মচেতনায় দিয়েছে মন,

চলেছে সে অমৃতের সন্ধানে। মৃত্যুকে সে ভয় পায়নি, মরণকে সে এড়িয়ে যেতে চায়নি, সে চেয়েছে মৃত্যুর যবনিকা উদ্‌ঘাটিত করে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের পুত্র অমৃত হতে। তাই দেহভাণ্ডে অবস্থিত সহস্রার অমৃতধারা পান করতে উদ্‌ভাবিত করেছে, দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তিনটি নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অবিরল অমৃতধারা গঙ্গাযমুনা সরস্বতীর মতোই। সেই সহস্রার নিম্নগামী ধারাকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতেই মানুষের এই চেষ্টা চলেছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চিরঞ্জীবী হওয়ার নিমিত্ত। তাই তো তার বুদ্ধি-বৃত্তি, চেতনাশক্তি পদে পদে দেয় তাকে বাধা, বিপথগামী সে যেন না হয়। সে চলতে শিখেছে, বলতে শিখেছে, দেখতে শিখেছে, নিতে শিখেছে, দিতে শিখেছে, তাই তো সে মানুষ। তাই তো মন তাকে নাড়া দিয়ে বলে, সে যে মানুষ, সে যে সেই পরম পুরুষ। তাই মানুষ বলে উঠেছে—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এ যে পরম সত্য। তাই পরম পুরুষের চিরসত্তা মানুষ উপলব্ধি করেছে মানুষের মধ্যে। তাই বাউল খুঁজেছে মনের মানুষকে মনের মধ্যে, খুঁজেছে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে নয়, নিজ অন্তরের অনুভূতির আলোকে। ঈশ্বরসত্তা উপলব্ধি করেছে জীবাত্মায়। তাই নিজেকে সচেতন রাখবার জন্য গানে গানে বলেছে যেন যোগসূত্র হারিয়ে না যায়, ছিন্ন হয়ে না যায় আত্মচেতনার গ্রন্থি, চ্যুত হয়ে না পড়ে মানুষের ধর্ম থেকে। মনের মানুষের এই তত্ত্ব যদিও প্রথম বাউল কবির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি ও তারা এটা নাথযোগীদের কায়সাধনা ও তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র থেকে আহরণ করেছে, তথাপি তারা এর মধ্যে যেটুকু প্রাণের আবেগ সঞ্চার করেছে ও বাঙালীর নিজস্ব সাধনা-ক্রমের সঙ্গে একে মিলিয়ে দিয়েছে, তার জন্য এরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অধিকারী। তাই তো দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে উপযাচকের মতো গেয়ে বেড়িয়েছে এই বাউল গান, শুনিয়েছে আত্মচেতনার বাণী—

আমার হয় না কেন মনের মত
আমি সাধব কবে সেই রাগের কারণ।
পড়ে রিপু ইন্দ্রের জালে, মন বেড়াচ্ছে ডালে ডালে,
ও সেই দুই মন, এক মন হয়ে এড়ায় শমন।
রসিক ভক্ত যারা, গুরু মনে মন মিশাল তারা।
ও যে শাসন করে তিনটা ধারা পেলো রতন।
কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে সেই অমৃতরস,
সিরাজ শাহ বলে বিষেতে নাশ হলি লালন।[১]

তাই আজও বেঁচে আছে বাঙালীর অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাব, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক রীতি, ধর্মভীরুতা, প্রেমপ্রগাঢ়তা, রসপিপাসা, ভাববিহ্বলতা, জ্ঞানোজ্জ্বলতা—চিরোদ্ভাসিত সূর্যকিরণের মতোই। তাই বাউল গান ভাবব্যঞ্জনায়, কাব্যপ্রতিভায়, রসমাধুর্যে, জ্ঞানগভীরতায় বাঙালীর বাংলা সংগীতের রত্নখনি বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই রচনার যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, এর সুরেরও তেমনি স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তাই বাউলরা যখন বাউলসংগীত গান করে, ভাবুকতায় তারা জগৎকে ভুলে যায়, সংসার-বৈরাগ্যের ভাব তাদের গানের মধ্যে ফুটে ওঠে উজ্জ্বলরূপে। শ্রোতারাও ভুলে যায় বাহ্যিক জগতের কথা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে, বাউল-সংগীত তাঁর প্রাণে এক আলোড়ন তুলে চিরাবচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। বাউলসংগীত সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই

১ হারামণি। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ.। পৃঃ ২১। গান সংখ্যা ৩২

আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল

'কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।'

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ'—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা —অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর— তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। অন্তরতর যদয়মাত্মা উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' ব'লে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক-সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করি নে।"[২]

---

২ হারামণি। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ.। আশীর্বাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ।৶৹-॥৹

বাউলসংগীত ভাবপ্রধান। মনের ভাবের উপযুক্ত সুর বাউলরা প্রবর্তন করল। তারা একতারা যন্ত্রের সাহায্যে, নৃত্যের ভঙ্গিতে এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে গান গায়। বাউলের নৃত্যে ছন্দ এবং তালের বৈচিত্র্য অর্থাৎ তালফেরতা রয়েছে। সাধারণতঃ ফিকিরচাঁদ ফকীরের রচিত সুরে যে-সব বাউল গান গাওয়া হয়, তাদের "ফিকিরচাঁদি" সুর বলা হয়। "ফিকিরচাঁদি" একপ্রকারের গীতরীতি। "ফিকিরচাঁদি"র মধ্যে প্রায়শঃ বিলাবল পর্যায়ের রাগের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়।

"বাউলের প্রধান লক্ষ্য কথার ছন্দোবদ্ধ সহজ গতি। তাই অন্যান্য লোকসংগীতের তুলনায় বাউল গান ছন্দোবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধহয় বাউলদের নৃত্যের আবেগ। ভাবের আবেগে যখন তারা নেচে ওঠে, তখন সে উন্মাদনার জন্যে সে রকম ছন্দের প্রয়োজন হয়।"[৩]

কবিগান

তরজার খানিকটা রূপ নিয়েই কবিগানের সৃষ্টি হয়েছিল। ধারাবাহিক-ভাবে বাঁধা ছড়ার সাহায্যে সভায় প্রশ্নোত্তরে যে কথার কাটাকাটি, সেটিই কবিগান নামে অভিহিত হয়েছিল। অনেকে বলেন, এর নাম দাঁড়া-কবি, যেহেতু কবি দাঁড়িয়ে গান করেন। কারো মতে "দাঁড়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পদ্ধতিরই পরিবর্তনে। আমার মনে হয়, কবিগান-রচয়িতা কবিগণ পূর্বে কবিদার বলে অভিহিত ছিলেন এবং এর থেকেও "দাঁড়া-কবি" আসা অসম্ভব নয়। কবিগানের বিশেষত্ব এই যে, দুই দলের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। একটি দল পুরাণাদিবর্ণিত কাহিনী কিংবা নিজের বুদ্ধিপ্রণোদিত কূট প্রশ্ন প্রস্তুত করে, সেটি অপর দলের কবির উপর ভার চাপানোর মতো চাপিয়ে দিত। অপর দলটি তার উত্তর দিত বটে, কিন্তু ধোঁকা

৩ রবীন্দ্রসংগীত (বাউল গান)। শান্তিদেব ঘোষ। পৃঃ ১৯৫

দেবার মতো ঠিক প্রকৃত উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারাদিন সারারাত ধরে যাতে লড়াই চলতে পারে, তার একটি পথ বার করে, তেমনি গোছের একটি ভুল উত্তর প্রথমে দিত। পরে হ'ত মীমাংসা। ঐ দলের মধ্যে অনেক নিরক্ষর কবি ছিলেন। কিন্তু কবিগানের আসরে তাঁদের সে নিরক্ষরতা প্রমাণিত হ'ত না। কেননা ভগবৎকৃপায় স্বয়ংসিদ্ধের মতো তাঁরা লাভ করতেন এমনি কাব্য-প্রতিভা, যা থেকে তাঁদের রচনায় ফুটে উঠত প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয়। কিন্তু এই পুরাণাদিবর্ণিত ঘটনাবলী তাঁদের শুনতে হ'ত শিক্ষিত সমাজের লোক, না হয় সুপণ্ডিত কথকদের কাছে।

এই কবিগানের একটি ধারা ছিল। প্রথমে হ'ত বন্দনাগীতি। তা গুরু-বন্দনাই হোক, কিংবা কোনো দেবদেবীকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তার বিষয়ে গান করাও হতে পারে। পরে আরো কয়েকটি বিষয়ে গান হ'ত, যেমন—সখীসংবাদ, গোষ্ঠ, বিরহ, খেউড়। এর প্রত্যেক বিভাগেই দুটি করে প্রধান গান থাকত এবং ছোট গান হ'ত "টপ্পা"। প্রধান গানে থাকত "ধুয়া" ও "চিতান" (বা দীর্ঘতর "পরধুয়া")।

মূল কবিরা প্রধানতঃ সহজে আসরে আসতেন না। আড়াল থেকেই শাক্‌রেদদের নির্দেশ দিতেন, কোন্ কোন্ গানটি পর পর গাওয়া হবে। তারপর এক কবি এসে যখন "চাপান" দিতেন, তখন অন্য কবি তার উত্তরের জন্য আসরে অবতীর্ণ হতেন। এর খেউড় অংশটি খানিকটা অশ্লীল ছিল। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ কবিরা বসাতেন এবং তার মধ্যে এমন নিগূঢ় ভাব নিহিত থাকত, যার থেকে একটি সদর্থও বেছে নেওয়া যেত। কবিদের এমনি প্রতিভা ছিল যে, তাঁরা পৌরাণিক উপাখ্যানের এক-একটি করুণ রসাত্মক গল্প নিয়ে উপস্থিত মতে সভায় সুন্দর সংগীত রচনা করে গান করতেন। সে গান শুনে জনসাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে পারত না। কখনো কখনো এক

কবি অন্য কবির চরিত্রগত কিংবা বংশগত দোষ অবগত হয়ে, সেটিই সভাস্থলে উত্থাপন করে অপর পক্ষের কবিকে অবমাননা করতে চাইতেন, কিন্তু কবিবুদ্ধি এমনই প্রখর যে, অপর কবির দোষ চাপানোর পূর্বেই তিনি একটি দ্ব্যর্থবোধক গান রচনা করে আসরে পরিবেশন করতেন। পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালি-পাড়া নিবাসী শশী কবিদার নামে কবিগানের একজন বিশিষ্ট কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির, কিন্তু এঁর বংশপরিচয় ছিল হীন। লোকে এঁকে বারবনিতার সন্তান বলেই জানত এবং পিতা সম্বন্ধে নগরবাসী নামে একজন লোকের ইঙ্গিত করত। প্রতিপক্ষের কবিগণ এই সুযোগটি প্রায়শঃই নেবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু বুদ্ধিমান কবি শশী কবিদার পূর্বেই একটি গান রচনা করে সেই ইঙ্গিত থেকে নিজেকে মুক্ত করতেন। সেই গানটি এই—

বাপ আমার নগরবাসী
মা আমার গ্রামবাসী
(আমি) অকলঙ্ক পূর্ণ শশী
বিশ্ববাসীর আশীর্ব্বাদী ফুল।

কবিপ্রতিভার এমনি নিদর্শন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বাংলাদেশের সর্বত্রই মেলে।

প্রথমে এই কবিগান গাওয়া হ'ত শখে। কবিগণ গান গেয়ে কোনো অর্থাদি নিতেন না। কেবলমাত্র একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ত। যে দলের কবি কাব্যযুদ্ধে জয়লাভ করতেন, তিনিই তাঁর দলসহ সেই পুরস্কারটি প্রাপ্ত হতেন। শেষের দিকে যদিও এই রীতি ছিল না, কেননা আর্থিক অনটনের জন্যই কবিগণ বাধ্য হতেন অর্থ গ্রহণ করতে। এর কারণ, কবির দলে যাঁরা গান গাইতেন, তাঁরা

প্রায়ই দরিদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর লোক ছিলেন। কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে জয়নারায়ণের কাব্যে কবিগানের যে নমুনা আছে, সেটি প্রাচীনতম। তার নমুনা দু-একটি এখানে দেওয়া হ'ল—

তিনরাত্র কবি গায় দুদল হইয়া। হারিজিত শব্দগুণে শুন মন দিয়া। গোপীতে করিল সৃষ্টি কবির কীর্তন। অদ্যাবধি সেই গান করে নরগণ॥ ১৩॥ দশমীতে লীলা ভঙ্গ করি ব্রজরায়। করেন নূতন লীলা ভক্ত জনে গায়॥ ১৪॥ গুরুদেবের গীত চন্দ্রাবলীর দলের॥ রাগ তাল কবির॥ মন মজিলে নারে কেনে গুরু চরণে॥ ধুয়া॥ ॥ দশ শত দল কমলেতে যার বসতি অতি গোপনে। জনম সফল কর একবার নিরখ শ্রীনাথ জ্ঞান নয়নে॥ চিতান॥ অজ্ঞান অন্ধের সুজ্ঞান অঞ্জন কে হেন এ তিন ভুবনে। প্রভু দয়াময় করে বরাভয় বিতরে করুণা কাতর জনে॥

... ... ইতি গুরুগীত সাঙ্গ॥

॥ টপ্পা॥ দিন গেল রে অসাধনে॥ ধুয়া॥ ॥ আর মূঢ় মন ভ্রমিছ কি কারণে শরণ মনন না করিলে ধ্যান শ্রীনাথের শ্রীচরণে॥ টপ্পা সাঙ্গ॥ ॥ কামকলা সখীর দলের গীত॥ রাগ তাল কবির॥ আগের গীতের উত্তর॥ ঐ দেখ গুরু বসিয়াছে রমণী বামে করিয়া পঞ্চ পঞ্চ শত কমল আসন বৃন্দাবন অতি বিপিনে যে কৃষ্ণ সে রাধা পূরায় মনের সাধা দেখহ যুগল নয়নে ভরিয়া॥ চিতান॥

... ... ॥ টপ্পা॥

ঘুচিল সকল মনের জ্বালা অভয় পদ হেরিয়া। আমার হরি কল্পতরু গুরুরূপ ধরিয়া॥ ১॥ ॥ চন্দ্রাবলীর দলের সখীসংবাদ॥ রাগ তাল কবির॥ দেখ দেখি সখী কেমন সাজাইয়াছি যুগলে নিকুঞ্জে আনিয়া॥ ধুয়া॥ ॥ জগতে মহিমা বাসন্তীপ্রতিমা সেরূপ দেখনা চিনিতে পার কিনা পার ভাবিয়া॥ চিতান॥ ... ...

টপ্পা ॥ বৃন্দাবনে কায নাই ঐ ব্রজের কানাই ও ধরিতে পারে অনেক রূপ বলিহারি যাই ॥ ॥ কামকলার দলের উত্তর সখী-সংবাদ ॥ রাগ তাল কবির ॥ সখি রে ও লুকাইতে নারে বাঁকা নয়ন ॥ ধুয়া ॥ ॥ কোথা যোগী হর লম্পট নাগর দেখ না চাহুনি-খানি ভুরূ কামান কষিয়া গোপিনীর প্রাণ বধিছে নয়ন বাণ ॥ চিতান ॥

... ... ॥ টপ্পা ॥

যতরূপ পারুক ধরুক তাহে নাহি ভাবনা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাখানি কভু মনে ছেড়ো না ॥ ॥ চন্দ্রাবলীর উক্তি বিরহ ॥ রাগিণী বেহাগ ॥ তাল কবির ॥ গোপিনীর প্রাণ মোমের সমান গলাইল সই বিরহ আগুন ॥ ধুয়া ॥ কোথা বাতিকর অন্বেষণ কর মনসূত দিয়া করিবে গঠন ॥ চিতান ॥ দ্বিতীয় বিরহ দেহ করে দাহ না মানে শীতল কি নীর কি চন্দন। আর দিতে দিতে হয় দ্বিগুণ ॥ ১ ॥ টপ্পা রাগিণী বেহাগ। তাল পশতো ॥ বুঝি কামকলা সতী হইল বাঁশের মোতি লাগিল যাইয়া মোতির যোড়া হইয়া সতীর পতি ॥ ॥ কামকলার উক্তি আগের বিরহের উত্তর ॥ রাগিণী ঝিঝট। তাল কবির ॥ পরধন পাইয়া সে ধন হারাইয়া কেনে কর এত খেদ ॥ ধুয়া ॥ ওহে চন্দ্রাবলী পরধনে কেলি। ইহার নিশ্চয় হয় একদিনে সে ধনেতে বিচ্ছেদ ॥ চিতান ॥ তপে নিজধন কর উপার্জ্জন সে ধনে বঞ্চিত নহিবে কিন্তু মধুকর যদি হও তোর আসক কলির আসবে। দিবানিশি যত ভৃঙ্গ যাতায়াত বিরহ মিলনে এ ভেদ ॥ ১ ॥ টপ্পা। রাগিণী ঝিঝট। তাল কবির ॥ সব কমলিনী প্রফুল্ল ধৈরযে থাক। একে একে মধু ভ্রমর খাইবে গুন্‌জরিয়া আসিতেছে ঐ চায়্যা দেখ ॥ চন্দ্রাবলীর দলের খেউড় ॥ রাগ তাল দক্ষিণি ॥ চন্দ্রবংশে জন্ম যার কলঙ্কে কি করে তার ভোজন গোয়ালা ঘরে জাতি পাতি

অতি ॥ ধুয়া ॥ কুমারী সহিত পুন যে করে পিরীত কামকলা করে তারে পতি। সাবাস সাবাস ওলো সতি ॥ চিতান ॥

... ...

টপ্পা। রাগ তাল ঐ। কামের কামিনী কাছে মানীর মান থাকে না। জগৎ মালিক হয় তবু তারে করে জয় ব্রজের মাঝে সেই তামাসা দেখ না ॥ ॥ কামকলা সখীর উক্তি ॥ আগের কবির উত্তর ॥ রাগ তাল কবির ॥ গরজে সকলি সহিতে হয় কুলটার বাণী ॥ ধুয়া ॥ ॥ যাবৎ না জানে লোকে, লোকে সতী বলে তাকে কেবা জানে ছিনাল কাহিনী ॥ চিতান ॥ অধো দেশ বাকী কার রাখিয়াছে ব্রজের নীলমণি। একে একে বল দেখি সত্য কথা ধনী ॥ যাচিয়া যৌবন দিয়া এখন কর ঠেস্বাখানি ॥ ১ ॥[৪]

এই কবিগানের শেষের দিকটির জন্য সভাসদ্‌গণ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। কেননা তখন উভয় পক্ষেরই কবিদ্বয় একত্রে অবতীর্ণ হতেন আসরে। একটি ধুয়া ধরে দুই পক্ষের কবির মধ্যে চলত লড়াই এবং বহু কঠিন কঠিন ছন্দে ছড়া রচনা করে উভয় কবিই উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হতেন। অতি ক্ষিপ্রগতিতে সুছন্দ সমন্বিত, সুরসংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ মিল তাঁরা ছড়ার মধ্যে আনতে পারতেন এবং তা সাধারণ লোকের ধারণাতীত। উভয় কবির মিলিত এই কাব্য-রসসৃষ্টি জনসাধারণের এমনকি সুপণ্ডিতদের কাছেও উপভোগ্য হ'ত। বাংলাদেশের কবিগান একটি নবপদ্ধতির নবরসায়ন গীতিকাব্য। এর থেকে জনসাধারণ এক নবরসের সন্ধান পেত, জ্ঞানাধিকারী হ'ত পুরাণাদি সম্বন্ধে এবং প্রচুর আনন্দ পেত কবিগানের পরিবেশে। এই কবিগান একসময় বাংলাদেশে বাঙালীর প্রতিটি উৎসব উপলক্ষেই

৪ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ৩৪২-৩৪৪

অনুষ্ঠিত হ'ত। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে, হাটে, বাজারে, মাঠে, সর্বত্রই হ'ত এই কবিগান এবং এখানে সম্মিলিত হ'ত ভদ্র অভদ্র সকল সমাজেরই জনগণ। পরে ভদ্রসমাজের বিবাহাদি উপলক্ষেও এই কবিগান পরিবেশিত হ'ত।

কবিগান-রচয়িতাদের মধ্যে নারীপুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গি, সকল সম্প্রদায়ের কবিই ছিলেন। কবিওয়ালা রামবসুর শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই প্রশংসনীয়। তিনি "বিরহ" ও "মানে"র গানে বহু পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক কবিওয়ালাদের মধ্যে ভবানী বেনে, নীলঠাকুর ও মোহন সরকার গান রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কবিওয়ালা এণ্টুনি ফিরিঙ্গি ছিলেন জাতিতে পর্তুগীজ। প্রসিদ্ধ শাক্ত কবিওয়ালা ঠাকুরসিংহ ও রামবসুর সঙ্গে কবিগানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুর এবং তাঁর চেলা ভোলা ময়রার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরুঠাকুরের রচনা অতি মধুর এবং বিরহবর্ণনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-কবি হিসাবে যজ্ঞেশ্বরীর নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিশিষ্ট কবিওয়ালাগণের মধ্যে কেষ্টা মুচি, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, গোঁজলা গুঁই, সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় রাসু ও নৃসিংহ, রঘুনাথ দাস, নীলমণি পাটুনি, মধুসূদন কিন্নর, উদয় দাস, পরান দাস, বলরাম কাপালী, গৌর কবিরাজ প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। গদাধর মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য বিংশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

যাত্রা

প্রথম যাত্রা শব্দটি এল দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা থেকে। তারপর অর্থ দাঁড়াল দেবতাদের উৎসব উপলক্ষে নাটগীতি, সবশেষে অর্থ হ'ল দেবলীলাত্মক কিংবা অন্যান্য কাহিনীময় নাটগীতি।

প্রথম যাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে। এর বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণলীলা এবং বিশেষ কাহিনী ছিল কালিয়দমন। এই কারণে যাত্রার নামান্তর হয়েছিল কৃষ্ণযাত্রা। পরে রামযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ভাসানযাত্রা ইত্যাদি নামান্তর ঘটল। তারপর এল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। ক্রমান্বয়ে অপরাপর পৌরাণিক কাহিনীও যাত্রাপালার মধ্যে স্থান পেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যাত্রার মধ্যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন খুব কমই ছিল। কেননা তখন অনেকটা থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রা শুরু হ'ল। তবে এই থিয়েটারী ঢঙের যাত্রার মধ্যেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্থান ছিল। প্রতি অঙ্কের শেষের দিকে কিংবা সাজসজ্জা নেবার বিলম্ব থাকলে জুড়িদের গান হ'ত। চার-পাঁচজন সুগায়ক আসরের চারদিকে দাঁড়িয়ে সভাসদ্‌গণকে শোনাতেন উচ্চাঙ্গের সংগীত। এঁরা বড় বড় তালে, শুদ্ধ রাগ-রাগিণী অবলম্বনে অথবা মিশ্র রাগ-রাগিণী সমন্বয়ে তানকর্তবসহকারে বেশ একটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। এ ছাড়া এর মধ্যে বিবেকের একটি অংশ ছিল, অর্থাৎ পরে কি ঘটবে এবং সেই কার্যের ভাল-মন্দ কি, এই সম্বন্ধে উপদেশবাণী গানে গানে বলে দিতেন বিবেক। এই বিবেকের গানও উচ্চাঙ্গ সংগীত। সে সময় যাঁরা এই যাত্রাগানের সুরযোজনা করতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন সুসংগীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোকা-ধোবার যাত্রা। পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলেও সভাসদ্‌গণ বসে থাকতেন লোকা-ধোবার গান শোনবার জন্য। এ ছাড়া পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত যাত্রা হ'ত, তার মধ্যে বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ ও চণ্ডীর অভিনয় যাঁরা করতেন, তাঁদের দ্বারা অতিসুন্দর শুদ্ধরাগ বা মিশ্ররাগের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করানো হ'ত। কাল সর্বভুক্, তাই কালধর্মে রুচির পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানের যাত্রায় সেই জুড়িদের গান একেবারে তিরোহিত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের পরিবর্তে এখনকার

যাত্রায় আধুনিক সংগীতের প্রভাবই বেশী। তবে বিবেকের গানের মধ্যে এখনো কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সংগীতের আভাস পাওয়া যায়।

কৃষ্ণযাত্রার আদিম রূপ আমরা পাই না। কৃষ্ণকমল ও গোবিন্দ অধিকারীর পূর্বে এই যাত্রা যে কেমন ছিল, তার কোনো নিদর্শন না থাকাতে এর আনুমানিক ছাড়া সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পাঁচালীযাত্রাকেই কালের দিক দিয়ে অগ্রবর্তিত্ব দিতে হচ্ছে। জয়নারায়ণ ঘোষালের "করুণানিধানবিলাস" কাব্যে এই নূতন পাঁচালীযাত্রা-গানের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই পাঁচালী-যাত্রায় গানের নিয়ম ছিল এই যে, একজন থাকতেন মূল গায়ক, অন্য কয়েকজন ধরতেন ধুয়ো, পরধুয়ো; অর্থাৎ পাঁচালী গানের প্রথম ছত্রটি ধুয়ো এবং দ্বিতীয় ছত্রটি পরধুয়ো। কখনো কখনো ছত্রের শেষের অংশ ধুয়োরূপেও ব্যবহৃত হ'ত। এই পাঁচালীযাত্রায় রাগ ও তালের উল্লেখ দেখতে পাই সুস্পষ্টরূপে। যেমন, জয়নারায়ণের পাঁচালীকাব্যের ধারা ছিল এইরূপ—

গীত পাঁচালি। তাল খেমটা॥ এখন আর কেমন কর্‍্যা বলিবে তোরা রাধা কলঙ্কিনী ॥ ধুয়া ॥ ॥ জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত। তাহা মুই কবো কত। অবিরত বলিতে লজ্জা পায়। পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত। নারীর চরিত্র যত। অভিভূত শুনিয়া সবাই। ঘরে ঘরে করে কানাকানি ॥ ১ ॥ গীতসাঙ্গ ॥ দোসরা গীত ॥ নারদ বাসুদেবের উক্তি ॥ রাগিণী ঝুমুর ॥ তাল খেমটা ॥ ॥ এই কলঙ্ক ভঞ্জনের কথা শুনি নারদমুনি ॥ ধুয়া ॥ ॥ বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অবণি ॥ পরধুয়া ॥ ॥ অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান। কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান। দেখা হইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড়পাণি ॥

॥ গীতসাঙ্গ ॥

বাসুদেবের গীত আরম্ভ ॥ রাগিণী সুহিনি ॥ তাল পশতো ॥ রূপ দেখিয়া অবাক হইল নারদের বাসু ॥ ধুয়া ॥ ॥ চরণতলে দেখ শত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পরধুয়া ॥ ॥ ঘুঙ্গুরু বাজে নূপুর বাজে অভয় দিছে আশু। চরণ কমল হেরি হইল উল্লাসু ॥

গীত মুনি উক্তি ॥ রাগ ভৈরব ॥ তাল চলতা ॥ কখন সে হরিপদ দেখিবে এ দীন ॥ ॥ ধুয়া ॥ ॥ পাইয়া চরণসুধা শান্ত হবে আশা ক্ষুধা নয়নচকোর তাহে হইয়া রবে লীন ॥ ১ ॥ হরিপদ মহাতরি হেরিলে যাইব তরি পার হব ভববারি আমি দীনহীন ॥ ২ ॥ সে পদ সুচারু ভানু পাপ নাশে মম তনু জপিব তাহার মনু ত্যজি পরাধীন ॥ ॥ গীতসাঙ্গ ॥[৫]

কৃষ্ণযাত্রা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের একটি অপূর্ব অবদান। এটিকে অনেকটা ঢপকীর্তনের সম্প্রসারিত অভিনেয় রূপ বলা যেতে পারে। ঢপকীর্তনে যেমন নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত গানে গানে, বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করতে যেমন নায়ক-নায়িকার রূপ পরিগ্রহ করতে হ'ত না, এমনকি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা কিংবা সখীদের উক্তি একই লোকের দ্বারা সম্ভব হ'ত, কৃষ্ণযাত্রায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় যে অবতীর্ণ হ'ত, সে কবিবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়েই শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় করত। শ্রীরাধা, বৃন্দাদূতী ও অন্যান্য সহচর-সহচরীদের অভিনয় যারা করত, তারাও তদনুরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হ'ত আসরে। তাই ঢপকীর্তনের চেয়ে কৃষ্ণযাত্রা সেকালের সমাজে লোকরঞ্জক হয়েছিল বেশী। কৃষ্ণযাত্রায় সংগীত ছাড়া কথারও প্রচলন ছিল বেশ। নায়ক-নায়িকা প্রত্যেকেরই কথার মধ্য দিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত এবং মাঝে মাঝে গান থাকত সে-কথার সূত্র রেখে। পদাবলী

৫ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ৩৪০-৩৪১

কীর্তনের মতো কৃষ্ণযাত্রায়ও দূতী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত।

কৃষ্ণযাত্রা-রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনাকৌশল পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত। তিনি কৃষ্ণযাত্রার অনেক পালা রচনা করে গেছেন। যেমন—রাই উন্মাদিনী, স্বপ্নবিলাস, মানভঞ্জন, সুবলমিলন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পালাই রচিত হয়েছে নিখুঁতভাবে। প্রত্যেকটি সংগীতরচনাই কাব্যরসমণ্ডিত ও যমক অলংকারের ছটায় ভরপুর। এর মধ্যে রাই উন্মাদিনী ও স্বপ্নবিলাসের রচনায় কবির অসীম কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

[রাগিণী মালকোষ। তাল খয়রা। কেহ কেহ
"একতালা" লিখিয়াছেন।]

যশোদা। ওরে রে দারুণ বিধি, তোর এ দারুণ বিধি,
বিধি হ'য়ে অবিধি করিলি, কেন দত্ত-অপহারী হ'লি।
ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি,
কৃপা করি দিলি হেন গুণনিধি,
দিয়ে দুঃখ নিরবধি, দুঃখিনীরে বধি,
কি বাদ সাধি নিধি হ'রে নিলি॥
কত শিবেরি সাধন, গৌরী আরাধন
ক'রে প্রাণভরা ধন, কোলে পেয়েছিলেম ;
পেয়ে ধনের মত ধন, মনের মত ধন,
কি দোষে সে ধন হারাইলেম।
বিনে কৃষ্ণ-ধন, আছে কার কি ধন,
জুড়াব জীবন, হেরিয়ে কি ধন,
আমার বাছাধন, জগৎ বাছা ধন,
কি ব'লে সে ধনে বঞ্চনা করিলি॥

ছিল তোর সনে কি বাদ, সেধে রে সে বাদ,
নিয়ে গোকুলের চাঁদ, মধুপুরে দিলি ;
আমার যত ছিল সাধ, না পূরিল সাধ,
সাধে কি বিষাদ ঘটাইলি।
যদি বল হরি হরিল অক্রূর,
বৃথা কেন মোরে, কহ এত ক্রূর,
বলি, তুই অতিক্রূর, হইয়ে অক্রূর,
সুখের রাজপুর শূন্য করিলি ॥[৬]

যদিও লোচন অধিকারী, শ্রীদাম দাস, সুবল দাস, পরমানন্দ, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন কিন্নর—এঁরাও কৃষ্ণযাত্রার লেখক হিসাবে প্রচুর প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তথাপি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর তুলনায় এঁদের রচনা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে। কৃষ্ণযাত্রায় যেমন ছিল পদাবলী কীর্তনাঙ্গের গান, তেমনি একটু নূতন পদ্ধতিতে খেয়ালের সঙ্গে কিছু কিছু গানও হ'ত। এতে ঢোল, খোল, তবলা, বেহালা, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হ'ত। টহরমল্লার, ভৈরোঁ, ঝিঁঝিট, মনোহরসাই, জয়জয়ন্তী, টোরী, আলাহিয়া, বেলোড়, খাম্বাজ, জংলাট, গৌড়সারঙ্গ, কালংড়া, সিন্ধুভৈরবী, বাগেশ্রী, মুলতান, বেহাগ, ললিত, ললিতযোগিয়া, ভৈরবী, দেবগিরি, প্রভাস, সুহিনীবাহার, গাড়া ভৈরবী, সুরট, সিন্ধুরা, বসন্ত, সিন্ধুমল্লার, লুমঝিঁঝিট, সুরটমল্লার, সিন্ধুপরোজ, বিভাস, যোগিয়া, মনোহরসাই ভাটিয়াল, মল্লার, গৌরী, অহংখাম্বাজ, রামকেলি, ভৈরোঁ ললিত, মালকোষ, সুরট যোগিয়া এবং বাহার প্রভৃতি রাগ এবং আড়া, তেওট, সোওয়ারি, আদ্ধা, রূপক, খয়রা, মধ্যমান, যৎ, একতাল, দশকুশী, পোস্তা, বড় চৌতাল, সুরফাঁক, ছোট চৌতাল, বরণখয়রা,

৬ কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী। দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৬৩-৬৪

লোফা, কাওয়ালী, তেতালা, ঝাঁপ, ছোট দশকুশি প্রভৃতি তালের উল্লেখ দেখা যায় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচনায়।

সুতরাং পাঁচালীযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে পার্থক্য এই যে, পাঁচালীযাত্রায় পাঁচালী প্রধান এবং যাত্রা আনুষঙ্গিক। কিন্তু যাত্রায় অভিনয় এবং সংলাপ—এরাই প্রধান। গান সংলাপের ফাঁক পূরণ করে মাত্র বা যেখানে আবেগ খুব ঘনীভূত হয়েছে ও শুধু সংলাপের ভিতর দিয়ে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়, সেখানেও সংলাপের পরিপূরকরূপে গানকে ব্যবহার করা হয়।

এই যাত্রাগানের মধ্যেও সুসাহিত্য ও অভিজাত সংগীতের নিদর্শন সম্পূর্ণভাবে মেলে। তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণযাত্রা থেকে আরম্ভ করে সমস্তরকম যাত্রাগানই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হয়েছিল।

সারি, জারি

পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই সারিগান সমধিক প্রচলিত, সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে সারিগানের প্রচলন নেই। পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে বিভিন্নপ্রকার উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সেই সময়ে ঐ সারিগান গীত হয়। নৌকায় দাঁড় টানবার সময় বৈঠার তালে তালে দাঁড়ী মাঝিগণ যে গান গাইত এবং বর্তমানেও গেয়ে থাকে, তাকেই প্রধানতঃ সারিগান বলা হয়। কারো কারো মতে সুরকি দিয়ে ছাদ পেটানোর সময় যে গান গাওয়া হয় তাকে সারি বলা যেতে পারে, কিন্তু একথাটি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না। কেননা, ছাদ পেটানোর গানের মধ্যে যদিও কোনো সময় সারিগানের সুর শুনতে পাওয়া যায়, তথাপি এই গানের ধারাটি তরজা কিংবা কবিগানের মতোই। এর একজন মূল কবি থাকেন। তিনি উপস্থিত মতে প্রহেলিকাপূর্ণ ঠারে-ঠোরে, আভাসে-

ইঙ্গিতে আদিরসাত্মক রচনারই পরিচয় দেন। পিছনে ধুয়া ধরে থাকে অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষগণ। সারিগানের মূল কবি থাকেন না। পূর্বের পল্লীকবিদের রচিত গানই এই দাঁড়ী মাঝিরা সমস্বরে গেয়ে থাকে। তবে কিনা ছাদ পেটার গান, ধান কাটার গান প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে নাম এবং কথার পার্থক্য থাকলেও, এগুলি খানিকটা সারিজাতীয় গানের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, সুরের রচনা-কৌশলের দিক দিয়ে, সারিগানের সঙ্গে ঐ জাতীয় গানগুলির কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধারণতঃ নৌকা, নদী ও জল প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়ে সারিগান রচিত হয়। প্রেমভাব ব্যতীত করুণরসাত্মক ভাবের সন্ধানও এই গানে পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের মধ্যে যেখানে নৌকার উল্লেখ রয়েছে, যেমন কৃষ্ণলীলায় নৌকাখণ্ড, পারখণ্ড ইত্যাদি নৌকা-সম্পর্কিত ঘটনাবলীও সারিগানের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। জয়নারায়ণ নৌকাবিলাসের প্রসঙ্গে সারিগানের উদাহরণ দিয়েছেন—

তরুণী তরণ্যাকার কৃষ্ণ কর্ণধার। এইরূপে জলকেলি সুখ পারাবার ॥ ৪২ ॥ জলজন্তু ধর‍্যা কভু করে নৌকা মত। কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপী যূথ ॥ ৪৩ ॥ কর বৈঠা কঙ্কণেতে বাজিছে পঞ্জনি। সপ্তস্বরে শাড়ি গায় গোপিনী রঙ্গিনী ॥[৭]

নৌকার শাড়ির গীত ॥ যমুনায় তরণি বায় বলাই মোহন। বৈঠায় পঞ্জনি বাজে জুড়ায় শ্রবণ ॥ ১ ॥ শ্যামরূপে আল করে কালিন্দীর কূল। যুবতী গোপিনী হেরি হইল আকুল ॥ ২ ॥ ইতি গোকুল লীলা সাঙ্গ ॥[৮]

নৌকার শাড়ি গান ॥ আজি আনন্দের সীমা নাই সাঁজি

৭ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ২৬৯
৮ ঐ ঐ পৃঃ ৫৯

দরশনে। বিরজায় তরণি বায় মোহিনী মোহনে॥ ধুয়া॥ রাধিকার গুণগান করিছে সঘনে। মুরলী বাজায় কৃষ্ণ সুচাঁদ বদনে॥ ১॥ প্রেমধারা বহিতেছে ভকত লোচনে। তাল মানে ভক্ত নাচে মুগ্ধ গুণ গানে॥ ২॥ সারদা সকল সখী বীণার বাজনে। গাইছে যুগল গুণ সুধা আলাপনে॥ ৩॥ জয় জয় রাধা জয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে। সখা সখী ভাবে মত্ত নাম মধুপানে।[৯]

এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নৌকা বাইবার সময় যে গান দাঁড়ী মাঝিরা গাইত, বিশেষ করে সেইটিই সারিগান। তা ছাড়া সারিগানে রাগ-রাগিণী ও তালাদির উল্লেখ আছে।

শাড়ি গীত॥ রাগিণী বাঙ্গাল॥ তাল একতালা॥ রমণী তরনি বায়ঃ প্রেম ভরা সেই নায়ঃ বিকিকিনি আনন্দ বাজারে। হাতে বঠ্যা বায় তায়ঃ কঙ্কণে সুতাল ভায়ঃ রসঘাটে লাগিল সত্বরে॥ দূর্ব্বা দল কুঞ্জবেলা তিনপ্রহর॥[১০]

দাড়ি মাজি ব্রজশিশু হইব সকল। নটবর বেশভূষা হবে অবিকল॥ ৭॥ কনক বঠ্যায় হালি পঞ্জনি সহিত। নানারঙ্গ পতাকায় হইবে শোভিত॥ ৮॥ ঋতুমত শাড়িগান মল্লারে মীলিত। বরষা রাগিণী যত তাহার সহিত॥ ৯॥ কালজলে আল করি তরণি রচিব। তার মধ্যে হিণ্ডোলাতে আমরা ঝুলিব॥[১১]

দিবসেতে তরিমধ্যে জলেতে ভ্রমণ। দাঁড়ি মাঝি সখীচয় শোভা অগণন॥ ৫॥ বসন ভিজিয়া অঙ্গে হইল দর্পণ। যুগল কিশোর রূপ তাহাতে দর্শন॥ ৬॥ নদনদী দুই কূলে অতি রম্যবন।

---

৯ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ২১১
১০ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৯
১১ ঐ ঐ পৃঃ ১৭৭

তার ছায়া গোপীঅঙ্গে হয়্যাছে পতন ॥ ৭ ॥ নানারাগে শাড়ি গান জুড়ায় শ্রবণ। কেহু কাচে কেহু নাচে তোষয়ে মোহন ॥[১২]
গীত শাড়ি ॥ রাগিণী প্রভাতি ॥ তাল শাড়ির ॥ কেম্বায় তুষিব মোরা মোহন মোহিনী। তার হদ্দি নাহি জানি ॥ ধুয়া ॥ নানাফুল বনাইনু হিংহাহন খানি। তার মাজে রহিলেন রাদা বিনোদিনী ॥ ১ ॥ কোন গাটে লয়্যা যামু কয়্যা দেলো দনি। মাজির হনে ঠারাঠারি তুই করচ কেনি ॥ ২ ॥ শাড়ি সাঙ্গ ॥[১৩]

সারিগানের সুরের মধ্যে গতির ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করা যায়। কথা এবং সুরের দিক দিয়ে, ভাটিয়ালির সঙ্গে সারিগানের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে গাইবার ভঙ্গির উপর। এ সম্বন্ধে শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী বলেছেন—

"সারিগান ঠাসবুননো ছন্দে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে।

······আর সারিগান বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠসংগীত বলেই এবং বিশেষ ছন্দোবদ্ধ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল অপরিহার্যই নয়, বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ।··· তবে সারিগানে রয়েছে যেন দ্রুতগতি গতের চাল।"[১৪]

দলবদ্ধভাবে অন্যান্য যে সব গান বাংলায় গাওয়া হয়, তার মধ্যে জারিগান উল্লেখযোগ্য। মনে হয় বাংলার সর্বত্রই জারিগানের প্রচলন রয়েছে। পাগলা কানাইয়ের জারিগান ও ধুয়া বঙ্গপ্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত গানগুলি মর্মস্পর্শী এবং সরলতায় ভরপুর। বঙ্গের চাষীদের মনের কথা তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কিনা

---

১২ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল পৃঃ ৩১৮-৩১৯

১৩ ঐ ঐ পৃঃ ২৬৯

১৪ বাংলার লোক-সাহিত্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পরিশিষ্ট। শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। পৃঃ ৪৯৮

পূর্বমৈমনসিংহের জারিগান বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্তই এর বিষয়-বস্তু এবং এই অঞ্চলের জারিগান হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের করুণ হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সুতরাং বীররস এবং করুণরস উভয়েরই সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় এই গানে। এই জারিগান নৃত্য সহযোগে গীত হয়ে থাকে। একজন মূল গায়েনের পরিচালনায় গায়করা দলবদ্ধ হয়ে নূপুর পায়ে দিয়ে, আঁচলের মতো করে হাতের গামছাটি তুলিয়ে নাচতে নাচতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং মূল গায়েন সংগীতের মাধ্যমে কাহিনীর ধারা বর্ণনা করেন—কখনো কখনো অন্যান্য গায়কগণ ধুয়া ধরেন। করুণ-রসাত্মক কাহিনীর মধ্যে বীররসাত্মক ধুয়াগুলি অপূর্ব গীতিসুর, রস-বৈচিত্র্য এবং পরিবেশের সৃষ্টি করে—

চল চল চল সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব।
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই।
জীও জীও জীও ভাই ॥[১৫]

আর একটি জারিগানের দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল—

হানেফ বলে আর মোর কোলে জয়নাল বাছাধন
ওহে যেনা পথে দিছি রে তুই ভাই জোরের ভাই এমাম হোছেন।
সেই না পথে যাবো রে আমি করো আমার গোর কাফন
রামলক্ষণ গেছে রে বনে অযুধ্যা ছেড়ে।
ঐ রকম গেছে রে তুই ভাই মদিনা শূন্য করে
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ আর কি প্রাণের ভাই আছে
যে বলের বল কর্লেমরে জয়নাল সে বল ভেঙ্গেছে

১৫ বাংলার লোক-সাহিত্য। গীতি। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৮৭

যার বলের বল করছ তুমি সে বল কি আর আমার আছে
জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।[১৬]

এই জারিগান সম্বন্ধে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বলেছেন—

"জারিগান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণরসাত্মক গান। জারিগানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে যুদ্ধ করা হয় নাই। মানুষ অবস্থার দাস। চারিদিকে মরু ধূ ধূ করিতেছে। এক বিন্দু বারি পাইবার উপায় নাই। পিপাসার্ত নরনারী বিশেষতঃ শিশুদের অসহ্য এবং অকথ্য যন্ত্রণা দেখিয়া সত্যই আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে

জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে॥"[১৭]

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী জারিগান সম্বন্ধে বলেছেন—

"বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীগীতির মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের জারিগান ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি গীতরীতিতে আমরা সুরের খানিকটা উদ্দাম গতি লক্ষ্য করি।"[১৮]

এই জারি শব্দটি ফারসী, অর্থ বিলাপ—তাই করুণরসাত্মক কাব্য ও কবিতা জারি নামে অভিহিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের অন্যত্র সাধারণতঃ এই গানগুলি গাওয়া হ'ত হিন্দুদের দুর্গোৎসব উপলক্ষে। নবমী তিথি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সকলে দলে দলে বিভক্ত হয়ে দুর্গামণ্ডপের সামনে উপস্থিত হ'ত এবং জারিগান গাইত। এই জারিগানের মধ্যে দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান

---

১৬ হারামণি। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, এম. এ.। ভূমিকা। পৃঃ ২৮৶০

১৭ ঐ ঐ ঐ ঐ

১৮ বাংলার লোক-সাহিত্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পরিশিষ্ট। শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। পৃঃ ৫০৬

তো থাকতই, তা ছাড়া থাকত আধ্যাত্মিক গান এবং দুর্গা কিংবা অপরাপর দেবতা অথবা কোনো রাজপরিবার বা সাধারণ সংসারের করুণ ঘটনা সম্বন্ধীয় গান। এই সংগীতের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে একটি আত্মীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণ হিন্দুদের উৎসবপার্বণে উপস্থিত হয়ে আনন্দে যোগদান করতে দ্বিধাবোধ করত না। এই জারিগানের সুর অতি সুন্দর ছিল এবং এর মধ্যে যেমন ছিল সরল কাব্যভাব, তেমনি ছিল সরসতা। এতে যেমন হ'ত টুকরো টুকরো গান রচনা, তেমনি কারো কারো জীবনী নিয়ে পালাও রচিত হ'ত। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনান্তর ভরত মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করল, কৌশল্যা ও ভরতের মধ্যে কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসার পর কৌশল্যার বিলাপ সম্বন্ধে একটি গান পাওয়া যায়—

ভরত মাতুলালয়ে ছিল
(সে) পত্র পেয়ে অযোধ্যায় এল
বিনয় করে বিমাতাকে
বলিতে লাগিল।

উঠ মা আঁখি মেল
তোমার এই ভরত এল
(আজ) সোনার অযোধ্যাপুরী
কি দোষে নীরব হল?

(তখন) কেঁদে কয় কৌশল্যারাণী
বনে গিয়াছে আমার নীলমণি
পুত্রশোকেতে বাছা হয়্যাছি পাগলিনী!

যে অবধি শ্রীরাম গেছে
কই ভরত তোমার কাছে
তোর মাতা নিদয় হয়ে
মোর বুকে পাষাণ দেছে।

এই গানটি অতি সরল ভাষায় রচিত, কিন্তু করুণ কাব্য হিসাবে একে ঠেলে ফেলে দেওয়া চলে না। এই কাব্যসাহিত্য সম্পূর্ণই সংগীতের আশ্রয় নিয়েছে।

ভাটিয়ালি

বাংলার পল্লীসংগীত ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত বাঙালী-জীবনের সমাজ-সংসার ও মানসিক-আধ্যাত্মিক সকল জায়গায়ই উঁকি মেরেছে সঙ্গোপনে, সন্তর্পণে। এই লোকসংগীতের সুর বেদনাবিহ্বল উচ্ছলিত হয়ে বাঙালীর চোখে এনে দিয়েছে জল, আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ়তায় আত্মোপলব্ধির সচেতন প্রয়াসে বাঙালীকে করে তুলেছে সংসারী সন্ন্যাসী। আসক্তির প্রলেপে ঢাকা পড়ে যায়নি তার মনের মানুষ, হারিয়ে যায়নি তার পরম শ্রেয়ের পথ। চিরকালই বাঙালীর মনের খোরাক যুগিয়ে এসেছেন এই সব পল্লীসমাজের নিরক্ষর কবিগণ তাঁদের ভাবসমৃদ্ধিশালী পল্লীসংগীতের মাধ্যমে।

এই সংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হ'ল সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উৎসবাদি নিয়ে যে সব সংগীত সামাজিক জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়িত, যে-গান পল্লীর নর-নারী অবসর সময়ে, এমনকি অনবসরেও সবসময় কণ্ঠ খুলে বা গুনগুনিয়ে গেয়ে থাকে গৃহকোণে অথবা প্রাঙ্গণে এবং যেটি একমাত্র সংসারোপযোগী। আরেকটি হ'ল ঠিক এর বিপরীতধর্মী অর্থাৎ যেটি একমাত্র দেহতত্ত্ব-বিষয়ক এবং আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। এই পর্যায়ের পল্লীসংগীত গাওয়া হয়ে থাকে বাইরে—যেখানে

মানুষ নিজেকে মনে করে একান্ত একা, দিশাহারা মনকে সান্ত্বনা-বাক্যে করতে চায় সমাহিত। বনপ্রান্তরে, নদীবুকে, দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে অসীমের বিরাটত্ব যখন নিজের ক্ষুদ্রতা দেখিয়ে দেয়, সীমার বন্ধন ছিঁড়ে যায় যখন অসীমের টানে, সেই উপলব্ধি ক্ষণিক চেতনায় যখন জাগ্রত হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের, তখন তারা আত্মসমর্পণের, আত্মনির্ভরতার বাণী-সমন্বিত পল্লীর আদি সংগীত এই ভাটিয়ালি গান গেয়ে থাকে।

এই পর্যায়ের পল্লীসংগীতের নাম ভাটিয়ালি হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ করে ভাটিয়ালি গান গেয়ে থাকে নৌকায় যে-কোনো একক মাঝি। নদীর বুকে, ভাটির টানে নাও ভাসিয়ে দিয়ে, নৌকার গলুইয়ের সঙ্গে হালের বৈঠা বেঁধে দিয়ে, একমাত্র স্রোতের টানের উপর নির্ভর করে একান্তে একা মাঝি গায়—

মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জন্মাবধি বাইলাম তরী রে
তরী ভাইটায় ছাড়া উজায় না।
নৌকার তক্তা ফাড়া গুঁড়া ভাঙ্গা রে
ও জল গাবকালিতে মানে না।

এখানে মাঝি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে ভগবানের কাছে, জানিয়েছে তার প্রাণের আবেদন। আজ শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে নেই শক্তি, নেই বল, জীবনযৌবনে ধরেছে ভাটি। দেহতরী আজ জীর্ণ, রোগে-শোকে, ঘাত-প্রতিঘাতে তার প্রতিটি উপাদান পড়েছে খসে। সংসাররূপ মহাসাগরে এই দেহতরী চালাবার শক্তি আর তার নেই। খরস্রোতা এই মায়ানদী পার হতে ভগ্নতরী অকিঞ্চিৎকর। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়তে সে অক্ষম। তাই একান্ত নির্ভরশীল হয়ে সে হাল ছেড়ে দিতে চাইছে ভগবানের কাছে।

এই যে স্রোতের মুখে গা ঢেলে দেওয়া, একান্ত আত্মসমর্পণের এই যে বাণী, এতেই ভাটিয়ালি শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হয়েছে। সাধারণভাবে অর্থ করতে গেলেও এর বিরোধী অর্থ হবে না। কেন-না, নদীর ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে মাঝি এই গানই গেয়ে থাকে। এই ভাটিয়ালি গান সৃষ্টি হওয়ার আরো বহু কারণ রয়েছে। বঙ্গজননীর কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে মেখলার মতো বহু নদনদী। ওঠে ঝড়, আসে ঢেউ, ভেঙে পড়ে তটপ্রান্তে, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও ক্ষান্ত হয় না সে। ভেঙে দেয় নদনদী-তীরে সুখেদুঃখে গড়া দরিদ্র চাষাভূষার নিবিড় বেদনাশ্রুজড়িত পর্ণকুটীরসমূহ। তারা যুঝে উঠতে পারে না প্রকৃতির সঙ্গে, গড়ে তুলতে পারে না তেমনি করে আবার মাথা গুঁজবার আশ্রয়, মনের মতো করে ভরে তুলতে পারে না ক্ষুদ্র সংসারের অভাব-অভিযোগের ফাঁক। ভাঙা মন নিয়ে আগের মতো উৎসাহে আর জেগে ওঠে না তাদের উদ্দীপনা, অবসন্ন প্রাণ আর দেয় না সাড়া, তাই তো নদনদীর সঙ্গে হার-মানা সংগীত ফুটে বেরিয়েছে এইসব পল্লীবাসীর মুখ থেকে। এই সংগীতের বাণীতে যেমন রয়েছে ভাবগভীরতা, আত্মসমর্পণের প্রয়াস, সুরেও রয়েছে তেমনি বেদনবিধুর আবেশ। এই গানের বাণী ও উদাসী সুর শুনলেই অনুভব হয় যে, এর মধ্যে সচেতন প্রয়াস সম্পূর্ণই অবলুপ্ত। অন্যান্য পল্লীসংগীত থেকে এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় অভিজাত সংগীতের রাগরূপ এই পল্লীসংগীতে খানিকটা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি তার আবরণ মুক্ত করলেই দেখতে পাবে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে যে পল্লীসংগীতগুলি নিয়েছে শহুরে রূপ, তার মধ্যে সঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না রাগরূপের ধারা। নিছক পল্লী অঞ্চলের আদিম পাড়াগাঁয়ের দুই-একটি বিশিষ্ট লোকের কাছেই আবদ্ধ রয়েছে

পল্লীসংগীতের প্রকৃত রচনা ও সুরের পদ্ধতি। সেখানেই ধরা দিয়েছে এর রাগরূপ। তবে, এই পল্লীসংগীতে যে সব রাগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকেই তা আহরণ করা হয়েছে কিনা তা বলা কঠিন। হয়তো বা পল্লী অঞ্চলের এইসব গানের সুর থেকেই অভিজাত সংগীত কোনো কোনো রাগ-রাগিণীর সন্ধান পেয়েছে। অভিজাত সংগীতকারগণ হয়তো তাকে আর একটু পরিমার্জিতরূপে সাজিয়ে পরিপূর্ণ নিবদ্ধসংগীতের কোঠায় স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি পল্লীসংগীতের রচনা ও সুরযোজনার কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা আছে, যার ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনোদিন। অধিকাংশ গানগুলিই দেখা যায় ঝিঁঝিট, আলাহিয়া বিলাবল ও বিলাবল ঠাটের বিভাস ইত্যাদিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। অভিজাত সংগীতের স্বরবিন্যাস, স্বরবিস্তার ও নানারূপ আলংকারিক প্রয়োগের বোঝা ভাটিয়ালি বা অন্যান্য পল্লীসংগীতে হয়তো বা পড়েনি, সাধারণ আভরণযুক্তা পল্লীরমণীর মতোই অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করছে সে পল্লীসমাজে। তাই তো পল্লীর জনসাধারণ আপন করে নিতে পেরেছে তাকে, পল্লীর প্রতিটি নর-নারী তাই তো নির্ভয়ে, সরল সহজভাবে, কণ্ঠ খুলে, প্রাণ ভরে গাইতে পারে এই পল্লীসংগীত। একটু ত্রুটি বিচ্যুতির ফাঁক খুঁজে, অশুদ্ধিতার অপরাধের ঢাক ঢোল বাজাবার মতো সংগীতবিদ্‌দের সমাজভুক্ত মানুষ পল্লীগীতসেবীরা নয়। তারা চায় ভাব, চায় ভাবের সুরে গলে যেতে, তাই তো পায় আনন্দ। তাই আনন্দ-উচ্ছ্বসিতা, নিরাভরণা পল্লীগীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে পল্লীবাসীর সঙ্গে এবং সুখে-দুঃখে, শোকে-সান্ত্বনায় তাকেই তারা আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে, যেমন অন্তরের টানে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে সন্তান তার মাকে। তাকে ছিনিয়ে এনে, আড়ম্বরপূর্ণ শহরের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে যতই সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হোক না

কেন, নূতন বেশভূষায় ও নূতনরূপে রূপ দান করে যতই তাকে উজ্জ্বলতর করে তোলা হোক, তার প্রাণ পড়ে থাকবে সেই আদি-যুগের পল্লীবাসীর কাছেই। তার প্রকৃত রূপ দেখতে পাওয়া যাবে সেখানেই। পরিপূর্ণ অভিজাত সংগীতের তান, গমক, মিড়, মূর্ছনা ও উনকোটি অলংকারে সজ্জিত হয়ে, যদি পল্লীসমাজে অবতীর্ণ হ'ত এই পল্লীগীতি, তা হলে বোধ হয় পল্লীর নর-নারী এই সংগীত থেকে দূরেই থাকত ভয়ে। হয়তো তাদের প্রতিটি আবালবৃদ্ধের কণ্ঠে শোভা পেত না সোহাগে জড়িত বন্যপুষ্পের মতো এই পল্লীগীতি। এই সংগীত সুসাধ্যায়ত্ত বলেই সকলে সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছে স্বাভাবিকভাবে। কারণ, সহজ ও সরল রাগরূপ এতে আছে, কিন্তু নেই কথার জটিলতা, তালের মারপ্যাঁচ এবং যন্ত্রের বাহুল্য।

বাংলার পল্লীসংগীতের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একে স্বর-বিশ্লেষণ ও বাদী সমবাদীর বিচারপদ্ধতিতে ফেলে বিচার করলে তার স্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়। অভিজাত সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন যে-কোনো রাগ পূর্বাঙ্গই হোক কিংবা উত্তরাঙ্গই হোক, স্থায়ীর প্রথমাংশ থেকেই রাগের সুস্পষ্ট রূপ চিনে নেওয়া যায়, তেমনি একমাত্র কবি ও তরজা -জাতীয় গান ছাড়া, অধিকাংশ পল্লীগীতির রাগপরিচয় সুস্পষ্ট পাওয়া যায় এর পূর্বাঙ্গের গাইবার ভঙ্গিটুকু থেকে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন গানের এবং ভিন্ন ভিন্ন সুরের মধ্যেই পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যাবে পূর্বাঙ্গের স্বরবিশ্লেষণ করলে। চারটি পর্যায়ে একে ভাগ করা চলে—

১। যে-সব সুর 'স র ম প' এমনি ক'রে আরোহণ করে,

২। যেগুলো 'স গ ম প' ক'রে,

৩। যেগুলো 'স র গ প' ক'রে ও

৪। যে-সব সুর 'স র গ ম প' এমনি ক'রে পঞ্চম পর্যন্ত সোজা-সুজি সরলভাবে আরোহণ ক'রে যায়।

এই চারটি প্রকারের প্রথমটি দেখা যাচ্ছে ‘গ’ বাদ, দ্বিতীয়টিতে ‘র’ বাদ, তৃতীয়ে ‘ম’ বাদ ও শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোনো স্বরই আরোহণে বাদ যাচ্ছে না।[১৯]

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখবার বস্তু। কেননা, লোক-সংগীতের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি বেশ কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছে, যেটি একমাত্র রাগসংগীতের বেলায়ই দেখা যায়। অতএব কে কাকে অনুসরণ করেছে, এ বলা খুবই শক্ত।

এ ছাড়া রাগসংগীতে গ্রহ, অংশ, ন্যাস মেনে চলারও নিয়ম রয়েছে, যদিও অধুনা অনেকেই সে-নিয়ম রক্ষা করে চলেন না। সেজন্য ক্রমশঃই এই নিয়মটি শিথিল হতে শিথিলতর হতে চলেছে রাগসংগীতের ক্ষেত্রে। কিন্তু পল্লীসংগীতে এই নিয়মটি আজও অব্যাহত আছে। বিশেষ কোনো একটি স্বর থেকে আরম্ভ করে, অন্যান্য বিশেষ স্বরসমূহে বিচরণ করে, একটি বিশিষ্ট নির্দিষ্ট স্বরে এসে স্থিতি হ'লে রাগের পূর্ণরূপ প্রকাশ পায়। এই রাগপ্রকাশের ধারা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে পল্লীসংগীতে। তাই সন্দেহ হয়, হয়তো বা অভিজাত সংগীত এই নিয়মটি ধার করে পেয়েছে পল্লীসংগীতের কাছেই। যেমন, কোনো পল্লীসংগীতে পাওয়া যাচ্ছে—

স র ম, প ম গ র স ণ্ ধ্, ধ্ স, স র গ, র গ ম,[২০]

এই স্বরটিতে পাওয়া যায় যে, গান আরম্ভ হয়েছে ষড়জ থেকে। এটি যদি কোনো শিল্পী না মানেন, তা হলে শিল্পের দিক থেকে বিকৃতি ঘটবে। পল্লীসংগীতে রাগ-সম্বন্ধীয় রীতিনীতিগুলি অশিক্ষিত

১৯ বাংলার লোক-সাহিত্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পরিশিষ্ট শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। পৃঃ ৫০৩

২০ বাংলার লোক-সাহিত্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পরিশিষ্ট শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। পৃঃ ৫০৪

পাড়াগাঁয়ের সংগীত-রচয়িতারা যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে এসেছেন, তা দেখে অনুমান হয় যে, রাগসংগীতের ভিত্তি যার উপরে, পল্লীসংগীতের ভিত্তিও তাকে আশ্রয় করেই। তবে পল্লীসংগীতের ভিত যেন রাগসংগীতের ভিত থেকেও শক্ত মনে হয়। কেননা, শিক্ষিত রাগসংগীতকারগণও সর্বদা রাগসংগীতের নিয়মানুবর্তিতা সঠিক রক্ষা করতে পারেন না, কিন্তু পল্লীসংগীতকার-গণ আজও সে-নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে আসছেন।

ঝিঁঝিট রাগটির বাংলাদেশে সকলের কাছে এত প্রিয় হওয়ার ও স্বর্গীয় রূপ নেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যে দুটি শ্রেণীর গান বাঙালীর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, অর্থাৎ কীর্তন ও পল্লীসংগীত, এই উভয়ের মধ্যেই ঝিঁঝিট রাগ প্রবেশ করেছে প্রকৃষ্টরূপে। পূর্ব-ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে এই ঝিঁঝিটের দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। একটি উদারার পঞ্চম পর্যন্ত নেমে আসে, আর একটি উদারার ধৈবত পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়। এই শেষোক্ত দ্বিতীয় প্রকার ঝিঁঝিটের নাম কঁসৌলী ঝিঁঝিট। পল্লীসংগীতে অধিকাংশ স্থলেই এই কঁসৌলী ঝিঁঝিটের প্রয়োগ দেখতে পাই। এর স্বরগত রূপ—

স র ম (প ম গ র স ণ্ ধ্) ধ্ স স র গ, র গ স—।[২১]

দুই প্রকার ঝিঁঝিটেরই আরোহণ ও অবরোহণ এক প্রকারের। শুধু পূর্বোক্ত প্রথম প্রকারের পাহাড়ী ঝিঁঝিট থেকে কঁসৌলী ঝিঁঝিটের পার্থক্য এই হিসাবে যে, পাহাড়ী ঝিঁঝিট উদারার পঞ্চম পর্যন্ত এসে থামে এবং কঁসৌলী ঝিঁঝিট উদারার ধৈবত পর্যন্ত এসে শেষ হয়। শুধু ভাটিয়ালি নয়, অন্যান্য পল্লীসংগীতের মধ্যেও

---

২১ বাংলার লোক-সাহিত্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। পরিশিষ্ট। শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী। পৃঃ ৫০০

এই কঁসৌলী ঝিঁঝিটের এত বিস্তৃতি যে, এর থেকে মনে হয়, এই কঁসৌলী ঝিঁঝিটের মূল আধার হয়তো বা এই পল্লীসংগীত। এ ছাড়া লোকসংগীতের সংগীতরচনার ধারা রাগসংগীতের অনুরূপই। খেয়াল ও টপ্পাতে যেমন স্থায়ী ও অন্তরার ভাগ রয়েছে, তেমনি পল্লীসংগীতেও দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো পল্লী-সংগীত আবার চার তুকেরও হয়ে থাকে। যথা— স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। অতএব অভিজাত সংগীতের দাবি পল্লীসংগীতের পক্ষে অন্যায় বা অশোভন নয়, হয়তো বা পল্লীসংগীতের আবহাওয়াই পরিপুষ্ট করে তুলেছে অভিজাত সংগীতকে।

তরজা, বোলান, খেউড়

চর্যা থেকে আরম্ভ করে নাথগীতিকা, বৈষ্ণবসাহিত্য, বাউল, পাঁচালী, কবি, তরজা, সারি, জারি, গাজন, ভাটিয়ালি, এমনকি মালসী প্রভৃতি বাংলার প্রায় সকল প্রকারের সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যেই বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত সাধকেরা যে প্রহেলিকাপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ক ছড়া রচনা করতেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় চর্যাগীতিতে এবং তৎপরবর্তী শৈবসিদ্ধাদের গীত ও ছড়াগানের মধ্যে। শ্রীচৈতন্যের সময়েও এইরূপ প্রহেলিকাপূর্ণ সিদ্ধাচার্যদের রচিত ছড়ার প্রচলন ছিল। তাই তো চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা করি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধিবিধানে কুশল॥

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন॥
পূজানির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আশ্চর্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥[২২]

এর থেকেই বোঝা যায়, বৌদ্ধ, শাক্ত ও শৈব ধারায় রচিত ছড়ার প্রভাব শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত বিশদভাবেই ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যত্র বলেছেন—

তরজা প্রহেলি আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥[২৩]

ছড়া কেটে ঢোল-কাঁসির সঙ্গে গান করবার পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। এই ছড়াগুলি সাধারণতঃ শৈব সন্ন্যাসীরা ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজন উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। এর নাম তখন ছিল "আর্য্যা" অথবা "তর্জ্জা" কিংবা "আর্য্যা-তর্জ্জা"। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে—

আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ॥[২৪]

এই তরজার অনুরূপ ছড়া পূর্বে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় লেখা ছিল। তাই বোধ হয় নাম হয়েছিল আর্য্যা, কিন্তু তরজা শব্দটি এসেছে আরব থেকে। ত্বর্জ্ অর্থে কাঠামো অর্থাৎ রীতি বা ধরন। গাজন উৎসব উপলক্ষে মূল সন্ন্যাসীগণ গ্রামের পথে পথে ঘুরে যে তরজার ছড়া কাটতেন, তারই নাম হ'ল "বোলান"। উত্তর রাঢ়ে

২২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্। কবিরাজ কৃষ্ণদাস। অন্ত্যলীলা। পৃঃ ৩৩৬
২৩ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৩৫
২৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবন দাস। মধ্য খণ্ড। পৃঃ ১৪৬

মনোহরশাহী পরগনায় পঞ্চাশ অথবা ষাট বৎসর পূর্বে এই রকম বোলানের প্রচলন ছিল। বর্ধমানের প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের সংগৃহীত বোলানের ছড়া এইরূপ—

যতগুলি বল্‌লাম বোলান গো
আরও বল্‌তে পারি।
ওস্তাদের নাম অকিঞ্চন
তেঁতুলতলায় বাড়ি॥
যার বাড়িতে গোরু নাই গো
তার বাড়িতে ঘসি।
তোমরা একবার বোলান বল
আমরা একবার বসি॥[২৫]

জয়নারায়ণের কাব্যে "চরক সন্ন্যাসলীলা"র প্রসঙ্গে বোলান তরজার এমনি উদাহরণ আছে—

তরজা পথ বন্ধন॥ সন্ন্যাসিনী কোথা হইতে জন্ম তোর কোথায় বসত। কোনখানে যাবে তুমি কিবা তব মত॥ ১॥ ইহার জবাব॥ গোলোক বসতি ছাড়ি ব্রজ ভূমে আসি। স্বামীর লাগিয়া মোরা হইয়াছি সন্ন্যাসী॥ ১॥ হরি লাগি তপ করি এই মনোব্রত। পথ কেন বন্ধ কর ছাড়হ ত্বরিত॥ ২॥ ইহার জবাব॥ না জানি গোলোক কোথা কেবা তোর পতি। কুলটা করিয়া সৎপথে করে গতি॥ ১॥ কর শিরে ধুনা জ্বালে আলেয়ার মত। না জান্যা ছাড়িতে নারি আর কব কত॥ ইহার জবাব॥ সঙ্গে সঙ্গে চল সবে যথা মোরা যাই। সাধু সঙ্গে চল যদি পাইবে গোসাঞি॥ ১॥ তরজার অনেক ভাঁতি আমি কব কত। এসূত্র পড়িয়া বহু কহিবে ভকত॥ ২॥[২৬]

২৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। শ্রীসুকুমার সেন। পৃঃ ৯৬৩
২৬ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ৩৪৬

খেউড়গান খানিকটা তরজারই সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা এর দুই পক্ষের পাল্লা হ'ত। এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপর দোষ চাপিয়ে তার কুৎসা প্রচার করত। আর এক পক্ষ তার প্রতিবাদে নিজের কুৎসাকে অন্যরকম অর্থে পর্যবসিত করত। এখানে এক পক্ষের দলপতি হয়তো গ্রহণ করত জটিলা অথবা কুটিলার অভিনয়ের অংশ। আর এক পক্ষ গ্রহণ করত রাধিকার অংশ। এমনিভাবে চলত উত্তর প্রত্যুত্তর গানে গানে। সেই গানের ধরন ছিল এমনি এবং এই গানটি রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনের ইঙ্গিত দিয়েছে—

জটিলার উক্তি—

তুই কুল মজালি কুলে কালি
দিলি দাদার মুখে ছাই।
আবার আয়ানদাদা কাতর হয়ে
তোমায় দিছেন পদ বাড়ায়ে
কাজে জানি তাই।
আবার একদিন অন্তর গাঙ্গের ঘাটে
ছল করে মথুরার হাটে
ধনী তোর গুণের সীমা নাই
ছি ছি লাজের মাথা খাই।

তোর সতীপনা যাবে জানা
যেদিন আনতে যাবি জল
সতী থাকবি কত কাল
(তুই) করিস না আর গল্প গাল
আমি এই দুখেতে মরে যাই।

গানের মধ্য দিয়ে এই তর্কবিতর্ক বেশ একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি

করত এবং জনগণের বিশেষ উপভোগ্য হ'ত। এর মধ্যে কোনো গদ্যাংশ থাকত না। সংগীতেই এর স্বরূপ প্রকাশ।

জয়নারায়ণ ঘোষালের কাব্যে খেউড় গানের উল্লেখ দেখা যায়—

খেউড়॥ শুন মন দিয়া এক অপূর্ব্ব কথন : রতিপতি কামদেব জানে ভুবনজন : রুদ্র কোপেতে কামদেহ দাহ সে হইতে। দৈব যোগে পুষ্পধনু কৃষ্ণসুত হয় : সম্বর হরিল তারে রিপুজানি পাই ভয় : পতিআশে সতী দাসী হৈল তার গৃহেতে : কৃষ্ণ পুত্রপতি পায় পুষ্ট কষ্ট যত্নেতে ॥ ১ ॥ এ রতি ছাড়িয়া পতি ফিরি বনে বন : কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরি করিতে চায় রমণ : কুমারী কহিছে ব্রজ ডুবিল পাপেতে : পতিপিতা সহ বধূ রমে কুঞ্জ পথেতে ॥ ২ ॥ উত্তর :॥ এ মাথুর দেশ : অতি সুপুন বিশেষ : যাহার পুণ্যের গুণ না কহিতে পারে শেষ। সুসঙ্গ হইতে ফল বাচিলেক বিধিমতে। ধর্ম্মধ্বজা বান্ধি ফিরে কুমারী গুণিনী যাতে। ব্রজবাসী শুন কহি পুরাণ বাণী : কুন্তিনাম সুকুমারী সর্ব্বজন বন্দিনী : সূর্য্য সঙ্গ কৈল তার মন্ত্র পরীক্ষাতে : ততোধিক এ কুমারী গোপঅঙ্গ সঙ্গেতে ॥ ১ ॥ সত্যবতী নাম এক কুমারী আছিল : পরাশর বল করি তার সঙ্গ করিল : এ কুমারী সদা চাহে গোপাল রমিতে : এ আশ্রয় রতি যাবে পরলোকেতে ॥ ২ ॥[২৭]

খেউড়েও আখ্যান থাকত। সাধারণতঃ এগুলি তরজা বা কবিগান থেকে পৃথক এই হিসাবে যে, খেউড় হালকা প্রকৃতির গান এবং তা অশিক্ষিত, অমার্জিত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ করে প্রবেশ লাভ করেছিল এবং সেই বৈষ্ণব-ধর্ম সহজিয়ারই রূপান্তর। সহজিয়া তন্ত্রবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং অশিক্ষিত লোক সেই তন্ত্রবাদ বা সহজিয়া মতবাদকে ঠিক মার্জিতভাবে প্রকাশ করতে না পারায়, অশ্লীল

২৭ করুণানিধানবিলাস। জয়নারায়ণ ঘোষাল। পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬

ভাষারও প্রয়োগ এসে পড়ল। খেউড়গানে সুর এবং তালের বৈচিত্র্য তো ছিলই না বরং কয়েকটি মাত্র সহজ তাল এবং রাগের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল।

আখড়াই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাঁচালী ও কীর্তনগানের রূপ ছাড়িয়ে, ওস্তাদী গানের ঢং নিয়ে কবিগান এল তৎকালীন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমর্থক ধনাঢ্যদের বৈঠকখানায় আখড়াই নাম নিয়ে। এই সকল ধনবিকারগ্রস্ত ইংরেজ-শাসনকর্তাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত, ইংরাজি-শিক্ষা ও ইংরেজদের অনুকরণের গরিমায় গর্বিত সম্প্রদায়ের কয়েকজন কলিকাতা-নিবাসী বিশিষ্ট বাঙালী নাগরিকের প্রচেষ্টায় তখনকার দিনে আখড়াই সংগীতের অনেকগুলি দল গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেব এই ধরনের আখড়াই সংগীত ও অন্যান্য বৈঠকী গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য হলেন। কেননা এই আখড়াই গান এবং বৈঠকী গান বড়লোকদের বৈঠকখানায় প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি বিলাসিতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবকৃষ্ণ দেবের সভাসদ্‌দের মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ করে কুলুইচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় কবিগান ওস্তাদী পর্যায়ভুক্ত হয়ে এই বড়লোকদের বৈঠকখানায় প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। প্রত্যেক দলেরই এক-একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সেখানে সকলে সমবেত হতেন এবং এই সংগীতের চলত আখড়া অর্থাৎ রিহার্সেল বা মহড়া, তাই এর নাম হয়েছিল আখড়াই। এই আখড়াই ও বৈঠকী সংগীতে যেমন সাধিত হ'ত বড়লোকের তোষণকার্য, তেমনি ঘটত কিছু অর্থপ্রাপ্তি। তাই তখনকার সমাজে এই সংগীতের চর্চাও হয়েছিল যথেষ্ট এবং একটি বড় রকমের আলোড়ন তুলে মহাসমারোহে মহানগরীর বুকে মহার্ঘ হয়ে উঠেছিল এই আখড়াই সংগীত।

এক-একটি আসরে একসঙ্গে পর পর দু-তিনটি দলের গান হ'ত, কিন্তু কবিগানের মতো এতে প্রশ্নোত্তরের লড়াই ছিল না। লড়াই ছিল সংগীতের সুরের কারুকার্য ও গাইবার ভঙ্গির মধ্যে। তিন প্রকার গানের দ্বারা এই আখড়াই সংগীত শেষ হ'ত। প্রথমে হ'ত দেবী-বিষয়ক গান, তারপর প্রণয়সংগীত এবং শেষে প্রভাতী। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মিলন সংঘটিত না হওয়ায় এবং তার সম্ভাব্য সূচনাও নেই দেখে তার নিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ বিরহসংগীতে হ'ত এর শেষ। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্রুপদ খেয়ালের মতোই এতে রাগের আলাপ ও সুর-বিস্তারে বৈচিত্র্য ছিল। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয় সংবলিত অর্থাৎ সংগীতশালার উপযোগী অভিজাত সংগীতের মতোই ছিল এর রীতিনীতি। আখড়াই নাম নেবার এও একটি কারণ বলে মনে হয়। রচনা, গাইবার ভঙ্গি, সাজাবার রীতিনীতি ও সংগত প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই বেশ পারিপাট্য ছিল আখড়াই সংগীতে। এর লয়ের প্রধানতঃ চার প্রকার গতি ছিল। অভিজাত সংগীতে যেমন থাকত বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ও অতিদ্রুত লয়ের গতি, তেমনি এই সংগীতেও পিঁড়ে, বন্দী, দোলন, সব-দৌড় এবং মোড় প্রভৃতি লয়ের ব্যবহার দেখা যায়। সব নিয়ে একে অভিজাত সংগীতই বলা যায়।

সেকালের আখড়াই সংগীত এবং প্রণয়গীতি রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)। এঁর জন্ম হয়েছিল ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটবর্তী চাপতাগ্রামে মাতুলালয়ে। এঁর ছাত্র-জীবন কলকাতার কুমারটুলিতে অতিবাহিত হয়। পরে পশ্চিমে ছাপরা জেলার অন্তর্গত কোনো-এক গ্রামে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষালাভ করেন। কবিপ্রতিভা ও সংগীতপ্রতিভা —এই উভয়ের যোগাযোগ নিধুবাবুকে অনবদ্য টপ্পাসংগীত রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। হিন্দী গান ভেঙে, পাঞ্জাবী টপ্পাগান

রচনার রীতিনীতি অনুসরণ করে, সরল বাংলা ভাষায় সুললিত মধুর পদবিন্যাসে যে বাংলা টপ্পাসংগীত তিনি সৃষ্টি করেছেন তার দ্বিতীয় তুলনা মেলে না। সংক্ষিপ্ত কথায়, প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর মনের সম্পূর্ণ ভাব, গীতিধর্মী রচনার ক্ষেত্রে এমনি সুস্পষ্ট করে কেউ প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। এটি একমাত্র সম্ভব হয়েছিল তিনি সুগায়ক এবং সুকবি ছিলেন বলে।

ঐ সময়ে আখড়াই সংগীত রচনায় আরো বহু সুদক্ষ পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ ও কবি ব্যাপৃত ছিলেন। ১২১০ সালে মান্যবর রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যখন আখড়াই সংগীতামোদী বলে খ্যাত হলেন, তখন শ্রীদামদাস রামঠাকুর এবং নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন আখড়াই সংগীতের দলপতি হিসাবে লোকসমাজে পরিচিত হয়ে পেশাদারী আখড়াই সংগীত প্রচলিত করেন। এঁরা শৌখিন ছিলেন না, তাই ১২১২ অথবা ১২১৩ সালে পেশাদারী আখড়াই সংগীতের বিরুদ্ধে নিধুবাবু স্বয়ং উদ্যোক্তা হয়ে কলকাতা মহানগরীতে দুটি শখের আখড়াই দল সৃষ্টি করেন। তার এক পক্ষে যোগদান করেন বাগবাজার ও শোভাবাজার অঞ্চলের সমস্ত ভদ্রসন্তানগণ এবং অপর পক্ষে যোগদান করেন মনসাতলা কিংবা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী নীলমণি মল্লিক ও তাঁর বন্ধুবর্গ। উভয় পক্ষে "বাদী" হলে, নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হয়ে আখড়াই সংগীতের গীতরচনা ও সুর প্রযোজনা করতে লাগলেন এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদামদাস ও কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন সুরসহযোগে গীতরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীদামদাস ভবানী-বিষয়ক গান ও গোকুলচন্দ্র সেন খেউড়সংগীত রচনা করতেন। এই দুই দলের সংগীত শ্রবণ করতে মহানগরীর বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হ'ত এবং তাঁরা বিশেষ করে আনন্দ উপলব্ধি করতেন। এই শৌখিন দল দুটির অভ্যুত্থানেই ব্যবসায়ী আখড়াই সংগীতের দল ক্রমান্বয়ে একে

একে বিলুপ্ত হ'ল। নিধুবাবুর অতি নিকট-সম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন কুলুইচন্দ্র সেন। এঁকে একরকম আখড়াই সংগীতের জন্মদাতা বললেই চলে। তা হলেও নিধুবাবুই আখড়াই সংগীতে নূতন প্রণালীতে নূতন রূপ দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি রূপদান করতে আর কেউ সমর্থ হননি।

নিধুবাবুর সেই গায়নপদ্ধতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। তাঁর রচিত গানগুলি সমস্তই অভিজাত সালগজাতীয় সংগীতের পর্যায়-ভুক্ত বলা চলে। এঁর অধিকাংশ সংগীতই টপ্পা অঙ্গের। লেখার বাঁধুনি, রসমাধুর্য, সুরপ্রযোজনা সব দিক দিয়ে বিচার করলে, পাঞ্জাবের সৃষ্ট টপ্পাসংগীত থেকে নিধুবাবুর রচিত এই বাংলা টপ্পা-সংগীতের স্থান উচ্চে ছাড়া কোনো অংশেই নিম্নে নয়। নিধুবাবুর রচিত শ্রেষ্ঠ প্রেমসংগীতগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ বিরহের জ্বালা অনুভূত হয়।

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

পিরীতি না জানে সখি সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিল যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশুসম গণনে॥ ৬ ॥[২৮]

ইমন ভূপালী—একতালা

বুঝিলাম এতদিনে প্রাণ বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক সুখ হইল এখন॥
জানাইতে মোর মনঃ করেছিলাম প্রাণপণ।
তুমি তা বুঝিলে এবে পূরিল সাধন॥ ২৮০ ॥[২৯]

---

২৮ প্রীতিগীতি। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., বি. এল.। পৃঃ ৪

২৯ ঐ ঐ পৃঃ ৯০

ঝিঁঝিট, সুরট, জয়জয়ন্তী, সিন্ধুখাম্বাজ, দেওগিরি, সরফরদা, ললিত, সিন্ধু, বাঁরোয়া, গারাকাফি, ভৈরবী, কামোদ-খাম্বাজ, বেহাগ ঝিঁঝিট, পরজ আড়ানা, কাফি কোকভ, মুলতান, ঝিঁঝিট খাম্বাজ, টোড়ী, কালাংড়া, হাম্বির, পাহাড়ী ঝিঁঝিট, আশাভৈরবী, বাগেশ্বরী টোড়ী, সিন্ধু কাফি, পূরবী, ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী, দরবারী কানাড়া, খাম্বাজ, গৌরী, গুর্জরী টোড়ী, সোহিনী, ইমনভূপালী, কেদারা, সোহিনী কানাড়া, ইমন ঝিঁঝিট, ইমন, সোঘরাইবাহার, সরফরদা কালাংড়া, পরজ কালাংড়া, বেহাগ, দরবারি টোড়ি, বাগেশ্রী কানাড়া, দেশকার, কামোদ গৌঁড়, খট, হামির খাম্বাজ, মালকোষ, হিন্দোল, আলাইয়া ঝিঁঝিট, কেদারা কামোদ, কামোদ, ইমনপুরিয়া, রামকেলী-ললিত, গারা ঝিঁঝিট, শ্যাম, শঙ্করাভরণ, ধানশ্রী, আলাইয়া, যোগিয়া গান্ধার, কানাড়া, কালাংড়া খাম্বাজ, গৌঁড়, ভৈরব, হিন্দোল বেহাগ, কাফি, শ্যামপূরবী, মুলতানী বাহার, লুম, ভীমপলাশী বাহার, মালকোষ বসন্ত, বাগেশ্রী মুলতানী, পিলুবাঁরোয়া, কাফিপলাশী, বিভাসকল্যাণ ছায়ানট, বাহার, ভূপালীকল্যাণ, ললিতবিভাস, গৌড়মল্লার, বিভাস, ভাটিয়ারী প্রভৃতি মিশ্র ও শুদ্ধ রাগ এবং কাওয়ালী, ঢিমাতেতালা, আড়াঠেকা, ঠুংরী, হরি, একতালা, মধ্যমান প্রভৃতি তালের সমাবেশ দেখা যায় নিধুবাবুর গানে।

মালসী

বাংলাদেশে একসময় সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল মালসী-গান। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধ নর-নারীর মুখে সদাসর্বদা লেগে থাকত এই গান। সকল প্রকার উৎসব এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে এই মালসীগান হ'ত। যে-কোনো দেবী-বিষয়ক গানকেই মালসীগান বলা হ'ত। অনেক কবি এই দেবী-বিষয়ক গান রচনা করে গেছেন। তার মধ্যে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন ও তৎপরবর্তী কবি

কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মালসীগান রচয়িতার প্রধান কবি হিসাবে রামপ্রসাদই গণ্য হয়েছেন। তিনি ১৭১৮-১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ও হালিসহরের কাছাকাছি কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন শাক্ত সাহিত্যিক। কেননা বৈষ্ণব পদাবলীর মতোই রাধাকৃষ্ণলীলার রূপায়ণধারায় শিবশক্তি লীলাকাহিনী অবলম্বনে তিনি কালীকীর্তন পদাবলী রচনা করেছেন। তারও পূর্বে প্রথম জীবনে ইনি রচনা করেছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

তবে সব চাইতে উচ্চে স্থান পেয়েছে এঁর রচিত সংগীতধর্মী কাব্য। কবির রচিত যেমন রয়েছে শিব ও শক্তি -বিষয়ক বহু গান, তেমনি রয়েছে বৈদান্তিক মায়াবাদ অবলম্বনে রাগতাল সংবলিত বহু পারমার্থিক সংগীত। এঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, অতি সাধারণ মানুষ, অশিক্ষিত, মূর্খও তাঁর সরল ভাষায় রচিত গানের অর্থোপলব্ধি করতে পারে, আবার উচ্চশিক্ষিত বৈদান্তিক পণ্ডিতগণও উপলব্ধি করতে পারেন তাঁর সংগীত—রচনার নিগূঢ় ভাবতত্ত্বসমূহ।

কবির রচনায় ভক্তির বিগলিত ধারা, জ্ঞানের আলোকপ্রস্রবণ, প্রেমের সরস মাধুর্য একসঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তাই আপামর জনসাধারণই কবি রামপ্রসাদ -রচিত সংগীতের একান্ত অনুরাগী। তিনি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক এবং পরমভক্ত কবি ও গায়ক। প্রবাদ আছে—সংগীতের মাধ্যমেই তিনি দর্শন লাভ করেছিলেন মহাশক্তিরূপিণী জগজ্জননী কালীর। এঁর রচিত প্রত্যেকটি সংগীতেই রাগ তালের উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ যখন ভাবে বিভোর হয়ে স্বরচিত সংগীত নিজে গাইতেন, তখন বোধ হয় রাগ-রাগিণীর ধরাবাঁধা নিয়মাবলী তাঁর ভাবপ্রবণতার ব্যাঘাত ঘটাবার অবসর পেত না। আপন ভাবে বিভোর হয়ে, ভাবপরিবেশে মনে যে সুর আসত, সেই

সুরেই তিনি গেয়ে চলতেন, কেননা তাঁর কাছে তখন সব সুরই যেত একাকার হয়ে। তাঁর মন তখন গিয়ে পৌঁছাত এক অতীন্দ্রিয় লোকে—যেখানে সব রাগই এক রাগ, সব সুরই এক সুর, সব তালই এক তাল, সব ভাবই এক ভাব, সব রূপই এক রূপ। যেখানে তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকত না, জাগতিক চেতনা অবলুপ্ত, শুধু তাঁর চিরারাধ্যা দেবীর চিরানন্দরূপিণীর ধ্যানে আত্মা, মন ও বুদ্ধি স্থির অবস্থিত ও এক বিশিষ্ট আনন্দলোকে নিমজ্জিত, নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন যে সুরটির প্রকাশ হ'ত, সেইটিই "রামপ্রসাদী সুর"। বোধ হয় অধিক সময় তাঁর কণ্ঠ থেকে ঐ একটি সুরের স্ফুরণ হ'ত এবং সেই সুরটিই সাধারণ লোকের শ্রুতিপথ ধরে রেখেছে। তাই রামপ্রসাদী সুর বলতে সাধারণ লোক একটি সুরকেই জানে। সর্ব-সাধারণ রামপ্রসাদী গান সেই একটি সুরেই গেয়ে থাকে। মূলতঃ কিন্তু তা নয়। এর প্রত্যেক গানেই রাগ তালের নির্দেশ রয়েছে। যেমন—

ঝিঁঝিট—একতালা

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥[৩০]

৩০ সাধক রামপ্রসাদ। স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৯৬

টোড়ি—জৌনপুরী—একতালা

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে ॥
যে জোরে একঘরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে বেজাত ম'লে যম যেন আসে না কাছে ॥[৩১]

মুলতানী, ঝিঁঝিট, বেহাগ, মল্লার, সোহিনী, ইমন, ভৈরবী, জয়জয়ন্তী, বাগেশ্রী, ললিত, পিলুবাহার, কালেংড়া, মুলতানী-ধানেশ্রী, জংলা, সিন্ধু, খাম্বাজ, বিভাস, টোড়ি জৌনপুরী, ললিত বিভাস, গারাভৈরবী, গৌরী, আশাবরী, মালশ্রী, বসন্তবাহার, ললিত খাম্বাজ প্রভৃতি মিশ্র ও শুদ্ধ রাগ এবং একতালা, ঠুংরী, যৎ, ঢিমেতেতালা, খয়রা, আড়াঠেকা, আদ্ধা, রূপক, তেওট, ধামার, আড়খেমটা প্রভৃতি তালের নির্দেশ পাওয়া যায় রামপ্রসাদের গানে। কবি রামপ্রসাদের এই সংগীত সাধারণ মানুষকে যেমন এনে দিয়েছে আধ্যাত্মিক চেতনা, তেমনি যুগিয়েছে ভক্ত প্রাণের খোরাক। জনকল্যাণে জনসাহিত্য হিসাবে এর দাম অনেকখানি।

ভক্ত কবি রামপ্রসাদের পরেই শিবশক্তি-বিষয়ক গান রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। পরমারাধ্যা শক্তিকে নিয়ে চলেছে শিশু ছেলের মতো এঁর মান-অভিমান। শিশুসুলভ সরলতার আবেশমাখা কমলসদৃশ তাঁর এই

৩১ সাধক রামপ্রসাদ। স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬০

গানগুলি। ভক্ত রামপ্রসাদের মতোই মায়ের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার ভান দেখতে পাওয়া যায় এঁর সংগীতের মধ্যে। মায়ের সঙ্গে যেমন চলে সন্তানের কোন্দল বাক্‌বিতণ্ডা, তেমনি পরমাপ্রকৃতি-স্বরূপা শিবানীর সঙ্গে উভয় কবিরই চলত গানে গানে কলহ। তবে রামপ্রসাদের মতো বৈদান্তিক ভাবধারা কমলাকান্তের গানে কম মেলে। এঁর বেশীর ভাগ গানই ভক্তিরসাত্মক।

তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে
যদি আপনার কর্মফল ফলিবে আমারে।
মাগো যে পথে চালাও তুমি
সেই পথে চলি আমি
তবে সুখ দুখের ভাগী কেন করিলে আমারে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী
শমন সঙ্কট যদি না থাকিত নরে।

প রি শি ষ্ট

॥ বাংলা সংগীতের গীতিরূপ ॥

বাংলা সংগীতের গীতিধারা প্রাক্তন ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্যেরই নিজস্ব সম্পদ। চর্যা থেকে আরম্ভ করে গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন, পাঁচালী, মঙ্গলগান, কালীকীর্তন, পদাবলী-কীর্তন, ঝুমুর, কবিগান, তরজা, বাউল, ভাটিয়ালী—এমনকি রামপ্রসাদী সকল রকম গানের সুরই রাগাশ্রিত, রাগ ছাড়া তাদের বিকাশ সার্থক নয়, তবে শুদ্ধ ও সংকীর্ণ জাতি—সে হ'ল ভিন্ন কথা। একটি বিশুদ্ধ রাগকে নিয়ে যে-কোনো গান তার লালিত্য ও সৌন্দর্যকে সার্থক করতে পারে, আবার দুটি, তিনটি কিংবা তারও অধিক রাগকে নিয়ে সে লীলায়িত হতে পারে। তাতে তার কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ না হবারই কথা। তবে হয়তো এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ধ্রুপদের পর খেয়াল ও টপ্পাদি গীতিধারার প্রকাশ হয়েছিল বলে আভিজাত্যের জগতে তাদের মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে তো হ'ল গানের শ্রেণীর দিক থেকে প্রশ্ন, রাগের বা রাগমিশ্রণের দিক থেকে মোটেই নয়। তা ছাড়া প্রতিভার অবদানরূপে রাগাশ্রিত যে-কোনো ধারার গানেরই বিকাশ হতে পারে, কিন্তু তা বলে তাতে করে গানের বা রাগের কৌলীন্যের কোনো হানি হয় না।

বাংলাদেশের নিজস্ব একটি পদ্ধতি চিরদিনই ছিল বলে মনে হয়। চর্যা ও বজ্রগীতির গায়নপদ্ধতির একদিনেই সৃষ্টি হয়নি, গ্রামাঞ্চলে ও বিভিন্ন পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সরল স্বচ্ছন্দ সুর ও ভঙ্গি নিয়ে কোনো-না-কোনো শ্রেণীর গান নিশ্চয়ই ছিল। হয়তো সেগুলি ছিল সাদাসিধা ধরনের গান, কিন্তু তাতে রাগের সংস্পর্শ অবশ্যই ছিল। চর্যাগানের রূপ ও

বিকাশ যে তাদের থেকে বেশ কিছুটা উন্নত ধরনের ছিল, শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশই তা প্রমাণ করে।

তারপর এল গীতগোবিন্দের যুগ। জয়দেব ভক্তিমূলক গান রচনা করলেও তা শাস্ত্রানুগ প্রবন্ধ ও নিবদ্ধগান ছিল। তখন অন্ততঃ পাঁচরকম শাস্ত্রীয় তালেরও আমরা সন্ধান পাই। তৎকালীন রাগের সঙ্গে এখনকার রাগরূপের মিল না থাকলেও, তারা চিত্তরঞ্জক ও নিয়মানুগ ছিল। গানের সঙ্গে নৃত্যেরও সমাবেশ ছিল, কেননা জয়দেব-ঘরনী পদ্মাবতী নটী ছিলেন ও তিনি নাকি জয়দেবের গানকে ছন্দসুষমা-সমৃদ্ধ করতেন নৃত্য দিয়ে। তখনকার যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাগের যে রূপ ছিল, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকরে তার সন্ধান ও পরিচয় মেলে।

এর পর মঙ্গলকাব্যের যুগ। মঙ্গলকাব্যের গীতিরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, মঙ্গলকাব্যের আদিম রূপ ছিল খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র পালার আকারে, কিন্তু যখন এই ক্ষুদ্র পালাগানগুলি এক অবিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকাসূত্রে গ্রথিত হয়ে এক বিরাট আখ্যায়িকা-কাব্যের রূপ ধারণ করল, তখন এর গায়ন-পদ্ধতিও পরিবর্তিত হ'ল এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। খণ্ড পালায় অভিজাত সংগীতের যে বিশুদ্ধি রক্ষা হ'ত, অষ্টাহব্যাপী আখ্যান-আবৃত্তির মধ্যে তা রক্ষা করা কঠিন হ'ল। গল্পপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য সুর করে আবৃত্তিই প্রধানত অবলম্বিত হতে লাগল, হয়তো কোনো কোনো আবেগপ্রধান মুহূর্তে, যেমন লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার শবানুসরণের করুণ ভাবটি বোঝাবার জন্য গল্পস্রোতকে আপাতত রুদ্ধ করে অভিজাত সংগীতের রাগ-রাগিণীর সাহায্য গ্রহণ করা হ'ত। সুতরাং বর্তমানে মঙ্গলকাব্য যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আদর্শ-চ্যুত হয়ে প্রকৃত লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে তা স্বীকার করলেও এর আদিম রূপের গীতি-আভিজাত্য অস্বীকার করবার

কোনো যুক্তি নেই। কারণ সংগীতরত্নাকরাদি প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের অনুশীলন করলে আমরা মঙ্গলগানের অভিজাত রূপেরই সন্ধান পাই। বর্তমানে মঙ্গলকাব্য গানকে আমরা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মেও গান করতে পারি। তবে রুচিভেদে সকল জিনিসের মধ্যে রূপভেদও যে দেখা দেয়, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বাংলার টপ্পা, কবি, টপখেয়াল প্রভৃতি গানগুলির সাধারণ রূপের মধ্যে হয়তো আমরা সংগীতের অভিজাত বিকাশের দিকটা খুঁজে পাই না, কিন্তু ভাল করে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যেও আমরা রাগ-রাগিণী ও শাস্ত্রীয় তালের সন্ধান পাই। কবিগানের প্রসঙ্গে হয়তো বলা যায় যে, কবিগানে সংগীতের প্রাধান্য কমে এল। কথা-কাটাকাটি, উত্তর এবং প্রত্যুত্তরই বেশী। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছিল কবিগানের প্রধান আকর্ষণ। কবিরা একটানা সুর ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করতেন। এর মধ্যে সংগীতের প্রাধান্য যে ছিল কিংবা সংগীতের একটি নূতন ভঙ্গি অনুসৃত হ'ত, তা ঠিক নয়। তবে কোনো কোনো সময় কথা-কাটাকাটির ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা সুর যথাসম্ভব রাগ-রাগিণীর সাহায্যে গান করা হ'ত। কিন্তু বাংলাদেশের গীতিধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখলে একথাই বলা যায়, বাঙালী যে-গানই গেয়েছে, সবার মধ্যে একটা সুর বা রাগের স্বচ্ছন্দ বিলাস দেখা গেছে।

আসলে যে-কোনো প্রকারের সংগীতই স্বতন্ত্র রূপ ও স্বতন্ত্র নাম পেয়েছে গায়কী ভঙ্গি ও তালের স্বাতন্ত্র্যের নিমিত্ত। রবীন্দ্রসংগীতেও দেখতে পাওয়া যায়, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানগুলির যে-যে স্বতন্ত্র ভঙ্গি যেটিতে প্রয়োজন তা রক্ষিত হয়েছে। কবি সেখানে ভারতীয় অভিজাত সংগীতের ধারা সম্পূর্ণই মেনে চলেছেন এবং কথার প্রাধান্যে সুরসৌন্দর্য ঢাকা পড়েনি বা রাগের স্বরূপ অপ্রকাশিত রয়ে যায়নি।

অভিজাত সংগীতের গণ্ডির মধ্যে পা বাড়িয়েছে বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে খানিকটা স্থান অধিকার করে নিয়েছে, হিন্দুস্থানী সংগীতের মধ্যে এমনি কয়েকটি ধারার সংগীত দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগুলিকে সংকীর্ণ-জাতীয় সংগীতের মধ্যে গণ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠুংরী, দাদ্‌রা, চৈতী, কাজরী প্রভৃতি আরো কয়েক প্রকারের সংগীতের নাম করা যেতে পারে। এই সকল সংগীতের গায়কীভঙ্গি প্রায় একরকমের। তা হলেও এদের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায় রচনাবলীতে ও তালে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, দাদ্‌রা, কাজরী, চৈতী এবং আরো বিভিন্ন প্রকারের হিন্দুস্থানী পল্লীসংগীতের প্রত্যেকের রচনাবলীর মধ্যেই স্বতন্ত্র ভাবধারার কথা ব্যবহৃত হয় এবং সেই গানের কথার ভাবের দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন্‌টি ধ্রুপদ, কোন্‌টি খেয়াল ইত্যাদি। এর মধ্যে টপ্পা ও ঠুংরীতে প্রায়ই কয়েকটি নির্দিষ্ট তালের ব্যবহার হয়—যেমন, চাঁচর (আট মাত্রার যৎ), দীপচন্দী (সাত মাত্রার যৎ), সেতারখানি (আদ্ধা=ষোল মাত্রা) এবং ত্রিতাল। কিন্তু দাদ্‌রা, কাজরী, চৈতী প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রায়শঃই দাদ্‌রা এবং কাহারবা তালের প্রয়োগ দেখা যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে ঠুংরী গানের গায়কীভঙ্গি থাকলেও, সে-গানগুলিকে ঠিক ঠুংরীর পর্যায়ভুক্ত করতে বাধে, যেহেতু সেখানে ঠুংরীগানের নির্দিষ্ট তালগুলি দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন, কবির রচিত একটি গান—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে, ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে ;
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে, ওগো বিদেশিনী॥
আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান ;
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ, ওগো বিদেশিনী।

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন দেশে ;
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী ॥[১]

এই গানটিতে ঠুংরী গানের গায়কীভঙ্গি রয়েছে পূর্বোক্ত অন্যান্য সংকীর্ণ-জাতীয় গানের মতোই, কিন্তু তালের ব্যবহার হয়েছে দাদ্‌রা। যদিও একরকম জোর করেই এই গানটিকে ঠুংরীর পর্যায়ে ফেলা যায়, কিন্তু অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীত যেগুলি আধুনিক গায়করা আসরে গেয়ে থাকেন, সেগুলিকে উল্লিখিত কোনো সংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। বরং এই কথা বলা চলে যে, কবি তাঁর নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি এবং নূতন গায়কী-পদ্ধতি দিয়ে গড়েছেন অন্যতম নূতন প্রকারের সংগীত। সুর ও তালের দিক থেকে সেগুলিকে ফেলা চলে নবযুগের আধুনিক সংগীতের কোঠায়, তবে কথার দিক থেকে নয়। কোনো উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের দ্বারা দাদ্‌রা কিংবা কাহারবা তালে ঠুংরী গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়নি। তবে বাংলাদেশে বাঙালী ভদ্রপরিবারের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসারের নিমিত্ত বাঙালীর গৌরব স্বর্গীয় গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় যখন প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখন বিশিষ্ট পরিবারের কয়েকটি বালিকাছাত্রীকে কিছু গান অতি সহজ ধারায় এবং সহজ তালে সন্নিবেশিত করে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন এইজন্যই, যাতে করে তালকাঠিন্যের ভয়ে তারা এই মধুর ঠুংরী গান থেকে বিরত না হয়। তাই দুই-একটি গানের তাল পালটে, এমনকি দাদ্‌রা ও কাহারবা তালে নিজে রচনা করে তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজে সেই গানগুলি ঠুংরী আখ্যা পেলেও পূর্ণাঙ্গ ঠুংরীর ক্ষেত্রে তার স্থায়িত্ব নেই বললেই ভাল হয়।

১ গীতবিতান (দ্বিতীয় খণ্ড)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৩০৬

কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। সকলের গাইবার উপযোগী করে তিনি তাঁর এই ঠুংরী-পর্যায়ের গান কয়টিতে তাল ও সুর যোজনা করেছিলেন, কিন্তু তা বলে সেগুলিকে খাঁটি ঠুংরী বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

কবিগুরুর জীবিতকালে তাঁর রচিত যে-সমস্ত উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশিত হ'ত তাঁর নিজের কণ্ঠে বা তাঁর ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কণ্ঠে, বর্তমানে সেই সব সংগীতের রূপ বদলে গেছে অনেকখানি আধুনিক যুগের রবীন্দ্র-সংগীতসেবীদের আশ্রয়ে এসে। যেমন পালটে গেছে তার সুরভঙ্গি, তেমনি বদলেছে তার তালসমূহ। কবির রচিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি যে-সমস্ত উচ্চাঙ্গ সংগীত রাধিকা গোস্বামী, সুরেন মজুমদার এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি গুণী শিল্পীরা গাইতেন, তাতে হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুরূপ জাতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য সমস্তই রক্ষা করে চলতেন এবং তার জন্য গানের সৌন্দর্য নষ্ট তো হ'তই না, বরং সুরালংকারে ও স্বরালংকারে সজ্জিত হয়ে ঐ গানগুলি হিন্দুস্থানী সংগীতের আভিজাত্যের ক্ষেত্রে উচ্চাসনই লাভ করেছিল। কেননা, সুর-সৌন্দর্যের সঙ্গে অতুলনীয় কথার সমাবেশ হওয়ায় গানগুলি হিন্দুস্থানী সংগীতের ঊর্ধ্বেই উঠেছিল। কবির রচিত ধ্রুপদ গানে ধ্রুপদাঙ্গীয় সমস্ত উপাদান, যথা—মিড়, গমক ইত্যাদি, খেয়াল গানে গমক, মিড়, তান, মূর্ছনা প্রভৃতি সকল প্রকার অলংকার এবং টপ্পা গানে টপ্পার বিশিষ্ট তানভঙ্গিসকল সুষ্ঠুভাবে নিঃসংকোচে প্রয়োগ করতেন গায়করা। এর জন্য কবির দিক থেকে কখনো কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। অধুনা যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকেন, প্রায়শঃই তাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা করেন না, যার দ্বারা কবিগুরুর উচ্চাঙ্গ সংগীতগুলিকে তাঁরা ঠিক পূর্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে অভিজাত সংগীতের মর্যাদা তাকে

দিতে পারেন। তাই যে মিড়, গমক, তান, মূর্ছনা প্রভৃতি বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ, সেই উপাদানগুলিকে বর্জন করে এবং কবিগুরুর অপূর্ব উচ্চাঙ্গ সংগীতসৃষ্টির অমর্যাদা করে তাঁরা লোকচক্ষুর সামনে কবিগুরুর উচ্চাঙ্গ সংগীতের মুক্তিপথ জোর করে বন্ধ করে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। তাই আজ আর সেই সংগীতের পরিচিত রূপ ধরা দেয় না পূর্বেকার শ্রোতাদের কানে এবং তাই আর শোভা পায় না বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীদের কণ্ঠে তাঁর অপূর্ব মধুর সংগীত। আজ তার নির্বাসন, কেননা তার প্রয়োগ হয়েছে গণ্ডিবদ্ধ কিছু মানবসমষ্টির মধ্যে। অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে কবিগুরুর সংগীতে এবং সেজন্য তাঁর বিশিষ্ট সংগীতের রূপগুলি বর্তমানে অনেকটা পূর্ব-আদর্শচ্যুত বলে মনে হয়।

সুকুশলী রবীন্দ্রনাথ ভাববৈচিত্র্যময় কথাকে বিচিত্র সুরসূত্রে গেঁথে, রস-রূপ-চন্দনে সিক্ত করে সাজিয়ে তুলেছেন থরে থরে, আর তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে। সৌন্দর্য-মাধুর্যমণ্ডিত কবির গ্রথিত সেই সংগীতমালা বাংলার প্রায় নর-নারীই কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে সানন্দে সাগ্রহে। এর প্রকৃতিজাত সরলতাই জনপ্রিয়তার হেতু। তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা, শিক্ষিতা-অর্ধশিক্ষিতা সকলের হৃদয়েই সে স্থান করে নিয়েছে নিজের মতো। খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাই শিশু গেয়ে ওঠে—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে-যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি॥
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।

রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি ॥[২]

কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি অবসর খুঁজে গৃহিণীদের অন্তরে—সেখানেও উঁকি মারে এই সুখশ্রাব্য, সুখসাধ্য সংগীত। সমাজ-শৃঙ্খলার বাধানিষেধের অন্তরালে, ভেঙে-পড়া মনের বুক চিরে, আনমনে বেরিয়ে আসে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর গোপন মিলনের ব্যর্থতার বাণী একান্ত নিরালায় নিবিড় ঘন বরষার দিনে—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায় ॥[৩]

এই ভাবোচ্ছ্বাসের বাণীকে সুরের কঠোর আবেষ্টন জটিলতর করে তোলেনি, যাতে করে ভাবোচ্ছ্বাস ব্যাহত হয় দুঃসাধ্য সুর-সংযোজনার নিমিত্ত। এমনি অগণিত সংগীত সৃষ্টি করে গেছেন কবিগুরু সুসাধ্যায়ত্ত সুরমিশ্রণে, যার জন্য তাঁর সংগীতের প্রসার ও প্রচার হয়েছে ভারতের সমস্ত সংগীতরচয়িতাদের চেয়ে অনেক বেশী।

প্রেমিক কবি কাউকেই চাননি দূরে সরিয়ে রাখতে, বঞ্চিত করতে চাননি তাঁর সৃষ্টির রসমাধুর্য উপভোগ থেকে। তাই সর্ব-লোকরঞ্জনকারী সকল প্রকারের সংগীতই তিনি সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র রসে এবং বিচিত্র কথায়। স্রষ্টার মনে চিরকালই থাকে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের প্রবণতা। তাই নব নব ধারায়, নব নব ভাবে এবং নব নব রসে রঞ্জিত করে তুলেছেন কবিগুরু তাঁর সৃষ্ট গীতাবলী। কোনো গায়কসমাজেই তাঁর সংগীত অপাংক্তেয় হয়ে থাকেনি বরং

২ গীতবিতান (দ্বিতীয় খণ্ড)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৪৮২
৩ ঐ ঐ পৃঃ ৩৭০

পেয়েছে আদর। অভিজাত সংগীতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মকানুন তিনি সেখানেই লঙ্ঘন করেছেন, যেখানে দেখতে পেয়েছেন জনসাধারণের পক্ষে সেই নিয়মকানুনগুলি মেনে চলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে এবং যার জন্য তাঁর সৃষ্ট সংগীতের অপমৃত্যু ঘটবে অচিরেই। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, এত করেও তিনি তাঁর সংগীতকে মুক্তি দিতে পারেননি, বন্ধন তার রয়েছেই, বাধানিষেধের গণ্ডি সে পেরিয়ে যেতে পারেনি। কেননা, লঘু সংগীতকেও তিনি বেঁধে দিয়ে গেছেন তাঁরই কল্পিত স্বরশৃঙ্খলায়। সেখানে শিল্পীর কোনো স্বাধীনতাই নেই। সেখানেও একটু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলেই নাকি তাঁর সংগীতের মাধুর্য নষ্ট নয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, হিন্দুস্থানী অভিজাত সংগীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেকখানি। সেখানে শিল্পীর ইচ্ছানুরূপ স্বরকৌশলপ্রয়োগ, ছন্দোবৈচিত্র্যসৃষ্টি শিল্পীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে যেটি বর্তমান উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে বাধা সৃষ্টি করে। এখানে হিন্দুস্থানী অভিজাত সংগীত শৃঙ্খলিত হয়েও মুক্ত, কেননা, রাগের পূর্ণাবয়ব রক্ষা করে, তাকে নিজের ইচ্ছানুরূপ অলংকারে সজ্জিত করতে পারেন শিল্পীবৃন্দ, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত মুক্তি পেয়েও মুক্ত নয়, সে শুধু তার কবির সৃষ্ট দেহ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, শিল্পীর অধিকার নেই তাকে মনের মতো করে সাজাবার। মনের মতো করে সাজাতে হলে চাই সম্পদ, চাই সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি, চাই ভালবাসা। তাই মুক্তি সে পায়নি সকল সমাজে। পরাধীনতার লাঞ্ছনা তার চিরদিনই সহ্য করে আসতে হবে, যদি না দেওয়া হয় পূর্ণভাবে শিল্পীকে স্বাধীনতা। তাঁর এই নবসৃষ্টি সুসাধ্য সুর-বিন্যাসের কোঠায় বন্দী বলেই জনসাধারণের কাছে প্রিয়। কিন্তু মুক্তির স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ যাঁরা করেছেন, তেমনি শিল্পীশ্রেণীর মধ্যে কতটুকু স্থান করে নিতে পেরেছে এই নবধারায় গীত সংগীত, তা ভাববার বিষয়। কবিগুরুর

সংগীত আরো বিস্তৃত হ'ত, যদি শিল্পী পেতেন স্বাধীনতা। সরল রাস্তা চলা সহজ বটে, কিন্তু বাঁকা পথের দুই পাশে সুগন্ধ বর্ণবৈচিত্র্যময় পুষ্পোদ্যান থাকলে সেই পথেই কি চলা আনন্দের নয়? তবে সেই সৌন্দর্যবোধ, সেই গন্ধ-উপলব্ধির আকর্ষণ থাকলেই বক্রপথে চলার কষ্ট ও ক্লান্তি কিছুই আসে না। জনসাধারণের পক্ষে সেই উপলব্ধি সম্ভব নয়। হয়তো বা সেজন্যই কবি সরল সহজ উপায়ে গাইবার সুযোগের জন্য, জনসাধারণের সামনে তাঁর এই লঘু সংগীত তুলে ধরেছেন বিস্তৃতির পথে তাঁর সংগীতকে নিয়ে যেতে।

রবীন্দ্রসংগীতের যুগে আরো অনেক কবি ও সংগীত-রচয়িতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রভৃতি এবং তাঁদের আলোচনা আমরা করেছি। তাঁরাও ভারতীয় অভিজাত সংগীতের আদর্শে সংগীত রচনা করেছিলেন ও তাঁদের প্রত্যেকের সংগীতে এক-একটি স্বকীয়তা ছিল কাব্যে ও সুরে। কিন্তু তাঁদের সকলের সংগীতই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের মতো প্রত্যেকের হৃদয়কে জুড়ে বসে নেই। রবীন্দ্রসংগীত যেমন ব্যাপকভাবে বাঙালীর শুধু নয়, ভারতের ও ভারতের বাইরে কাব্য ও সুর -রসিকদের মনের অনেকখানি স্থান অধিকার করে বসেছে, পরবর্তী গীতিকার ও সুরকারদের কাব্য ও সুর ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তার কারণ আর কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা ও বিচিত্র বিপুল গীতিরচনার অবদান তাঁদের গানগুলিকে অনেকখানি ম্লান করেছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন সব দিক দিয়েই পরবর্তীদের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তা হলেও বাংলার সংগীতাকাশে তাঁরা সকলেই দীপ্তিময় জ্যোতিষ্ক। পূর্ব পূর্ব সাহিত্যিক ও সুরকারদের মতো বর্তমানের সাহিত্যিক ও সুরকারদের কাব্যসুষমাপূর্ণ কথা ও সুর বাংলা সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জী

A Short Historical Survey of the Music of Upper India (Bombay, 1934)—Bhatkhande, Pandit V. N.

Ancient India—R. C. Majumdar

Bṛhaddesi (ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ)—Matangamuni

Buried Empires—Carleton

Early Indus Civilization—Ernest Mackay

Prehistoric Civilization of the Indus Valley—Rao Bahadur D. N. Dikshit

Pre-historic India—Stuart Piggott

Ragas and Raginis—O. C. Gangoly

Sangita-Ratnakara Vol. II—Saranga Deb

The History and Culture of the Indian People (The Vedic Age) Vol. I—Dr. V. M. Apte

The Ideals of Indian Art—E. B. Havell

The Mahabharata (Southern Recension) Vol. XVIII—P. P. S. Sastri

আশ্বমেধিকপর্বণি—অনুগীতাপর্ব

The Music of India—Popley (1921)

The Virataparvan Vol. 5—Edited by Raghu Vira

আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কবি ভবানন্দের হরিবংশ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

কল্যাণী—রজনীকান্ত সেন

কালিকামঙ্গল—বলরাম কবিশেখর বিরচিত। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কাব্যতীর্থ সম্পাদিত

কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী—দীনেশচন্দ্র সেন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারত—রাজশেখর বসু
খিল-হরিবংশ (শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃত টীকা-সমেত)—পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী—দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি
গান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গীতবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতিগুঞ্জ—অতুলপ্রসাদ সেন
গোপীচন্দ্রের গান (১ম খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত
গোপীচন্দ্রের গান (২য় খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সেন
চয়নিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত
চণ্ডিকামঙ্গল—রাধাচরণ রক্ষিত
জাতক-মঞ্জরী (১ম-৭ম খণ্ড, কলিকাতা)—ঈশানচন্দ্র ঘোষ
দত্তিলম্ (ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ)—দত্তিলমুনিপ্রণীতম্
দাশরথি রায়ের পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
দুর্গামঙ্গল—ব্যোমকেশ
দ্বিজেন্দ্র-গীতি (প্রথম খণ্ড)—শ্রীদিলীপকুমার রায়
নাট্যশাস্ত্রম্ (কাশী সং)—শ্রীভরতমুনিপ্রণীতম্
নারদীয়া শিক্ষা—নারদ
পদাবলী-পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত
প্রীতি-গীতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (দ্বিতীয় খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সেন
বলরামদাসের পদাবলী—ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলার লোক-সাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন

বাংলার গীতকার—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ)—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ)—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাল্মীকি-রামায়ণ—রাজশেখর বসু

বাণী—রজনীকান্ত সেন

বিষের বাঁশী—নজরুল ইসলাম

বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ (চৌখাম্বা সংস্কৃত সং)—পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত

বৌদ্ধগান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভাঙ্গার গান—নজরুল ইসলাম

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ—কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত

মধুকানের ঢপকীর্তন (গীতি-কথিকাবলী)—পাঁচকড়ি দে সংকলিত

মৈমনসিংহ-গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের গান—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রামায়ণম্। শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিতম্ (অযোধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বালকাণ্ডম্)—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

শনির পাঁচালী—কালীমোহন বিদ্যারত্ন

শনির পাঁচালী—শম্ভুনাথ বিশ্বাস

শিক্ষাসংগ্রহঃ—কাশী, সংস্কৃত সিরিজ

শিবায়ন—রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রচিত

শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত

শূন্য-পুরাণ—রামাই পণ্ডিত

শ্রীকরুণানিধানবিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যামদাস বিরচিত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কবিরাজ কৃষ্ণদাস

শ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস

শ্রীধর্মমঙ্গল—মানিক গাঙ্গুলি বিরচিত

সত্যনারায়ণের পাঁচালী—শ্রীগুরুচরণ নাথ কর্তৃক প্রকাশিত

সঙ্গীত-তরঙ্গ—শ্রীরাধামোহন সেন

সঙ্গীতমকরন্দঃ। নারদ (২য়)—পণ্ডিত মঙ্গল রামকৃষ্ণ তেলাঙ সম্পাদিত (বরোদা সংস্করণ, ১৯২০)

সঙ্গীতসময়সারঃ (ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ)—শ্রীপার্শ্বদেব (সঙ্গীতাকর)

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত-সার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমঃ (তৃতীয় খণ্ড)—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রসসাগর

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ

সেকশুভোদয়া (হৃষীকেশ সিরিজ নং ১১)—শ্রীসুকুমার সেন

স্বরবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারামণি—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন